শ্রীবীরেন্দ্রবাণী

(প্রথম খণ্ড)

শ্রীশ্রীবালকব্রহ্মচারীর উপদেশ-সংগ্রহ

(প্রথম খণ্ড)

শ্রীশ্রীবালকব্রহ্মচারীর উপদেশ-সংগ্রহ

শ্রীঅজিত ভট্টাচার্য্য
শ্রীশান্তিদাস মজুমদার
শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ
কর্ত্তৃক
সংগৃহীত ও সম্পাদিত

সংগ্রহতত্ত্ব পাবলিশার্স
৪৬, ভূপেন্দ্রবসু এভেনিউ কলিকাতা — ৪

প্রথম সংস্করণ

১৩৬০

উৎসর্গ

এই চৈতন্যময় বিশ্বে যে চেতনার সাড়ার সন্ধানে যোগীরা যোগ করে যাচ্ছেন যুগ-যুগ হতে, সেই সাড়ার সাড়া নিয়ে অবতীর্ণ স্ব-স্বরূপে যিনি এ ধরাতলে, যাঁর অপরূপ অপার মহিমার স্পর্শে বিকশিত হয়ে উঠছে স্বরূপের মাঝে ধরাতল-বাসীরা—বাসীরাও আজ বাঁশীর সুরে সুর দিতে সমর্থ হচ্ছে তাঁর কৃপাবর্ষণে—সুর-সাগরেরই অবতীর্ণে।

এই অবতীর্ণের সাগরপূর্ণ সুরবাণী কিঞ্চিং সঙ্কলন ক'রে অর্পণ করছি বালকব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীঠাকুর বীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর শ্রীশ্রীপাদপঙ্কজে—'ঠাকুর, তোমারই দেওয়া ফুল নিবেদি তোমারই পায়।'

যাঁর বাণী সংগ্রহ করা হয়েছে, তিনি বালকব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী—আমাদের ঠাকুর। তাই গ্রন্থের সর্ব্বত্র তাঁকে 'ঠাকুর' বলেই সম্বোধন ও উল্লেখ করা হয়েছে।

* * * *

সাধু-সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব-তান্ত্রিক, পণ্ডিত-তার্কিক, সাধক-ব্রহ্মচারী, নারী-কুমারী গ্রন্থে যাঁদের উল্লেখ পাওয়া যাবে, নীতি-হিসাবে তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয় নাই—কারো কারো ব্যক্তিগত আপত্তি, কোন কোন ক্ষেত্রে সামাজিক অসুবিধে, অন্যেরা আমাদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল।

* * * *

ভাবকে ভাবে রাখার জন্য গ্রন্থে শব্দ, ভাষা ও সাহিত্যের নূতন ব্যবহার হয়েছে অনেক—প্রচলিত ব্যাকরণের সমর্থন হয়তো তা পাবে না, ভাবগ্রাহী জন ভাবকেই গ্রহণ করবেন—এটাই তৃপ্তি।

কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন

বাঁধের বাঁধকে ভেঙ্গে দিয়ে

যন্ত্ররূপে

মন্ত্রমূলক বাণী প্রকাশে সাহায্য

করেছেন যাঁরা—

সেই বিদ্যোৎসাহী সুহৃদ

ডক্টর শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-বি, বি-এস্

ও

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্ ইন্সিওরেন্স

সোসাইটি লিমিটেডের বিভাগীয়

সুপারিন্টেন্ডেণ্ট শ্রীভুপেন্দ্রলাল রায়

মহোদয়দ্বয়ের কথা

আজ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি।
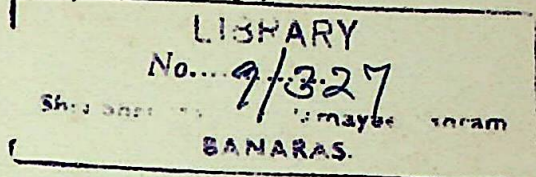
মাহাত্ম্য প্রকাশ হিসাবে, মাহাত্ম্য প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে, এই মহানের মাহাত্ম্যকে বর্ণনা করার অভিপ্রায়ে এই গ্রন্থ প্রকাশ করছি না, শুধু সত্যের উন্মাদনারই প্রকাশ করে যাচ্ছি। যা সত্য, যা সরল, যা প্রত্যক্ষ, যে সমস্ত শক্তিকে প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে উপলব্ধি করেছি, তার বর্ণনায় যে শক্তি বিদ্যমান রয়েছে, সেই শক্তিদ্বারা সেই শক্তিকেই, সেই শক্তির প্রকাশেই যা পেয়েছি, যা উপলব্ধিতে এসেছে, তারই প্রকৃত রূপটাকে জানাবার প্রয়াসে জানাচ্ছি, যা রয়েছে সর্ব্বজীবে সর্ব্বচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত—এই উক্তি যে তাঁরই উক্তি।

আমরা সেই শক্তি হতে উপলব্ধি ক'রে যা বের করছি, এ যে তাঁরই দান, তাঁরই দেওয়া, তাঁরই শক্তি। শুধু সত্যের প্রেরণায় মনের তৃপ্তিরূপ উচ্ছ্বাসকে আর লুক্কায়িত না রাখতে পেরে ঝাঁপিয়ে পড়ছি জনসম্মুখে। জানি বহু অবস্থার সাথে যেতে হবে, পড়তে হবে, আবার তৃপ্তি পাচ্ছি সত্যকে জানিয়ে। নিজেরা যে তৃপ্তি পাচ্ছি, এ তৃপ্তি আমরাই কেন পাবো, এ তৃপ্তি বিশ্বজনগণের; তাই সে তৃপ্তি যদি সবার ভেতরে জেগে উঠে, তবেই হবে আমাদের তৃপ্তির সার্থকতা—আমাদের তৃপ্তিকে প্রকাশ করার জন্য যে আন্তরিক ইচ্ছা, সে ইচ্ছা তখনই সফল হবে।

যখন এই মহানের কথা মনে পড়ে, তাঁর উপদেশ, তাঁর বাণী, 'যে শক্তির প্রচার যন্ত্রণাদায়ককে face করা, বিভূতিকে প্রত্যক্ষতার বর্ণনা করা, নিজেকে উপহাসে ছেড়ে দেওয়া—তাই সঞ্চিত শক্তি হতেই সব শক্তিকে আয়ত্ত ক'রে ব্রতী হও সর্ব্বকাজে।' তাই তাঁর কথা স্মরণ ক'রে নিজেদের কাজে নিজেরাই যেন কম্পিত হচ্ছি, ভীত হচ্ছি। পরক্ষণেই এগিয়ে যখন আমাদের সত্য রূপটাকে দেখি, তখনই মনে হয় আমরা তাঁর উপদেশের অমর্য্যাদা হয় তো করিনি, আমরা আমাদের সেই 'প্রত্যক্ষ'কে প্রকাশ করছি, আমাদের আনন্দের উচ্ছ্বাসকে চেপে রাখতে না পারার দরুনই আজ আমাদের এই ব্যাকুলতা। মর্য্যাদা কেউ দেউক বা নাই দেউক, সে কথা চিন্তা করছি না। ঠাকুরেরই একদিনের বাণী মনে হচ্ছে, 'বিরাট বড় কয়লার খনিতে diamond কয়েকটিই মাত্র মিলে—কয়লাতেই তার বাস, আবার সেই diamondটুকু দিয়েই সব খনিটুকু কিনে নেওয়া যায়।'—সেই বৃত্তি এবং চিন্তা হতেই প্রকাশ করছি আমাদের সংগৃহীত এই বাণী। জনগণের একজন যদি এই রূপকে দিয়ে এই রূপকে বিকশিত করতে পারে, এই রূপে বিকশিত হতে পারে, তবেই নিজেদের প্রচেষ্টা সার্থক মনে করবো ও ঠাকুরের বাণীর উপযুক্ত মর্য্যাদা দানে কিঞ্চিৎ সমর্থ হয়েছি বলে মনে করবো।

আমাদের এই উন্মাদনায় যে সত্য রূপটিকে জানিয়ে যাচ্ছি আমাদের প্রকাশের জন্য, আমাদের অভিব্যক্তিতে যদি ত্রুটি হয়ে থাকে তার জন্য দায়ী আমরা নিজেরা। ছোট বয়স হতে তাঁর সঙ্গে সঙ্গ করার যতটা সৌভাগ্যলাভ করেছি, তাতে নিজেরাই তাঁর কাছে হারিয়ে রয়েছি।

আমাদের এই যে আকুলতা ব্যাকুলতা—এ-যে বাচালতা নয়, প্রকৃত রূপটির যে বিকাশ বাস্তবে প্রত্যক্ষ করেছি বিভূতিতে এবং উপদেশে, তা বলে শেষ করতে পারছি না, আর বলারও বেশী

প্রয়োজনবোধ করছি না, এবং এ রূপকে বর্ণনা করার ক্ষমতাও আমাদের নেই, তাই বর্ণনা করতে গিয়ে কোন পরিচয় দেবো তা ভেবেই আমাদের প্রত্যক্ষে যা এসেছে তা'ই জানাচ্ছি। গ্রন্থাকারে যে আমাদের সংগৃহীত বাণীগুলো যে প্রকাশ করবো এই কল্পনা কোনদিনও করিনি, তবে জনগণকে জানিয়ে দেওয়ার ইচ্ছায়ই এই গ্রন্থ প্রকাশ করছি।

ঠাকুর বলতেন, 'বিভূতিকে যেমনি-তেমনি ভাবে বর্ণনা করলে নিজেও উন্মাদ বনবে, যাঁর কথা বলবে তাঁকেও উন্মাদ বানাবে। তবে আন্তরিকতা-হিসাবে যদি কেউ জানতে চায়, তাদের কথা আলাদা। তাদের বলবে, বিভূতি-সম্বন্ধে যা দেখেছি তা বলছি, বিশ্বাস কর বা না কর তাতে ক্ষতি নেই। স্বপ্নবৎ অবস্থার মত ভেবে চলে যাও, তবুও যে একটা কথা জেনে গেলে—এইটুকু জেনে যাও বুঝে যাও। একদিন যদি এই চেহারা সত্যে প্রকাশিত হয়, সেদিন না হয় স্বপ্ন তোমার ভাঙ্গবে।'

এ-ভাবে যা প্রত্যক্ষ করেছি তা'ই জানাচ্ছি, এবং যে সমস্ত বিভূতি-সম্পর্কে এই গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছি তা কেহ বিশ্বাস করুক বা না করুক সে প্রশ্ন এখানে হচ্ছে না, তার জন্য আমরা লালায়িত নই। তারা এগুলো যেন স্বপ্নবৎ অবস্থায় নিয়ে একটা মন্তব্যের মধ্যে রেখে দেয়। যেদিন প্রাণের যুক্তিদ্বারা যুক্তিতে আনতে পারবে এবং সত্য রূপটিকে সত্য ভাবে প্রকাশ করতে সমর্থ হবে, সেদিন না হয় আমাদের বলা সফল হবে, এবং জনগণের স্বপ্ন ভাঙ্গবে।

আজ অনেক কথাই আমাদের মনে পড়ছে। তিনি মাঝে মাঝে বলতেন, 'ভাষার অভাব, তাই ভাবকে ঠিকমত দিতে পারছি না।' তা সত্ত্বেও তিনি সহজভাবে আমাদের বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য নানাভাবে মিশ্র ভাষাতে সব-কিছুই বুঝিয়ে দিতেন, আমরাও ঠিক সেই ভাষায় সেই ভাবে যতটুকু পেরেছি লিখে রাখতে চেষ্টা করেছি, এবং

এই গ্রন্থে সে-ভাবেই উদ্ধৃত করেছি। আমাদের ঠাকুরের সেই সহজ ভাব সবার উপরে সহজভাবেই যেন কার্য্যকরী হয় এবং সহজভাবে তাঁর এই ভাষাগুলো নিয়ে সহজভাবেই চিন্তা ক'রে তাঁর উপর যেন কোনকিছু আরোপ না করে। যদি কিছু ত্রুটি থেকে থাকে তার জন্য আমরাই সম্পূর্ণ দায়ী।

তিনি কি যশ, কি মান, কি লোভ, কি কাম, কি প্রতিষ্ঠা সব-কিছুকে নিজের বশীভূত যে রেখেছিলেন, আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে তার পরিচয় পেয়েছি—এক কথায় বলতে গেলে ষড়্‌রিপু তাঁর দাসানুদাসের কার্য্য করছে। অল্প বয়সে তাঁর এত বড় প্রতিষ্ঠা হওয়ার জন্য অনেকের চোখে তা 'যন্ত্রণাদায়কে'র মত হয়েছিলো, সেই সূত্রপাত্রে শত্রুতারও অনেক উদ্ভব হয়েছিলো, এবং তার জেরে তাঁর প্রাণ-নাশেরও উপক্রম হয়েছিলো। বিপদকে তিনি বন্ধুভাবে আঁকড়ে রেখে এমন হালকাভাবে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যাতে ঐ বিষয়ে আমাদের চিন্তা না আসে।

এই মহান্‌কে অনেকেই ভুল বুঝেছে এবং ভুল বুঝে আছে, আবার অনেকে এসে ভুলের সমাধান করে তাঁর আশ্রয় নিয়েছে, তা প্রত্যক্ষ আমরা দেখেছি এবং কারণও তার লক্ষ্য করেছি। কেন এই সমস্ত বিপদের এবং অপযশের উদ্ভব তা চিন্তা করলে নিজেরাই আঘাত পাই। অনেকে তাঁর সাথে যুক্তিতে না পারায় শত্রুতা আরম্ভ করলো। চঞ্চলচিত্ত ছেলেমেয়েদের তিনি সংশোধনে আনাতে যাদের স্বার্থে কাঁটা পড়লো, তারা বিরূপের চেহারা দেখাতে সুরু করলো। আর আবহমান কাল হতে যে সংস্কারে আমরা মানুষ, যার মধ্যে আমরা গড়ে উঠেছি, তাতে দিয়েছেন তিনি হাত। তাঁর কথাই একটি মনে পড়ছে, 'গ্রামে খুব epidemic লেগেছে, জলের ভেতর দিয়েই সেই রোগের বিস্তার হচ্ছে, তাই সেই জলের tankএ উপযুক্ত ঔষধের দরকার। ঔষধ-প্রয়োগে tankএর জীবাণু এমনি

ভাবে লড়াই আরম্ভ করেছে ঠিক আমাদের ভেতরে ঔষধ দেওয়াতে যে রকম symptoms বের হয়,.........এক মণ দুধে কয়েক ফোঁটা চনা মাত্র।' সংস্কারের ভেতরে তিনি করেছেন হস্তক্ষেপ, লড়াই তখনই সুরু হয়েছে। তিনি সংস্কারকে উলঙ্গ করে দেখাতে আরম্ভ করেছেন—কার কোথায় কি রয়েছে, গলদ সবারই ধরা পড়তে আরম্ভ করেছে, তাই লাঠিছোরা নিয়ে আর বদনাম দিয়ে বেশীর ভাগ শত্রুতা করতে সুরু করেছে—এই বালকের উপর এমনিভাবে একটার পর একটা আঘাত চলেছে। আজ আর তিনি বালক নেই, যুবকে পরিণত হয়েছেন, উপহাসকারীদেরও খোরাক একটু বেড়েছে, তাই তাঁর বয়সের সাথে খাপ খাইয়ে মুখরোচক জাতীয় দুর্নাম দিতে সমর্থ হয়েছে—একই জাতীয় দুর্নাম তাঁর ছেলেবয়সেও অনেকেই দিয়েছিলো। তারপর তারা যখন সম্মুখীন হলো, তখন বাচ্চা দেখে নিজেরাই নিজেদের লজ্জায় লজ্জিত হলো—তারা আজ সবাই তাঁর আশ্রিত। আরো অনেক শত্রু তাঁর নিকটে এসে নিজেদের গলদ প্রকাশ ক'রে ক্ষমা চেয়ে তাঁর আশ্রয় নিয়েছে। ভ্রান্তির বশে বহুভাবে বহু জনে তাঁর উপর নানাভাব আরোপ করেছে, সবার সমস্যারই সমাধান হয়েছে তাঁর সম্মুখীন হওয়াতে।

বহু ভবঘুরে ছেলেকে ঘরের দিকে এনেছেন, পিতামাতাকে ছেড়ে আশ্রমবাসী হয়েছে, তাদের তিনি ঘরে নিয়ে বসিয়েছেন—এই জাতীয় পিতামাতার কান্না তাঁর কাছে আমরা বহু দেখেছি।

আর এই সমস্ত দুর্নাম-অপমানজাতীয় কথাবার্ত্তা যা-কিছু তাঁর কানে এসে পৌছতো, তিনি তা শুনে আমাদের বলতেন, 'সাগর—পাখার বাতাসে নাড়া যায় না। পানা—সাগরে স্থান পায় না। জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলে এই বিরাট মনরূপ যে সাগর, ঐ সমস্ত চাঞ্চল্যকর পানারূপ কথাবার্ত্তা ঐ সাগরে স্থান পায় না, খাল-বিল-ডোবাতেই ওরা বেড়ে উঠে—স্থান তাদের সেখানেই,

এই জাতীয় বৃত্তি যাদের তাদের বেলায় তা সম্ভব। কিন্তু মন যে সাগর, মন যে বিরাট, কূপেও তার পরিচয় দিচ্ছে; তাই যখন প্রত্যেকে বুঝে নেবে, তখন এই সমস্যাতে আর ঘা দেবে না।'

ঠাকুর আমাদের আরো বলতেন, 'বয়া হয়ে থাক, শত ঢেউতেও ডুববি না, মনে হবে ডুবে গেছিস্; কিন্তু ঢেউয়ের তালে তালে একবার ডুববি, একবার ভাসবি। নিজের ভেতর জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত কর, তবেই তোরা সেই সাড়া পাবি।'

তাই তাঁর সম্পর্কে লিখতে বসে আজ শুধু বার বার তাঁর সেই মন্ত্রমূলক বাণীগুলোর কথাই মনে পড়ছে। তিনি আমাদের বলতেন, 'সূক্ষ্মেও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করবে না, উচ্ছ্বাসমূলক বাড়িয়ে কিছু বলবে না, যতটুকু গ্রাহ্যে আসবে ততটুকুই প্রকাশ করবে।' সেই ভাবনায়ই নিজেদের মধ্যে নিজেরা আলোড়নের ও কম্পমানের অবস্থায় রয়েছি—কি জানি কোন ভুল করছি, কোন রূপ দিতে কোন রূপের বর্ণনা করছি। ভয় হচ্ছে সূক্ষ্মে তাঁর প্রশংসা করছি কিনা, বিশ্বাস করিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ করছি কিনা, তা হলে তাঁর উপদেশের অমর্য্যাদাই যে করা হবে। যদি কোন কিছুর তারতম্যে নিজেদের কলুষিত ক'রে ফেলি, তাঁর উপদেশ হতে চ্যুত হয়ে পড়ি, সেই ভাবনায় আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে নিজেদের কাঁটায় কাঁটায় রাখার চেষ্টা ক'রে যা সত্য, ধ্রুব, যে সত্য আমাদের প্রত্যক্ষে এসেছে, সেই সত্যতার বাণীই এই গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছি। প্রশংসামূলক বাণী এখানে নেই, বিশ্বাস করিয়ে দেবার জন্য কোন প্রচেষ্টা আমরা করিনি। আমাদের মনের কোন সূক্ষ্ম কোণেও তৈরী করার বৃত্তি বা চিন্তাধারার অস্তিত্ব ছিল না বা নেই। আমরা সহজ এবং সরল সত্য রূপটিকে প্রকাশ করছি, তাই এই প্রকাশে নিজেরাই তৃপ্তি পাচ্ছি।

সব-কিছু উপদেশ তাঁর লিখবার মত সময় করে উঠতে পারিনি এবং এত কথা লিখতেও সমর্থ হইনি, তবে সহজভাবে সহজ ভাষায় তিনি সব-কিছু আমাদের বুঝিয়ে দিতেন। তিনি আমাদের বলতেন, "দেখ, ভাষার অভাবে সেই ভাবকে বুঝানো একটু অসুবিধে, তাই যখন যে বিষয়বস্তু আলাপ করবো তা না বুঝলে আমাকে বার বার জিজ্ঞেস করবে, তাতে আমি মোটেই বিরক্তি বোধ করবো না।' তাই যখনই যে বিষয়বস্তু না বুঝতাম, তখনই তা বুঝে নেওয়ার জন্য সমাধানের জন্য বার বার জিজ্ঞেস করে নিতাম। সাধারণতঃ উপদেশ দেওয়ার আগে তিনি বলতেন, 'তোমরা অনেক পণ্ডিত ও বিদ্বান্ লোক উপস্থিত, তোমাদের ভাষার গুণে বুঝবে ও বুঝে নিতে চেষ্টা করবে। কারণ, গ্রন্থের পরিচয়ে আসার সুযোগ আমার হয়নি, আমার সম্পর্ক বাচ্চা বয়স হতে ভাবের সঙ্গে হওয়াতে, ভাবই হয়ে গেছে আমার এক জাতীয় ভাষা, তাই পুস্তকাদির ভাষা ভাবে আনতে সময় পাইনি। ভাবছিলাম, গ্রন্থের ভাষার সাহায্যে ভাবকে প্রকাশ করবো, কিন্তু এমনি লোকের ভিড়, 'গুরু'ই সাজবো, না পুস্তকই পড়বো। তাই এই মহান্‌গিরি রাখতে গিয়ে আমার আর ভাষার রাজত্বে যাওয়ার সময় হয়ে উঠেনি, যতটুকু ভাবরাজত্বে বিরাজ করেছি, তার সম্পর্কে যতটুকু অবগতে এসেছি, আমার জানাই যে শেষ জানা, সেটুকু আমার পক্ষে বলা সমীচীন হয় না। শুধু এইটুকু বলতে চাচ্ছি, আমার বুঝে যতটুকু বুঝেছি, ততটুকুই তোমাদের জানিয়ে যাচ্ছি। তাই একটি সহজ কথাকেও একটি সহজ ভাবকেও বুঝাতে গিয়ে আমার যত পরিশ্রম করতে হয়, একটা ভাষা জানা থাকলে যে জিনিষটাকে সহজভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যেতো, আমি সে জিনিষের সঙ্গে সম্পর্কিত নই বলে হাতড়াতে হাতড়াতে এতদূর এগিয়ে যাই সেই বিষয়বস্তুকে অবগত করিয়ে দেওয়ার জন্য, যা তোমাদের নিকট

বিরক্তিস্বরূপ হলেও আমি নিজে বিরক্তবোধ করি না। তাই অনেক সময় একটা বিষয়বস্তুকে বার বার ফেনিয়ে ফেনিয়ে পুনঃ পুনঃ সেই বস্তুকে বুঝিয়ে যাচ্ছি একই জাতীয় ভাষার মধ্য দিয়ে। এখানে যদি শব্দসম্পদ্ থাকতো, তবে সম্পদের পরিচয় ভাবের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতো—মূক হওয়ার চেয়ে 'উন্মূকতা' তো একটু আছে। নিজের এই চিদানন্দের একটু আভাস দিতে যে সমর্থ আছি, তাতেই নিজে একটু আনন্দ অনুভব করছি।'

তাঁর উপদেশ হতে যতটুকুন্ বুঝেছি, যতটুকুন্ আমাদের বোধে এসেছে, তা হতে তাঁর মতবাদ হচ্ছে, 'জানার পথে জানাকে জাগিয়ে জেনে যাওয়া অর্থাৎ স্থিত যা রয়েছে, বিদ্যমান যা আছে, সেই প্রত্যেকটি বস্তুর সত্তার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকটি বস্তুতে, এবং প্রতিটিতেই সেই তত্ত্ব জানিয়ে দিচ্ছে সেই পূর্ণত্বকে। তাই এই বিশ্বের সৃষ্টি, দৃষ্টে এবং অদৃষ্টে যা-কিছু রয়েছে তাতে সেই শক্তিই বিদ্যমান, আর খণ্ড-খণ্ড ভাবে এবং খণ্ড-খণ্ড ভাষাতে খণ্ড খণ্ডের যে পরিচয় খণ্ডভাবে দেওয়া যাচ্ছে, প্রকারান্তরে অখণ্ডেরই পরিচয় দেওয়া হচ্ছে; এই অখণ্ড যখন বহু খণ্ডে প্রকাশিত, তাঁর ভাষাও তাঁর উপর সেই ভাবে সেই নামকরণে ব্যবহৃত এবং আলোচনা-ক্ষেত্রে যখন খণ্ড-খণ্ড একত্রিত ক'রে একটি শব্দে, ভাষায় যে পরিণত করা হয়। যখন তোমরা বুঝে নেবে মূলভাব যে এক প্রত্যেকটির মধ্যে বিদ্যমান, তখন আর শব্দের মারামারি, শব্দের contradictory যেই অবস্থায়ই নাড়ানাড়ি হউক না কেন, বোধ্য বস্তু যখন এক, বোধগম্যে ঠিক সেই ভাবেই আনতে হবে—কি বিশ্বে, কি জীবজগতে, কি যার যার সমাজে। প্রয়োজনের সাথে সাথে যখন এক-একটির প্রয়োজনের জন্য এক-একটি বিন্যাসে গিয়ে দাঁড় করে, এক-একজনের সুবিধার্থে তা যখন সুবিধা করে ব্যবহার করে নিচ্ছে যার যার প্রয়োজনের প্রয়োজনে—কি সংস্কার, কি মূর্ত্তিবাদ—সেই অনুযায়ী বৃত্তিগুলো সেই ধাপে ধাপে

যা পরিচয় দিচ্ছে, ঐ বাদাবাদির মধ্যে প্রত্যেকটিতে রয়েছে পূর্ণত্ব। এক বুঝে যদি চিন্তা করা যায়—যে যা করছে, যা হচ্ছে, যা হয়ে আসছে, এই বিশ্বপ্রকৃতির প্রয়োজনের তাগিদেই হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং মাঝখানে যা-কিছু যার যার যতরকম পরিচয়ের প্রভাব যা-কিছু আছে, সবই প্রয়োজনের তাগিদে হয়ে যাচ্ছে, এই ক্ষেত্রে একটা mysterious....রয়ে যাচ্ছে সবারই ভেতর—কোন প্রয়োজনে সৃষ্টি? সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা কি? আর সৃষ্টি যেদিন স্রষ্টা হয়ে এলো, যেদিন উদ্ভব হলো—সব নিয়েই হলো। এই 'হলো'টাই কি হয়ে যাচ্ছে, না হতে হতে ঐ 'হলো'রই পরিচয় দিচ্ছে যে এই ভাবেই হয়ে যাবে। এখন এই যে নব নব অবস্থা, নব নব সৃষ্টির ভাব বাহ্য ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যে যে আসছে, এবং এক-একটি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যে যখন আসছে, তখন নব নব ভাব বলে আখ্যা দিচ্ছি—দেওয়াটাই কি দিচ্ছি, না নূতন করে দিচ্ছি? এই যে বৈষম্য এরই খোঁজ ক'রে যখন নেওয়া হয়, তখন দেখছি প্রকারান্তরে দেওয়াটাকেই দিচ্ছি, যখন গ্রাহ্যে এসে পড়ছে। এরকম অগ্রাহ্যে যে কত অবর্ণনীয় জিনিষ রয়ে যাচ্ছে, 'বর্ণনীয়ে'র মাঝে যখন প্রতিটির পরিচয় বর্ণে বর্ণে পেয়ে যাচ্ছি, তখনই এই একটি বস্তুকে নিজেদের মধ্যে বুঝের জন্য বাঁটাবাঁটি করে নিচ্ছি—এখন আমাদের মারামারি হচ্ছে এই নিয়েই; কার ভাগে কতটুকু পড়লো তার মধ্যে যখন আমরা এসেছি, এর ভেতর দিয়েই এই সকল নিয়েই পরিচয়ের পরিচয় দিচ্ছি এই ভাগাভাগির মধ্যে, 'পরিচিত'ই যে পরিচয় হয়ে এই ভাগাভাগির ভেতর যে সেই সত্তা রয়েছে, এই তারতম্যতা দিয়েই সেই বিষয়বস্তুকে সম্পূর্ণ বিকাশ করছি যা বিকশিত হয়ে আছে। এই সংসারের সমাজের সংস্কারের ভেতর এই প্রকৃত বুঝকে বুঝবার জন্য যে সমস্ত ভাষার ও ভাবের উদ্ভব, সৃষ্টিরই যখন এই আর একজাতীয় সৃষ্টির পরিচয় দিচ্ছে, ভাবকে প্রকাশ করবার জন্য আর একজনের নিকটে শব্দের ভেতর দিয়ে নানা শব্দে ও ভাষাতে; সুতরাং শব্দ

কি ভাষা বুঝাবুঝিতেও এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ; প্রয়োজনীয়তা যখন উপলব্ধি ক'রে নেওয়া হচ্ছে, সেই প্রয়োজন দিয়েই মূলকে বুঝে নিতে হবে। তোমাতে এবং আমাতে বুঝবার জন্য বোঝাবুঝি যখন একটু আলোচ্যে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ; এবং তার পরে আরো খোঁজবার বাসনাতে তোমায় যখন আরো detailsএ নিয়ে নেওয়া যেতে পারে, তোমার বিষয়বস্তু-সম্পর্কে এই বাস্তবের ক্ষেত্রে খুঁজে নিলে যেমন খোঁজা সম্ভব হতে পারে, ঠিক এই জাতীয় অবস্থা হতে এবং এই জাতীয় সাহায্য নিয়েই এই ভাব নিয়েই আমাদের এক জাতীয় ভাষার সৃষ্টি করে নিতে হবে সেই ভাবকে বুঝে নেওয়ার জন্য—সেই ভাষা তৈরী করে নিতে হবে। সেই বুঝকে তখন বুঝে নিতে হবে, যে বুঝ বুঝেতে বুঝে রয়েছে, এবং পরিচয় ঠিক সেই ভাবে করে নিতে হবে, যেই ভাবে এই ক্ষেত্রে, এই জায়গাতে, যে ভাবে যে সম্পর্কে যে জাতীয় কার্য্যকলাপে, যে জাতীয় ভাবাভাবির মধ্যে ভাবকে প্রকাশ করে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে ; এর উপর নির্ভর করেই এই জাতীয় যে বুঝে চলে যেতে হবে চলে-যাওয়ার মধ্যে সে বস্তুকে অবগতে আনার জন্য, আবার বস্তু যে অবগতে আছে তা বুঝবে যখন বোধে আসবে। তাই আলাপের প্রতিটি ক্ষেত্রে যখন যে বিরাজ করে, প্রয়োজনের তাগিদেই আর একজনকে জিজ্ঞেস ক'রে তার বার্ত্তাকে জেনে নেওয়া হয়। তাই বুঝের এক যে বুঝ তোমাতে রয়েছে, তার আভাস ভাবের ভেতর দিয়ে যে ভাবকে প্রকাশ করছে শব্দে, ভাষাতে, সেই ভাষা দিয়েই যখন আবার ভাবকে, প্রয়োজনীয়তাকে প্রয়োজনরূপে এনে এনে প্রত্যেকটির পথ যে জেনে নিয়েছে, এই জানাজানির মাঝেই জেনে নিতে হচ্ছে জানা-বস্তুকে, তাই 'জানার পথে জানাকে জাগিয়ে জেনে যাওয়া'—সাধনা নাম এই ক্ষেত্রেই অভিহিত হচ্ছে ; তাই আমাদের ক্ষেত্রে সেই অবস্থাকে এনে সেই সাধনাতে মেতে যেতে হবে, যা সাধাতে আছে তা'ই সাধ্যে আনতে

হবে।' এভাবে তিনি আমাদের সব সময় এই সমস্ত বুঝাতেন।

বহু সম্প্রদায় হতে বহুজন এসে এই মহানের সাথে আলাপ-আলোচনা করেছেন এবং তারা প্রত্যেকেই যে তৃপ্তিজনক আলো পেয়েছেন তা দেখেছি। তিনি বলতেন, 'যে যে অবস্থাতে ব্যক্তি-বিশেষে যে যার পরিচয় দিচ্ছে—এক জাতীয় পরিচয় তো ঠিকই দিয়ে যাচ্ছে। একজন সন্নাসীর বেশে ত্যাগের ভেতর দিয়ে দেখাচ্ছেন।তনি সন্ন্যাসী, একজন ভাবে পড়েছেন, তার ভেতর দিয়ে দেখাচ্ছেন 'মাতৃ-আবির্ভাব'—এও এক জাতীয় সাধনা ; কি ছলনাতে, কি প্রবঞ্চনাতে, একটা পরিচয় তো প্রকারান্তরে দিয়েই যাচ্ছে ; কতটুকু গ্রাহ্যে এসেছে এবং সে জিনিষটা বুঝাতে চাচ্ছে, সেই স্বরূপটিকেই তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এবং স্বরূপ-সম্পর্কে যে সমস্ত defination রয়েছে, তাতে যা যা ওর বুঝের মধ্যে আছে, সেই বুঝটুকুই ওদের জানিয়ে দেওয়ার জন্য এবং সেটুকু যে প্রকাশ করছে সেই শিবভাবে, মাতৃভাবে, সেই দশার ভাবের ভেতর দিয়ে। তোমার এই অবস্থা ছলে যদি হয় তবে ঠিক আছে, নকল যদি হয় এই অবস্থার জন্য তুমি ঠিক আছ, মিথ্যার জন্য যদি হয় তবেও ঠিকই আছে।'

তিনি নানাভাবে প্রত্যেকটি অবস্থাকে, তাঁর গুণ যা রয়েছে, তা'ই তিনি ভাগে ভাগে বুঝাতেন ও বুঝিয়ে দিতেন। তিনি আরো বলতেন, 'তোমার বুঝ যখন এখানে রয়েছে, জেনে নিচ্ছ ঐ বুঝটুকুনু হতে এই জাতীয় বুঝে কেন এলে ; সংশোধন রূপ যে ভাষা ব্যবহার করছো, সেখানে তোমার এই অবস্থার জন্য সেই বস্তুকে এই জাতীয় চেহারায় দেখিয়ে তুমি তোমার বিষয়বস্তুতে সজাগ থাক ; তবে যদি তুমি বল 'ঐ বস্তুদ্বারা আমি জগতকে দেখাবো'—ঐ বস্তুকে কেন উপহাসে পরিণত করছো ? যদি তুমি বল 'আমার শিব এখন উপহাসে আছেন', তা হলে সে বস্তু-সম্পর্কে জানিয়ে দেবে 'আমি এখন

উপহাসে আছি' ; সর্ব্বভূতে যদি দেখাতে হয় তবে বিভিন্নতে পরিচয় দিয়ে প্রত্যেকটির পরিচয় দেবে যে ভূতের আশ্রিত তুমি রয়েছ। যখন প্রলয়ে থাক, বলবে 'প্রলয়ে আছি' ; যদি ছলে থাক, বলবে, 'ছলে আছি'।' ঠাকুর এই ভাবে প্রত্যেকটি বিষয়বস্তু আলোচন করতেন। যার যা বিষয়বস্তু, তা নিয়েই তিনি এগিয়ে যেতেন ; এবং তার বিষয়বস্তু-সম্পর্কে সে কতটা জানে, তা তিনি নাড়াচাড়া করে দেখতেন।

ঠাকুর বলতেন, 'আমার যেই বস্তুর যতটুকু উপলব্ধি, যতটুকু তার সত্তা জানা গেছে, সেই জাতীয় আবহাওয়াতে যেতে হলে এবং জেনে নিতে হলে ঠিক সেই জাতীয় সাধনার কতকগুলো প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, যেই প্রয়োজনীয়তা বহু ভাবের বহু সাধনার বহু অবস্থার সঙ্গে সেগুলো মিশিয়ে মিশিয়ে কার্য্যকরী করে ; ঠিক একই আবহাওয়াতে যেমন বহু ভাষা রয়েছে, প্রত্যেকেই যেমন যার যার ব্যক্তিগত ভাবকে প্রকাশ করছে, সেই 'ব্যক্তিগত'কে প্রকাশ করার জন্যই এত সমস্ত ভাষা, ভাবও এক—ভাব এক, ভাষা এক, বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন ভাষা একই ভাবকে প্রকাশ করার জন্য। তাই সাধনাও ঠিক সেই জাতীয়তার মধ্যে রয়েছে—কেহ মূর্ত্তির ভেতর দিয়ে আসছে, কেহ শূন্যের ভেতর দিয়ে আসছে, কেহ নাস্তিকতার মধ্য দিয়ে আসছে, অজস্র পথের মধ্য দিয়ে আসছে ; আসার পথে যে বিঘ্ন, সেটুকু ছুটিয়ে দেওয়ার জন্য যা দরকার, এমন একটা canal করে নিতে হবে যাতে সেই canalএ গেলে তার সমস্ত জলের গতির মত তার গতি যেন বয়ে যেতে পারে, সেই canalএ যেন তাকে সাগরের মুখে নিয়ে পৌঁছে দিতে পারে— ঐ জাতীয় একটি canal করে নিতে হবে। যেখানে যেখানে জানা-অজানার মধ্যে বিরাজ করছে, বিভিন্ন বাঁধাতে বিভিন্নরকম পথ এসে দাঁড়িয়ে যেতে পারে।'

তিনি যে পথ দর্শিয়ে দিচ্ছেন, পথের অন্বেষণ যে ক'রে দিচ্ছেন, তাতে তাঁর মতবাদকে কোন অবস্থা হতে চ্যুত করা হয় না; যেমন ডাক্তারের ঔষধাদি থাকে, ডাক্তার একজন, বিভিন্ন রোগের বিভিন্ন ঔষধ, তাতে যেমন ডাক্তারের বিক্ষিপ্ততার পরিচয় হয় না, তার policy থেকে যেমন চ্যুত হয় না, তার principle যেমন একই রয়েছে, ঔষধ কথাটি তার ঠিকই রয়েছে, ব্যবস্থা বিভিন্ন হতে পারে রোগ বুঝে বুঝে। কিন্তু তাঁর মূল উদ্দেশ্য কি?—রোগের উপশম, রোগ থেকে মুক্ত করা। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে তাঁর কয়েকটি কথা, 'অজানার মাঝে যে যাতনা জানার জন্য, সেই যাতনার যে যন্ত্রণা, তাকে মুক্ত করার জন্য যে ঔষধের ব্যবস্থা প্রয়োজন, সেই অনুযায়ী হয় ব্যবস্থা, তাতেও principle কিংবা policy কখনও নড়চড় হয় না, ঐ তাঁর principle, ঐ তার policy; তাই ঐ যে উপশম করে নিচ্ছে, অজানা হতে জানাতে আনার জন্য যে উপশম, উপশমে যাওয়ার জন্য যা-কিছু করা দরকার, তা'ই করতে হবে।' এইভাবে এইভাবে তিনি বহু লোককে বহু রকম উপদেশ দিতেন এবং মনের ভেতর যে সমস্ত আবিলতা নিয়ে আসতো তার মুক্ততা তিনি করে দিতেন।

একদিন আমাদের তিনি বুঝাচ্ছেন, 'এই যে বিভিন্ন মত, বিভিন্ন পথ, যে-কোন ব্যক্তি সমস্ত পথকে মত করতে পারে, আবার মতকে পথে আনতে পারে, যেমন তোমরা যখন সাগরে স্নান কর, ডুব দেও, তখন বললে, 'আমি সাগরে স্নান করে এলাম'; বায়ু যখন সেবন কর, এই বিশ্বের বায়ুকে সেবন কর, যখন খাওয়াকে উদরস্থ করছো, তখন দেখা যাচ্ছে বিশ্বের সমস্ত খোরাককেই যেন উদরস্থ করা হচ্ছে, আবার এই বিশ্বের যত রাস্তা আছে সমস্ত রাস্তাই তোমার পথের কার্য্য করছে। যখন যে পথে তোমার যাওয়ার ইচ্ছা হচ্ছে—এই যতরকম পথ রয়েছে এই সাধনমার্গে,

সারমর্ম্মে সবই তোমার মতে আছে। যত মূর্ত্তি রয়েছে, প্রত্যেক মূর্ত্তির চিন্তাতে তুমি একটা কামনার মধ্যে রয়ে যাচ্ছ। অনেকে প্রতিবাদ করে—ভিন্ন-ভিন্ন মূর্ত্তির চিন্তাতে কোন কিছুই হবে না। এই সমস্ত মূর্ত্তি ইত্যাদির মূল বিষয়বস্তুকে যদি বুঝে নিতে পার, তবে যে-কোন মূর্ত্তিতে সেই মূলেরই কার্য্য করবে। একটা তারের যন্ত্র যখন বাজানো হয়, তবলা না থাকলে যেমন একটু আলুনি লাগে, তবল হলে যেমন তা একটু স্বাদে এলো, তার সাথে যদি টুংটাং আরো কয়েকটি যন্ত্র থাকে, তবে মনে হয় যেমন আনুষঙ্গিক কয়েকটি বাজনারই সাহায্যকারী হয়ে যাচ্ছে; যিনি বাজাচ্ছেন তিনিও বেশ তন্ময়ে আরো সুর সাধছেন তালে তালে। তাই বিষয়-বস্তু যদি সাধা থাকে, সাধবার ইচ্ছা থাকে, তবে এ জাগতিক সমস্ত বিষয়বস্তু এই যান্ত্রিকের সাহায্যকারী হিসাবে টুংটাংয়ের কার্য্য করবে, তাতে চাঞ্চল্য না হয়ে সাহায্যই হবে। প্রত্যেকটি আব-হাওয়ার অবস্থা সেই ভাবে সেই ভাবে প্রকারান্তরে সাহায্যার্থে তাল দিয়ে তার সহযোগিতা করে যাচ্ছে; যতরকম পথই থাক না কেন, প্রকারান্তরে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক পথের সাথে সাথে প্রত্যেকের প্রত্যেকের একটা যোগাযোগ রয়ে যাচ্ছে। এখন নৌকাযোগেই হউক আর অন্য যানবাহনেই হউক, এই যে যাওয়ার মাঝে আর একটি সাহায্য নেওয়া যানবাহন ইত্যাদির, পরবর্ত্তী ব্যবস্থা এগিয়ে যাওয়ার জন্যই যে সাহায্যকারীর একটি অবস্থা-বিশেষ; তবে নিজের ইচ্ছামত যদি অন্ধকারে আনাগোনা করা যায়, তবে রাস্তায় রাস্তায়ই একটা ভ্রান্তির মাঝে ঘুরতে পারে, কিন্তু এই ভাবে আবার নিজে নিজে সংশোধিত হচ্ছে যখন একই জায়গায় বার বার দাঁড়াচ্ছে—ঐভাবে আবার ঘাতে প্রতিঘাতে নিজের রাস্তা নিজে করে নিচ্ছে। মাঝখানে যদি জানবার মত কেউ থাকে, দেখে জেনে নিয়ে সহজ ক'রে নিয়ে যেতে পারে, এক জাতীয়

সহযোগিতা প্রকারান্তরে এই universal আইনেই সব-কিছুর মত, যা তোমাতে বিদ্যমান রয়েছে, এই জাতীয় অবস্থা সে সব সময় মিটিয়ে নিচ্ছে, সেই মেটানো বস্তুর সম্মুখীন হয়ে যে মিটিয়ে দেওয়ার কার্য্য করছে, সেই প্রকারান্তরে সমস্ত মত কিংবা পথ যা-কিছু যে জাতীয় যার প্রয়োজন ঠিক সেই ভাবে তা করে নিচ্ছে। তাই বিভিন্ন পথও প্রত্যেকের পথ, বিভিন্ন মতও প্রত্যেকের মত, আবার বিভিন্ন ভাবেও যে প্রত্যেকের পথ রয়েছে—এও এক জাতীয় মত ও পথ; যেমন তুমি একই ছবিতে বহুকে দেখতে সমর্থ হচ্ছ, একই দৃষ্টিতে এতগুলোকে দর্শিয়ে দিচ্ছে—শ্রবণেও তাই ঘ্রাণেও তাই, জিহ্বাতেও তাই; এই বহুকে যেমন একে আনছে—বহু মতও আমারই পথ, আবার বহু পথই আমারই মত। একই শক্তিতে যে এই সমস্ত শক্তি বিকাশ করছে, যেই শক্তি বিকশিত হয়ে আছে, তাই তোমাদের পূর্ব্বেও বলেছি 'আছে শক্তিকেই জাগিয়ে নিচ্ছি বা জেনে নিচ্ছি।' যাক্—তোমাদের এক ক্ষেত্রে এই সংসারের যা-কিছু হচ্ছে, যা-কিছুর পরিচয় পাচ্ছি এবং যত কিছু সূক্ষ্মে, অগোচরে, অন্তরালে আরো আড়ালে আবার যা রয়েছে, সব-কিছুই প্রকারান্তরে তুমি, যখন এত ভাবে এত অবস্থাতে রয়েছ তুমি, তোমাকে ঐ জাতীয় অবস্থাতে আবার সাধনা ক'রে ক'রে তোমাকেই তোমার শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনার মত অঙ্গকে চালনা করে, শারীরিক শক্তিকে যেমন বৃদ্ধি করা হয়, যে শক্তি সঞ্চিত রয়েছে সেটাকেই, ঠিক তেমনি এই সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টি তোমার এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত কার্য্য করে যাচ্ছে, তুমি যে 'বহু'কে সঙ্কোচন প্রসারণ—অঙ্গের নানা ভঙ্গিমার ভেতর দিয়ে মহিমার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছ, সেই জাতীয় সাধনাই তোমাদের করিয়ে নেওয়া হচ্ছে, প্রকারান্তরে তাই গিয়ে দাড়াচ্ছে, 'জানাকেই জেনে যাওয়া,' তাই ভাববার একই কথা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই বার বার বলছি সেই একই কথা।'

এভাবে আমাদের বুঝাবার জন্য ঠাকুর বলতেন, 'দেখ, এই-যে আমাদের মনে যে confusion, এর উদ্ভব কোথা হতে হচ্ছে—এই যে জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন, নানা ভাবাভাবির পরিচয় দিচ্ছে নানা প্রশ্নের ভেতর দিয়ে, নানা মতামত ছাড়ছে, নানা সমস্যার বাণী ছাড়ছে, নানা প্রশ্ন উদ্ভব ক'রে যেই ভাবে যেই ভাবে যত প্রকারে যা করে যাচ্ছে—এই যে একটা, এগুলো সব-কিছু guide করছে—বুঝতে চাই বুঝতে পারছি না, সন্দেহ করি সন্দেহ করি না, হতে পারে হতে পারে না, তারপর কি জানি কি ব্যাপার, তার মধ্যেও আবার নানা সূক্ষ্মভাব খেলে যাচ্ছে। কি যশে, মানে, প্রতিষ্ঠাতে, কার কোন্ অবস্থাতে, কার কোন্ প্রশ্ন উদ্ভব হলো, জিজ্ঞাসা উদ্ভব হলো, কোন্ গতিবিধির পরিচয় কোন্ কোন্ সূক্ষ্মে দিয়ে যাচ্ছে—সেটা হলো পরবর্ত্তী কথা। এই যে এতগুলো অবস্থা, যে অবস্থা এগুলোকে নাড়াচাড়া করছে, সেই অবস্থাটা কোথা থেকে এলো, তাকে যদি খোঁজ করা যায়, এই অবস্থায় যে তুমি, তা হতে যদি ক্রমশঃ ক্রমশঃ বত্রিশ বছরকে পিছিয়ে এক বছরে পরিণত করা যায় বা তিন মাসে পরিণত করা যায়, এই যে বুঝটুকু বা এই যে 'কে?' এখন তুমি চালিত হচ্ছ যার দ্বারা, তখন ঐ তিন মাসের শিশুর ভেতর কোন অবস্থায় ছিলো?—ছিল ঠিকই, নতুবা কেন হলো; এখন ঐ যে ছিলো, 'ছিল' অবস্থায় ছিলো, তাকে যদি ভাবা যায় তখন এমন একটি অবস্থায় ছিলো—দেখে দেখে না, শুনে শোনে না, যেন একটা এলোমেলো ভাব, যেন শিশুর ভাব, শিশু বলতে যে ভাব, সেই অবস্থা হতে এই এত বৎসর আসতে আজ যে ভাবটি তোমার হয়েছে, প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী তা সম্ভব হয়েছে, এবং এই আবহাওয়া হতে তো তা সম্ভব হয়েছে। যে যার পথেই হউক, আর মতেই হউক, সংস্কারের পথেই হউক, আস্তিকই হউক, আর নাস্তিকই হউক, কিন্তু বছরের শেষে যে বৃত্তিগুলোর পারচয় দিয়ে যাচ্ছে, প্রকারান্তরে

কিন্তু এক ভাবের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, নানাভাবে নানাজনেতে। এখন আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন যে যত বেশী পেয়েছে, তার চিন্তা-শক্তি সে ততটা বেশী দিয়েছে। আজ তোমার যে জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন বা চাঞ্চল্য, নানারকম বৃত্তি, যে কথা তুমি বললে, হঠাৎ কারো নিন্দা করলে না-জেনেই, হঠাৎ কারো সম্পর্কে মন্তব্য করলে না-জেনেই, হঠাৎ তুমি মিছে কথা বললে নিজেকে সাজাবার জন্য, হঠাৎ যশে তুমি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নানা ছলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলে, আবহাওয়াটা তোমার এতটুকুনু শিক্ষণীয় ছিল, যা তুমি শিখে নিয়েছ, এবং মনটা ঐভাবে ঐভাবে গড়তে গড়তে এই জাতীয় অবস্থায় এসেছে; কিন্তু একটা বুঝ যে ছিল, যে বুঝে তুমি এই জাতীয়ে এসেছ, ঐ বুঝটুকুনু প্রায় সবার ভেতরই আছে; ঠিক তোমার কাছে যখন একজন বসে আছে ও খুব চিন্তা করছে, হঠাৎ কোন মন্তব্য করার আগে চিন্তা করে মন্তব্য করছে, সন্দেহ করার আগে জেনে নেওয়ার ইচ্ছা রয়েছে, জেনে নেওয়ার আগ্রহ রয়েছে, দেখা গেল, তার শিক্ষণীয় আবহাওয়া এই জাতীয় পরিচয় দিচ্ছে। সে কোন অবস্থাতে নিজেকে ছলনায় প্রবঞ্চনায় মিথ্যায় জড়িত করে যাচ্ছে না, যতটুকু সত্য ততটুকু সে করছে—এই হলো এক জাতীয় বুঝ, এই হলো এক জাতীয় অবস্থা। যে বুঝ তোমাতে move করছে, তোমার বুঝ ও এ বুঝ এক জাতীয় বুঝ, যতটুকু তার অনুভবে আসছে, সে ততটুকুনু করে যাচ্ছে, তোমার যে ঐ বুঝ তা করে যাচ্ছে, তুমি যে সত্যভাষী, প্রত্যেকগুলো বুঝে জেনে যে মন্তব্য করছো; ঐ যে তিন মাসের শিশু দিন দিন বেড়ে বেড়ে যে 'তুমি'—তুমি যে সমস্ত অপরাধমূলক কার্য্য করছো, যা এই সমাজে অপরাধ বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা তুমি করে যাচ্ছ, তার পরও যে এই বুঝ, এখন যে আমি তিন মাসের শিশুর মত একজাতীয় বুঝে না রয়েছি তা কে জানে?

তাও কিন্তু বুঝে বুঝে জেনে নিচ্ছে ; এই বুঝটুকু যে, আমার কাছে এলোমেলো শিশুর বুঝের মত না, তা কে জানে ? এই যে ক্রমশঃ ক্রমশঃ যে পরিচয় দিচ্ছে, ক্রমশঃ ধাপে ধাপে পরিবর্ত্তন হয়ে আসছে তিনমাসের শিশুর মত, পরবর্ত্তী যে আরো অজস্র পরিবর্ত্তনের মাঝে যেতে হবে, কোন বুঝের কাছে যে আর একজাতীয় 'তিনমাস' আছি কিনা কে জানে ? প্রত্যেক পরিবর্ত্তন, যত পরিবর্ত্তনেই যাচ্ছি না কেন, কে জানে একথা বললে তো চলবে না ? সেটাই স্বাভাবিক কোন অবস্থা, এখন চিন্তা করলে বুঝে নেওয়া যায়। পরিবর্ত্তনের মাঝে যখন একটি পরিবর্ত্তনের পারচয় দিচ্ছি, এই 'মাঝেতে' এই যে বিভিন্ন বিভিন্ন ভাব, বিভিন্ন মনের যে এক-এক মনে পরিচয় দিচ্ছে, আগের পরিবর্ত্তনই বুঝিয়ে দিচ্ছে, যেমন বড় লোকের ছেলে ভাল খাচ্ছে, ভাল জায়গায় থাকছে, তার স্বাস্থ্য তারই পরিচয় দিচ্ছে ও maintained হয়ে যাচ্ছে, বুঝও maintained হয়ে যাচ্ছে। ঠিক এই আবহাওয়ায় তেমনি যে জাতীয় vitalityর পরিচয় দিচ্ছে, ঠিক অবস্থায় আবহাওয়ায় যা পরিচয় দিচ্ছে, হয় চির বুঝে বুঝিত, না হয় চির শিশু ; আর একটি যে অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে, সেই অবস্থায় আর একটি বুঝে নিয়ে এগিয়ে চলছে বুঝের দিকে। তাই এই যে বিভিন্ন অবস্থা—শিশু অবস্থা হতে যে যুব-অবস্থা প্রাপ্ত, ফলে ঠিক তার আবহাওয়া হতে যতটুকু পাচ্ছে ততটুকুই পরিচয় দিচ্ছে, policyকেও ঠিক ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে বিভিন্নের জন্য বিভিন্ন-অবস্থায় আসতে হবে। দরিদ্রতার ভাবে একেবারে 'দরিদ্র' খাওয়া, তাতে যখন সেই সেই জাতীয় শারীরিক অবস্থার পরিচয় দিচ্ছে, সেই শিশু আবার যখন ক্রমশঃ ক্রমশঃ চার বছর, আট বছর, ষোল বছর, তখন ঠিক ততটুকুরই পরিচয় দিচ্ছে, প্রকারান্তরে এই বুঝাবুঝিতেই বিভিন্ন অবস্থার পরিচয় দিচ্ছে। শিশুকে যখন আদর করছো, তুমি শিশু-অবস্থায় পরিণত হচ্ছ, এবং

এর ভেতর দিয়ে কত অবস্থার stage দিয়ে আসতে হচ্ছে, তোমার একই policy দিয়ে ঐ সমস্তের সঙ্গে treatment করে আসছো, এবং তুমি যখন শিশুর সঙ্গে খেলা কর, তখন বার্দ্ধক্যতার পরিচয় দিচ্ছ না। কার কোন শিশু অবস্থা, বার্দ্ধক্য-অবস্থা, যুব-অবস্থা, ঠিক বত্রিশ বছর এত জনের সাথে সাথে যখন নিজেকে মিশিয়ে যাচ্ছ, প্রত্যেককে যখন বিভিন্নতার গতিবিধিতে চালিয়ে নিতে হয়, ওর অবস্থার সঙ্গে মিশিয়ে তোমার আদরটাকে ওর আদরে মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছো, stage by stage করে আসছো, তুমি তোমার আদরকে অন্তরকে ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য করে আসছো— ওটাই তোমার পক্ষে correct, ওটাই তোমার law। এইভাবে বিভিন্ন রকম অবস্থাতে বিভিন্ন রকমে চালিয়ে নিতে হয়।' এমনি করে প্রত্যেকটি বিষয়বস্তুকেই তিনি তন্ন তন্ন করে দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দিতেন।

আমাদের দীর্ঘকালীন সংগ্রহের মধ্যে কিঞ্চিৎ মাত্র আজ এই গ্রন্থাকারে সর্ব্বজনসমক্ষে প্রকাশ করছি। সেই দিক্ থেকে আমাদের এটুকু জানিয়ে দেওয়া দরকার যে, মূল সংগ্রহ লিপিতে যে-ভাবে লিপিবদ্ধ করেছিলাম, এই গ্রন্থে তা অবিকল সে-ভাবে উদ্ধৃত করেছি; কারণ, আমাদের পক্ষে সেই উপদেশবাণীর যে-কোন অংশে কারুকার্য্য করা সীমাহীন ধৃষ্টতা মাত্র। যদি কোনপ্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়, তবে তাঁর উপদেশকালীন আমাদের লিপিকরণে অক্ষমতার জন্যই ঘটেছে।

দীপান্বিতা, ১৩৫৯

শ্রীঅজিত ভট্টাচার্য্য
শ্রীশান্তি দাস মজুমদার
শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

—বিশেষ দ্রষ্টব্য—

এই গ্রন্থে সত্ত্বা স্থলে সত্তা গ্রহণীয়।

৫৭ পৃষ্ঠা—১৮ লাইনঃ—ক্ষমতা স্থলে সমতা গ্রহণীয়।

শ্রীবীরেন্দ্রবাণী

এক

"বৃত্তির নিবৃত্তি—তাহাই যে স্বাভাবিক রীতিনীতি, প্রাকৃতিক গতিতে তাহাই যে প্রকৃতি, সেই নিয়মানুযায়ী তাহাই ; সৃষ্টির প্রারম্ভে যে প্রসূতির অবস্থা বা উদ্ভব, তারপর যে যাতনা, তারও প্রয়োজনীয়তা, সেই যাতনাতেই প্রসবের সূত্রপাত। তাই আদি সৃষ্টির কোন্ যাতনার কোন্ দানে, কার প্রভাবে আজ সৃষ্টি ? কোন্ বৃত্তির নিবৃত্তিতে আজ ব্রহ্মাণ্ড ? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যেকটি প্রসবের প্রসব করে করে প্রত্যেকটি সত্ত্বার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে তার ভেতরে।

প্রথম হতে যদি সৃষ্টিকে ধরে নেওয়া যায় বা চিন্তা করে নেওয়া যায়, করতেই যে হবে, কারণ রয়েছি মোরা, রয়েছে সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড। সেই ব্রহ্মাণ্ড যাহা হতে উদ্ভব, আগমন এক-একটি আগমনেতে, উদ্ভবেতে আজ ব্রহ্মাণ্ড বা বিরাট যাহা জীবজগৎ বিরাট বলে বর্ণনা করতে পারছে ; বিরাট একটি হতেই উদ্ভব, সেই উদ্ভব হতে যে সম্মিলিত অবস্থা, সেই সম্মিলিত অবস্থা হতে প্রসব করে প্রসব করছে আর একটি ব্রহ্মাণ্ড।

আজ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হতে যে আর একটি গতি নিয়মানুযায়ী চলছে বা গতি পাচ্ছে বা হচ্ছে; নিশ্চয়ই সেথা হতে আগমন তিনি বিরাট, তাহাতে ছিল বিরাট শক্তি, ছিল তাতে হল এতে; সেই জাগ্রত অবস্থা আয়ত্ত এই জাগ্রত অবস্থাতে। তাই প্রতি মুহূর্ত্তে জাগ্রত অবস্থা হতে বর্ণনা করে করে দিচ্ছে এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, এই ব্রহ্মাণ্ডে যে সমস্ত concentrated হয়ে রয়েছে এবং 'রওয়াকে' যে বুঝে নিয়েছে এবং বুঝকে নিয়ে যে এমনি করে জেনে যে delivery দিচ্ছে; তারই মত আর একটি রূপকে দিয়ে তার সত্ত্বার সম্পূর্ণভাবে পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে তাতে; তাতে এই বুঝা যায়, যা ছিল জীবজগৎ তা পাচ্ছে এবং তাহা হতে যা উদ্ভব হয়েছে তাহাতেও রয়েছে; তাতে এই বুঝা যায় যে, আদ—আজও জীবজগৎ সেই আদির মধ্যে রয়েছে—অন্তে ত আর যায় নাই—অন্ত কোথায়? অন্তে যে যায় সে আদিই রয়ে যায়; তাতে এই ক্ষেত্রেই চিন্তনীয় প্রত্যেকের জীবজগতের ব্রহ্মাণ্ডের এই ক্ষেত্রেই প্রয়োজন। কি প্রয়োজন? প্রয়োজন সৃষ্টির যে কোন অবস্থাতে যে কোন জীব সর্ব্ব অবস্থাতে সর্ব্ব অধিকারে বিরাজ করছে; তা না হলে ব্রহ্মাণ্ড যখন সৃষ্ট—আবার সে যদি সমস্ত ক্ষমতা নিয়ে উদ্ভব হতে পারে, সমস্ত বৃত্তি নিয়ে উদ্ভব হতে পারে, সে যদি সর্ব্বজ্ঞ হতে পারে, আমরা তাহা হতে বঞ্চিত হতে পারি না; তবে সমস্ত জীবজগতের বৃত্তি ইত্যাদি উন্মুক্তভাবে প্রকাশিত না হওয়ার অবস্থা রয়ে যাওয়া কেন? সর্ব্বতোভাবেই যে তার সব-কিছু খোলা—অবস্থা ভেদে নানা ভেদে দূরত্বে চলে যাক্, ব্যবধানে চলে যাক্, নিকটে চলে যাক্, নিকটতমে চলে যাক্, জানাতে চলে যাক্, অজানাতে চলে যাক্, চির-বিচ্ছেদের মত চেহারায়ও যদি চলে যায়, শক্তি বিনে সে যেতে পারে না, শক্তি ছাড়া সে যেতে পারে না; শক্তিরই যে পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে—বিরাটেরই পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে বিক্ষিপ্ততাতে, একাগ্রতাতে, জ্ঞানেতে, অজ্ঞানেতে, জানাতে, অজানাতে,

বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নতে পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে এই মহাশক্তির দ্বারাতে—যেখানেই একটা অবস্থার সম্মুখীন গিয়ে দাঁড়ায়, সে জিনিষটা হল যে জিনিষ হতে আগমন তার নিকটতম অবস্থা, যাহা স্থিত রয়েছে নানারকম ভাবে—বিক্ষিপ্ততা বা বহু দূরে চলে যাওয়া—মিলনতা যে কতদূর বাকী, হবে একদিন, দিন যে কোন্ দিন আসবে তা বলা যাচ্ছে না ; যখন উদ্ভব তার আবার মিলন সহজভাবে সহজাত যাহা রয়েছে, তাহা দিয়েই তার নিকটে অথবা সে যে সব-কিছু সর্ব্ব-শক্তির মিলিত যে অবস্থা, সেই স্বরূপটিকে সম্পূর্ণভাবে বুঝে পূর্ণের যে পূর্ণ এই অবস্থার অবস্থাকে অবগত হয়ে পূর্ণের অবস্থায় পূর্ণের দ্বারাই যে সম্ভব সেই পূর্ণকেই পূর্ণরূপে পূর্ণ করা। সেই সমস্ত আদি সৃষ্টির যে চেতনা, সেই চৈতন্যতে যার প্রয়োজনেতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি, সেই সমস্ত sensitive part অথবা cell বা অণু-পরমাণু ইত্যাদি খুব dazzling condition and movementsএ সব সময়ই রয়েছে যে স্রষ্টার অবস্থা, সেই অবস্থাকে সেই balance সেই মাত্রাতে যদি আয়ত্ত করে করে ব্রহ্মাণ্ড হতে পারে, আবার ব্রহ্মাণ্ডের সত্ত্বাকে যেই qualityগুলো আয়ত্ত করে জীবজগৎ যদি প্রকাশ হতে পারে, আবির্ভাব হতে পারে, সমস্ত বস্তু, সমস্ত dazzling cell যেই আদিস্রষ্টা সৃষ্টির যে কোন একটির ভেতরে সেই অবস্থা যদি maintained অবস্থায় যদি maintain করে যাওয়ার মত অবস্থা, রাখার মত অবস্থা, আদির অবস্থা যদি আদি করে রেখে দেওয়া যায়, প্রকারান্তরে কিন্তু সমস্ত অবস্থা রয়েছে, সৃষ্টির বিভিন্নতার মধ্যে যে বর্ণিত অবস্থা, তাদের মধ্যে যে নানারকম সিদ্ধি, মুক্তি, নির্ব্বাণ অবস্থা, এই অবস্থাগুলো যে কথিত বর্ণিত অবস্থা বলে বর্ণিত, প্রকারান্তরে সর্ব্ব অবস্থায় সর্ব্বজীবের মধ্যে সব-কিছু রয়েছে, সেই সমস্ত জীবের ভেতরে যে কোন পার্থক্যতার ভেতর এবং সমস্ত সত্ত্বা যাহা আদি, সেই আদিকেই যদি এই জীব-জগতের যে কোন একটির মধ্যে আয়ত্ত করে রাখা যায়, যাহা রক্ষিত

অবস্থায় রয়েছে, সে অবস্থাটি জাগ্রত অবস্থায় জাগ্রত জিনিষগুলোকে, সুপ্ত অবস্থায় বলে যে বর্ণিত রয়েছে এই জীবজগতে, সেই অবস্থায় যে সুপ্তরূপটি সুপ্ত অবস্থা হতে বঞ্চিত করে জাগ্রত রূপটিকে সম্মুখীন করে, সেই জাগ্রত আদি; সেই আদিই যদি maintained হয়ে পার্থক্যতে আসে, তবে সে কি হবে? আদির মত স্রষ্টা, আদির মত সর্ব্ব অবস্থা, সব-কিছু যে একটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার অবস্থা সে পাচ্ছে, এর আগেই যে বলা 'পাবে' কি 'পাচ্ছে' প্রযোজ্য নয়, সে জিনিষকে যে বুঝতে পারছে বলে, পাচ্ছে বা পাবে বলে বর্ণিত রয়েছে, তাই চলতি কথায় অনেকটা বলতে হবে, না হলে যে সমাধান হচ্ছে না। সেই বিরাটের কথা নিয়েই আলোচনাতে, লেখনীতে, expressionএ ভাব-প্রকাশে বড্ড অসুবিধাজনক অবস্থার উদ্ভব হচ্ছে, এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই সৃষ্টির জীবজগতে—এক-একটি গ্রহে, উপগ্রহে, পৃথিবীতে বহু মহান্ ও দেবতার আবির্ভাব—বহু গ্রন্থে, শাস্ত্রে এ সমস্ত বর্ণিত রয়েছে—বিচার্য্য যখন যেখানেই আমাদের রয়েছে এবং জীবজগতের জনমানব যা-কিছু এই শাস্ত্রগত হতে জেনে এক-একটি পথ পদ্ধতিতে কাজ করে যাচ্ছে যে যার আরাধ্যের চিন্তায়। এই মহান্‌রা যাঁরা এসেছেন—তাঁদের মত পথ—এক-একজন এক-একটি অবস্থায় চলে গেছেন, তাঁরাই সে-সমস্ত মতবাদ তাঁদের ভক্তদের দিয়ে গেছেন, সবাই, প্রত্যেকের উদ্দেশ্য সেই বিরাট পুরুষকে বা বিরাটকে জানা, কার কি মতবাদ, যে যাঁর পন্থা দিয়ে গেছেন।"

এখন আমরা যাঁর কথা বলছি, তাঁকে মহান্ বলা যাক্, অবতার বলা যাক্, অতিমানব বা মহামানব বলা যাক্ অথবা আর যে কোন আখ্যাই দেওয়া যাক্ না কেন, তাঁর জীবনী, দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ, মত বা মতবাদ সম্পর্কে কিছু বলতে বসে যতটা আমাদের প্রত্যক্ষের মধ্যে এসেছে এবং যে-ভাবে যা উপলব্ধি করেছি, সে-ভাবেই তাঁকে প্রকাশ করে যাবো।

বহু মহান্ যাঁরা এসেছেন তাঁদের দেখেছি যে সাধনা তাঁরা করে গেছেন ও ভক্তদের জানিয়ে গেছেন, ভক্তরা তাহাই সমাজে লেখনীতে বিলিয়ে গেছেন। আমরা যাঁর সম্বন্ধে লিখছি তাঁর ব্যক্তিগত মতামত ও কার্য্যকলাপ খুব সহজ অনাড়ম্বর জীবন-যাপন-প্রণালীর মধ্যে রয়েছে। তাঁকে কি বলে প্রকাশ করবো, কোন্‌টা বললে ঠিক হবে, যে-ভাবেই প্রকাশ করতে যাই না কেন, মনে হয় কিছুই বলা হলো না, সবই যেন বলার বাকি রয়ে গেল। সুতরাং যার যার ব্যক্তিগত মতামত যা গড়ে উঠবে, সেটা মনে গেঁথে রাখাই সমীচীন মনে করি।

ঠাকুর শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বর্ত্তমান বয়স বত্রিশ বৎসর। বাংলা তেরশ' সাতাশ সালে ঢাকা বিক্রমপুর মেদিনীমণ্ডল গ্রামে প্রসিদ্ধ 'বৈদিক বাড়ীতে' তেইশে কার্ত্তিক মঙ্গলবার শুভ দীপান্বিতা দিবসে গৃহাঙ্গনে উন্মুক্ত আকাশের নীচে রাত্রি দশটা বিশ মিনিটে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

* * *

তিনি যখন ভক্তদের উপদেশ আদেশ দিচ্ছেন, তখন তাঁর বয়স আট বৎসর নয় মাস। বহু লোক বহু জায়গা হতে তাঁর কাছে এসে মাথা নত করতে আরম্ভ করলো, বহু সমস্যার সমাধান পেতে লাগলো, তাঁকে গুরুপদে বরণ করে তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নিতে আরম্ভ করলো। যিনি দিচ্ছেন, তিনি স্বাভাবিক রীতিনীতি অনুযায়ী দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি ভাবতেন, 'এরকম সবাই পারে, সবারই পক্ষে সম্ভব, এতে নূতনত্ব কি'। এত লোকের যে আগমন, এত যে ভিড় করছে, তিনি একটুও মনে ভাবেননি কেন এত লোক আসছে—একটা কিছু হয়েছেন মনে করেননি। তিনি শুধু এটুকু মনে করেছেন যে, বিশ্বপ্রকৃতির আইন প্রয়োজনের তাগিদে সৃষ্টি, প্রয়োজনের তাগিদে গমনাগমন, প্রত্যেকের প্রত্যেকের নিকট শিক্ষা; সুতরাং তাঁর কাছে আগমন কোন একটা প্রয়োজনে। আবার তিনিও তাদের থেকে একটা জিনিষ জেনে নিতেন—'জানা

জিনিষকে কি ভাবে অজানায় বয়ে জানার প্রয়াসে তাঁর নিকটে আগমন,' তিনি করতেন তার সমস্যার সমাধান। এই কৃতজ্ঞতায় তিনি থাকতেন মাতোয়ারা হয়ে। তিনি থাকতেন ঐ কৃতজ্ঞতায়ই, যাহা রীতিনীতিতে চলছে, ঐ ভাবেই পরিচয় দিতেন, "তোমরা আসাতে আমি উপকৃত হয়েছি।" কিন্তু ওরা যে আবার উপকৃত হয়ে চলে যাচ্ছে তা তিনি মনেও ভাবতেন না।

* * *

ঠাকুর এর পরই ক্রমশঃ ক্রমশঃ পাহাড়-অঞ্চলের ও অন্যান্য দিকের কাজকর্ম্ম শেষ করে আসেন।

* * *

স্বাভাবিক বিশ্বপ্রকৃতির রীতিনীতি জানা ছিল কিনা, তাই এই ব্যক্তির বেলাতেই বোধ হয় বয়সে আট্‌কায়নি, বার্দ্ধক্যের পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। স্রষ্টা যখন সৃষ্টি করেন, সেই সৃষ্টির সাথে সাথে স্রষ্টা স্বয়ংই যেন এই শিশুর মাঝে এসে পুঞ্জীভূত হয়ে আট বছরের শিশুর ভেতর আদি বয়সের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন।

শাস্ত্রগত দিক দিয়ে জন্মান্তরবাদ, কর্ম্মবাদ, আরো যে সমস্ত 'বাদ' রয়েছে, তা এই শিশুকে ভালভাবে লক্ষ্য করলে বিশ্বাস না করে পারা যায় না। কিন্তু তাঁর কথায় যা বুঝেছি তা হচ্ছে, জন্ম একই অবস্থায় সব সময় চলে আসছে, বিভিন্নতা শুধু পরিবর্ত্তিত অবস্থা। এই পরিবর্ত্তিত অবস্থা বজায় রেখে রেখে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে এবং নামান্তরও ঠিক সেই অনুযায়ী হয়ে আসছে। বস্তুতঃ একই গুণের, একই শক্তির একই পূর্ণ হতে সব-কিছু হয়ে আসছে।

এই সৃষ্টির পরিচয় আমরা আরো অনেক কিছু তাঁর ভেতর পেয়েছি। বহু প্রশ্ন করেছি, প্রশ্নের সমাধানও পেয়েছি। তাঁর কার্য্যকলাপ ও বিভূতি ইত্যাদি দেখেছি, তবুও তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি, "ঠাকুর, পূর্ণ যদি পূর্ণই হয়ে আসে, তবে কাজের কি প্রয়োজন? সে-তো সব সময়ই

পূর্ণ।" তখন তিনি বলতেন, "পূর্ণ যে পূর্ণ করাই তার কার্য্য এবং চিন্তাযুক্ত, বুদ্ধিযুক্ত, জ্ঞানযুক্ত সব-কিছু পূর্ণতার দিকে নিয়ে নেওয়াই পূর্ণের কার্য্য। অজ্ঞানতা, ভুলে যাওয়া, বিক্ষিপ্ততা, মুছে যাওয়া, ঐ পূর্ণেরই আর একটি কার্য্য। ঐ রূপকে সরিয়ে দিয়ে শুধু বুঝরূপটিকে maintain করছে সব রূপকে বুঝিয়ে নেওয়ার জন্য এবং এই বুঝ হচ্ছে জ্ঞানের অবস্থা এবং সব-কিছু যখন যে সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির ভেতর হতে উদ্ভব হচ্ছে, মনের সূক্ষ্ম কোণে যে সমস্ত উদ্ভব, সব-কিছু যখন এক জ্ঞানে, এক বুঝে, এক চিন্তায় সব-কিছু সমস্যার সমাধান এক যন্ত্রে এসে উপস্থিত হবে, তখনই পূর্ণ যে, সে তাকে নিজেই বুঝবে। আমরা তাকে বুঝছি, বুঝছি নিজেকে, আমরা নিজে বুঝে বুঝে চলছি এবং বোঝাবুঝি চলছে নিজেকে বোঝ..............* সেই সাধনা, সেই জপ তপ আনুষঙ্গিক নামাকরণে নাম দিয়ে বিভিন্নতার ভেতরে নিজের মনের একাগ্রতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে শুধু জ্ঞানময়ের সাধনাতে। যে জ্ঞান রয়েছে বিদ্যমান ঠিক mineএর মতন, mineএর যারা expert, তারা প্রথম soilএর testএ নীচে যে mine রয়েছে, তাহা উপলব্ধি করে tongueএ। তখনই যন্ত্রপাতি নিয়ে বসে যায় সেই খোঁজে। এখন তিনশত হাত নীচেই হউক, পাঁচশত হাত নীচেই হউক, ঠিক সন্ধানে সন্ধানে সেই খাঁটি জিনিষটুকু বেরিয়ে যাচ্ছে। তার পরিচয় দেওয়ার জন্য প্রথম স্তরেই তার আভাস জানিয়ে দিচ্ছে যে নীচে রয়েছে। ঠিক আমাদের এই পূর্ণ এমনিভাবে সর্ব্বতোভাবে রয়েছে যে বিভিন্নতার ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা কি সুখ, কি দুঃখ, কি লাঞ্ছনা expertএর কার্য্য করে যাচ্ছে বিভিন্নতার movementএ। যে কোন একটির প্রথম স্তরের স্বাদ নিলে পূর্ণ যে সেথায় রয়েছে, নিকটতমে রয়েছে, বহু নামাকরণে রয়েছে, যে নামাকরণে যে কোন একটি একটু খুঁড়লেই তাকে পাওয়া যাবে। সেই খোঁড়াই হচ্ছে সাধনা, জপ

* বাদ পড়েছে।

তপ ইত্যাদি নামাকরণ দিয়ে কর্ম্ম তার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। একে অন্যকে পার্থক্য বোধে বোঝার জন্য যাহা রয়েছে, তাহাই নাড়ছে, তাহা দিয়ে সব-কিছুই হচ্ছে, নূতনত্ব কিছু নয়; নূতনত্ব শুধু নামাকরণ মাত্র, একে অন্যকে পার্থক্যবোধে বোঝার জন্য। সেই খনি হতেই বহু ornament কার্য্যকরীতে পরিণত হচ্ছে।" ঠিক তাই এই শিশুর অবস্থাটি ঠিক 'মাইন' নিয়েই যেন জন্ম হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, "Mindএর সঞ্চালন-ক্রিয়াতে mineএর অবস্থাটি সব সময় প্রকাশিত অবস্থায় প্রকাশ করে যাচ্ছে এই বাস্তবে। জনগণ প্রথম স্তরে স্তরে যারা যারা রয়েছে, তারা উপলব্ধি করেছে সেই mineকে। উপলব্ধি করাটা তো অস্বাভাবিক নয়, 'স্তর'ই যে মহান্‌কে উপলব্ধি করিয়ে দিচ্ছে, স্তর যে mine ছাড়া নয়—সেই স্তরই জানিয়ে দিচ্ছে, mine নিকটে রয়েছে।" ঠিক তেমনি এই শিশুর ভেতর যে 'মাইন' আবহাওয়ার স্তরে তার কার্য্যকলাপ গতিবিধি, স্তরগুলো বুঝে নিয়েছে তার 'মাইনে'র অবস্থাটা। তিনি বলতেন, "এই mine, এই স্তর জীব-জগতের সবারই ভেতর রয়েছে। আবার এই মন, জ্ঞান, বিচার, বুদ্ধি যাহা কিছু ঠিক তেমনি স্তরে স্তরে পূর্ণকে বুঝিয়ে দিচ্ছে; পূর্ণই আবার নিজে প্রকাশিত হচ্ছে, আভাসে বুঝিয়ে দিচ্ছে এই সকলের ভেতর দিয়ে; সুতরাং কেউ কারো ছাড়া নয়। আজ যে মনের ভেতর যাহা কিছু উদ্ভব, সবই যে পূর্ণের বিকাশ মাত্র, যেমন আগুন, ধোঁয়া। Mine হতে যেমন gold, mine হতে বহু ornament হয়ে mineএরই পরিচয় দিচ্ছে, তারা ঠিক তেমনি এই পূর্ণ বা বিরাট powerএর পরিচয় দিচ্ছে যাহা স্বভাবজাত চলছে প্রথম অবস্থায়, আরো পরিচয় দিচ্ছে বিভূতির প্রকাশ 'অষ্টসিদ্ধি' ইত্যাদি যাহা নামাকরণ রয়েছে, ঐ সমস্ত হয়েছে তার ornamentsএর মত; স্বভাবজাত যে শক্তি তাহা বুদ্ধি, বৃত্তি, চিন্তা, কার্য্যকলাপ, তার ভেতর যে সমস্ত সাধনা এবং বাস্তবের বহু রকম কার্য্যবিধি যাহা যাহার ভেতর মনকে

একাগ্র করে যে সমস্ত সফলতা অথবা অসফলতার দিকে পড়ছে, যে কোন শক্তিরই যে বিকাশ, ইহা হলো স্বভাবজাত পূর্ণের একটি জাতীয় বিকাশমাত্র। একজনে তুলতে পারে যেমন দশ সের, কসরৎ করে সাধনায় সে নিচ্ছে তিন মণ সেই তুই বাহুতে। কোথা হতে পেল তাহা? মনের একাগ্রতা, তার সঙ্গে কার্য্যের সহযোগিতা; এরকম শুধু নয়, অজস্র অজস্র কার্য্য আছে, যাহা মনের একাগ্রতা, কর্ম্মের সঞ্চালনতা, যাহা নাম দিয়েছে পুরুষকার ইত্যাদি, যে নাম ইচ্ছে দেওয়া যায়, কিন্তু এই যে স্বভাব, এটাকে বলে inborn quality। কম বেশী যে ভাবের প্রকাশ সবার ভেতরই প্রভাবের প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে। এক পূর্ণেতে যাওয়ার অবস্থাতে যখন জীবগণ চিন্তাতে চিন্তা করে, তখনই তাকে তুর্গম বলে ফিরে আসে। এই তুর্গমতার অবস্থাটিও সৃষ্টি করে নেওয়া হয়েছে সুগমতার অবস্থা হতে, এ অবস্থাতেও মনেরই একাগ্রতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে তুর্গমতার দিকে। সুতরাং মনের একাগ্রতা শক্তিতে যদি শক্তির বিকাশ হতে পারে, তবে তুর্গমতার তুর্গম বলে বিকাশ হওয়ায় আশ্চর্য্য কি আছে! এই জাতীয় অবস্থা হতাশা, নিরাশা, ভালবাসা, না বাসা, সব পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে একই অবস্থা হতে, বিকাশ যে একজন হতেই, সফলতা তো ঠিকই হয়ে যাচ্ছে, তবে mindকে সমস্ত mineযুক্ত করে নেওয়া অসুবিধাজনক তো কিছু নয়। যাহা রয়েছে শুধু কর্ত্তন করে উদ্ভব করে নেওয়া মাত্র, প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে যে, উদ্ভব হওয়ার জন্যই তো এ সমস্ত অবস্থা; সুতরাং একে কি বলা যেতে পারে, উদ্ভবত্ব অবস্থা যাহা উদ্ভাসিত অবস্থা রয়েছে; যে ভাবেই হউক না কেন, একেই বলে পূর্ণত্ব অবস্থা" সুতরাং সেই বিকশিত অবস্থার সব-কিছুর প্রকাশ এই আট বছরের শিশু হতে পেয়েছি।

তারপর এই শিশু যখন ক্রমশঃ ক্রমশঃ বয়সের দিকে এগিয়ে যেতে আরম্ভ করলো, কোথা হতে এলো তাঁর জ্ঞান, কোথা হতে এলো

তাঁর চিন্তা, কোথা হতে এলো তাঁর শাস্ত্র বিষয়ের জ্ঞান; কি ভাবে যে সব-কিছু সমস্যার সমাধান করতে লাগলো, অবাক হয়ে দেখবার কিছু ছিল না, যদিও তাঁর মতে "ইহা সবই স্বাভাবিক, মাঝে মাঝে একটু 'দোহার' টানতে হচ্ছে প্রয়োজনের তাগিদে এবং পূর্ণকে বোঝবার জন্য"। দূরদর্শন, অন্তর্য্যামীত্ব, অষ্টসিদ্ধির প্রথম সিদ্ধি হতে শেষ সিদ্ধি পর্য্যন্ত যা-কিছু শাস্ত্রগত বর্ণনা রয়েছে, এই শিশু হতে সবই পাওয়া গিয়েছে। তাঁর মতে তা স্বাভাবিক। তাতে আমরা বুঝেছি, সব-কিছু যে তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল বা করে এসেছেন। শাস্ত্রগত দিক্ দিয়ে যদি বিচার করে যাই, তবে শুধু এই দেখি, বহু বহু যুগ-যুগান্তর হতে যেন কোন্ সাধনায় মগ্ন থেকে এই বিরাট শক্তিকে আয়ত্ত করে নিয়ে আর্জ উদ্ভব হয়েছেন এই ধরাতলে। তাঁর মতে স্বভাবজাত স্বাভাবিক দিক্ দিয়ে আমাদের ব্যক্তিগত বোধ যখন যায়নি আমরা বিচার করছি তাঁর তন্ময়তার দিক্ দিয়ে, শাস্ত্রগত দিক্ দিয়ে, বাস্তবতার দিক্ দিয়ে, বহু মহান্ যারা এসেছেন তাদের দিক্ দিয়ে। তাঁর মতে সবই যে পূর্ণ, শুধু শুনে নিয়েছি, জেনে নিয়েছি, পার্থক্য বোধে যাহা বুঝেছি, অনেক প্রভেদ। নেই মান, নেই অভিমান, নেই অহঙ্কার, তিনি ছিলেন জ্ঞানে ভরপুর।

দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা ব্যতিব্যস্ত, লোকে লোকারণ্য, তবুও তিনি হাসিমুখে সবাইকে সর্ব্বতোভাবে মনের খোরাক দিয়ে যাচ্ছেন। কি জলে, কি স্থলে, কি শূন্যে ছিল তাঁর অবাধ গতি, তাঁর নিকট সবই ছিল স্বভাবজাত স্বাভাবিক। আমরা স্বচক্ষে তাহা দেখেছি। শুধু আমি কিংবা আমরা নই, বহু জনে দেখেছে। আবার জনগণের কাছে বলে হাস্যাস্পদ হয়েছি, বলে যেন তাদের ভুল করেছি এমনও হয়েছে অনেক। কিন্তু তারাই যখন আবার একদিন তাঁর নিকট এসেছে, অন্যের নিকট তাদের অবস্থা আমাদের মতই হয়েছে।

বাহ্যিক অনুষ্ঠান ছিল না তাঁর, ছিল না অনুষ্ঠানের গোল, ছিল

না তাঁর কোন বাঁধা। কিন্তু প্রতিটি কার্য্যের তত্ত্ব তন্ন তন্ন করে তিনি বুঝিয়ে দিতেন প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে। এভাবে তাঁর আদেশ, উপদেশ, কার্য্যকলাপ বুঝে জেনে তাঁর ভক্তগণ কাজ করে যেতো। এগুলো ঠিক যেন জিহ্বাতে চিনির স্বাদ, ইন্দ্রিয়াদির স্বাদ যেমন উপলব্ধি করা যায়, তাঁর কার্য্যকলাপ পথ-পদ্ধাত হতেও ঐরূপ বোধ হতো; সংস্কারগুলো যেন স্বাভাবিক ভাবে যাহা প্রয়োজনে না আসা উচিত সেটুকু বর্জ্জন হয়ে থাকতো।

———

দুই

ঠাকুর বসে* আলাপ করছেন। আমরা† অনেকে যার যার ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছি। এর মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করলো, "অশান্তি হতে কি করে রক্ষা পাওয়া যায়? সংসারের এই সমস্ত আবিলতা একেবারে বিক্ষিপ্ত করে রাখে, তাই নিজেরা কাজ করতে পারি না।" এই জাতীয় নানারকম মনের বেদনা ঠাকুরকে জানাচ্ছে, ঠাকুর চুপ করে শুনছেন সবার কথা। ঠাকুর বললেন. "এত ব্যস্ততা প্রকাশ করছো কেন? এটা তো নূতন কিছু নয়, স্বাভাবিক যা সবার আছে তাই বলছো এবং যা স্বাভাবিক, তা নিশ্চয়ই কোন necessityর জন্যই এই জাতীয় অবস্থার সৃষ্টি। মনের একাগ্রতাই হউক, প্রসারতাই হউক, যাই হউক না কেন, এ সমস্ত আবিলতা, ঝামেলা, ঝড়, শোক, দুঃখ ইত্যাদি ঐ সমস্তের প্রয়োজনীয়তাতেই রয়েছে, সব-কিছু অবস্থা

---

* স্বামীবাগ, ঢাকা।

† যদুনাথ রায়, গিরিজা শঙ্কর সেন, শচীন গুহ, রবি সেন, সুধীর বসু, ললিত চক্রবর্ত্তী, প্রাণেশ চক্রবর্ত্তী, অজিত মুখার্জ্জি, হরিবল্লভ পাল, শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য, রাজেন্দ্রলাল চৌধুরী, ভূপেন ঘোষ, রবি ঘোষ, সত্যেন রায়, মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, গোপাল ঘোষ, ভূপেন রায়, দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী (১), সুভাষ চক্রবর্ত্তী, ইন্দ্র ভূষণ সেন, তমসা দারোগা, রসিক দারোগা, আশু সেন, আশু মজুমদার, নৃপেন রায়, হরিদাস পাল, প্রিয়প্রসাদ গুপ্ত, মণীষ রায়, মনোরঞ্জন সেন, খগেন মল্লিক, নরেন মল্লিক, বিশ্বেশ্বর দাশ, শান্তি দাস মজুমদার, বারীন ঘোষ, জগদীশ দাশ, অজিত ভট্টাচার্য্য, আরো অনেকে।

যা চলছে আমাদের ভেতর, তা যেন একটা instrumental work করে যাচ্ছে প্রকারান্তরে, যেমন operation করার জন্য একজাতীয় ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, স্থানটিকে sensationless করে দেওয়া হয়, তখন operation অনায়াসে করা যায়, তাতে ওর কিছু হয় না; এই medicine জাতীয় অবস্থা, কি সুখ, কি দুঃখ, সব কিছুর ভেতর ঐ জাতীয় কার্য্যকরী করে যাচ্ছে একাগ্রতার সহায়তার জন্য, তাই কি গান, কি বাজনা, কি যন্ত্র, সব-কিছুরই ভেতর সাময়িক একাগ্রতার অবস্থা; মনে হচ্ছে যেন সাময়িক সব দুঃখ দৈন্য ভুলে থাকা—যতটুকু সাময়িক relief বোধ করছে, আর একটি অবস্থার চাপ পড়তে থাকে, সেই জাতীয় অবস্থাই হচ্ছে ঐ জাতীয় medicineএর মত। একটা গান যেমন খুব মধুর মনে হচ্ছে, বেশ উৎফুল্ল করে দিচ্ছে, এই গানের চিন্তাতে চিন্তাতে এমনি করে মন তন্ময় হয়ে গেছে; আনুষঙ্গিক ব্যথা দৈন্য এর ভেতরে একটা medicineএর মত ক্রিয়া করছে যাতে এ প্রকোপগুলো বৃদ্ধি হতে না পারে। একের উদ্ভবে অন্যকে বারণ করে করে চলছে, সেই জাতীয় কি ধ্যান, কি ধারণা, যার যার আরাধ্য বস্তুর উপর আত্মসমর্পণ করে যাচ্ছে এবং প্রাণের আকুলতা ব্যাকুলতা যা-কিছু তার নিকট নিবেদন করছে, সেই influenceএ এমন একটা প্রলাপের কার্য্য করে যে, অন্যান্য উপদ্রবগুলো উঁকি ঝুঁকি করার সময় করে উঠতে পারে না। সব কিছুতে চাচ্ছে একটি উপশম, রোগী চাচ্ছে রোগ হতে উপশম, একাগ্রতা চাচ্ছে বিক্ষিপ্ততা হতে উপশম, শান্তিপূর্ণ ব্যক্তিরা চাচ্ছে অশান্তি হতে উপশম, প্রয়োগও ঠিক সেই সেই ভাবে হয়ে আসছে; যখন সব-কিছু হতে উপশম অবস্থায় গিয়ে দাঁড়ায়, সেটাই যেমন চৈতন্যের অবস্থা, এই দৈহিক যে জ্বালা যন্ত্রণা, কি সুখ, কি দুঃখ, কি শোক, যা-কিছু স্বাভাবিক মতে চলছে, উপশমের অবস্থাতে যখন গিয়ে পৌঁছে, তখন সব-কিছুকে যেন আয়ত্ত করে

সে যেন সে স্তরে গিয়ে বসে থাকে—ঠিক উঁচুতে গেলে যেমন সব-কিছু দেখা যায়, সেই উপশমরূপ স্তরেতে গেলে এই সব-কিছুকে বুঝে নেওয়া যায়, জেনে নেওয়া যায় কার কি রূপ রয়েছে। আয়ত্তে থাকলেই আয়ত্ত বস্তুকে নেড়েচেড়ে, তার রূপের রূপকে সম্পূর্ণরূপে জেনে নেওয়া যায়। তাই এই ঝামেলারূপ অশান্তি ইত্যাদি যা-কিছু হতে যে বিক্ষিপ্ততা, সব-কিছু হতে উপশম হচ্ছে তার একাগ্রতার বা মনের চলার পথে এগিয়ে যাওয়া—এও একটা উপশমের অবস্থার মত, সব হতে যেন relief হয়ে সে তাকে নিজেকে এগিয়ে দিচ্ছে সেই reliefএর পথে। তাই বাস্তবে যে সমস্ত উদ্ভব রয়েছে, এই জীবজগতের প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে প্রত্যেকটি এক-একটি দরকারের জন্য আর একটির উদ্ভব হয়ে আসছে। সুতরাং তোমাদের যা-কিছু হচ্ছে বা যাচ্ছে, বিনা কারণে নয়—তার প্রত্যেকটির কারণ আর একটি কারণের জন্য রয়েছে। আমাদের সেই কারণটিকেই খুঁজে বের করতে হবে, যে এক কারণে গেলে সবগুলো কারণকে আয়ত্তে এনে সব-কিছুর অবস্থাকে ধাতস্থ করা যায়; কারণ সেখানেই গিয়ে দাঁড়াবে—কোন কারণে এদের সৃষ্টি। এখন যে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে, তাগিদেই হচ্ছে; তখন দেখবে এই তাগিদেই তাগিদ দেবে প্রত্যেকটি অবস্থাকে জাগিয়ে তোলার জন্য। পাওনাদার যেমন খাতকের পেছনে পেছনে ঘুরে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে ফেলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাকে শোধ করে দেওয়া না হচ্ছে, তার তাগিদ মিটিয়ে না দেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তার উপদ্রব রয়েই যাচ্ছে। উপদ্রবেই রোজগারের প্রতি আগ্রহ জন্মিয়ে দিচ্ছে, আলস্যকে বঞ্চিত করিয়ে দিচ্ছে, উপদ্রবের যন্ত্রণার সাথে সাথে তার চাহিদা মেটাবার জন্য এগিয়ে যেতে থাকে অর্থের অন্বেষণে, এও ঠিক তেমনি। সমস্ত অবস্থা কি শোক, কি দুঃখ, কি তাপ, কি অভিমান, কি অহঙ্কার কি ঝড়, কি আনন্দ, যা-কিছু এ

বাস্তবে রয়েছে, সবই ঠিক তাগিদ্‌দারের মত তাগিদ্ দিয়ে যাচ্ছে। উপদ্রবে যে আমরা উপশমের জন্য বা এড়াবার জন্য অথবা মিটিয়ে দেবার জন্য খোঁজে বেরিয়ে যেতে আরম্ভ করলাম সেই অর্থের জন্য, তার নাম দেওয়া যাক্ 'পরমার্থ'। দুইয়েরই রোজগারে বেরুতে হবে। রোজগার না করলে, পরিশ্রম না করলে, কি করে ওদের চাহিদা মেটানো যাবে, কি করে ওদের হাত হতে এড়ান যাবে, তাই প্রাণপণে পরিশ্রম করতে হবে তাদের চাহিদাকে মিটিয়ে দেবার জন্য। প্রকারান্তরে তাই করিয়ে যাচ্ছে। কারণ এই উপদ্রবে যে শান্তির পেছনে ধাইছে, একটা কিছু যে চাইছে, তাহা কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে। সেই স্বাভাবিক বৃত্তিগুলোর মধ্যে যে প্রাণের চাহিদা, যে চাহিদার জন্য সব-কিছু হতে এড়িয়ে থাকার জন্য যে অবস্থা, প্রকারান্তরে সেই অবস্থা সব-কিছুর ভেতরে বিদ্যমান। সুতরাং তোমরা যা বলছো তাতে নূতনত্ব কিছু নেই। তোমাদের প্রাণের চাহিদাও রয়েছে, আবার ঝড়ও রয়েছে। তোমাদের বাধ্য করছে ঐ সমস্তের প্রকৃত চাহিদা মিটিয়ে দিতে। তুমি মুক্ত হয়ে এদের হতে থাক—যতদিন না এদের হাত হতে এড়ানো যাবে, ততদিন এরা তোমায় উপদ্রব করবেই। তাই আজ যে হা-হুতাশ, যে অস্বাভাবিকতার পরিচয় দিচ্ছে প্রতি মূহূর্ত্তে মূহূর্ত্তে, এ যে স্বাভাবিক। বহু সন্তানের মা ভিক্ষাবৃত্তি যার পেশা, বাচ্চাদের ক্রন্দনে মায়ের যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, অনুপায়ে নিজের জীবনকে বিসর্জ্জন দিতেও দ্বিধা করে না—crisis মেটাতে পারে না বলেই তো। ঠিক এমনি করে আমাদের মধ্যে যে crisis চলছে, না মেটাতে পারলে হয় পাগল, না হয় নিজের জীবনকে দেয় বিসর্জ্জন, না হয় এমন একটি অবস্থায় বিচরণ করে, যেমন, কানা, খোঁড়া, ভঙ্গুর ঠিক ঐ জাতীয় আর এক অবস্থার বৃত্তির চেহারার মত; মনের অবস্থাও ঐ জাতীয় অবস্থার পরিচয় দিতে থাকে, শেষ নিশ্বাস

ফেলবার এক সেকেণ্ড আগ পর্য্যন্তও বাঁচবার জন্য যে প্রয়াস, শত উপদ্রবের মাঝেও যে বাঁচবার জন্য প্রয়াস,—বাঁচবার জন্য তার septic-যুক্ত দু'পাকে operation করে ফেলা হয়েছে, দু'হাতকে operation করে ফেলা হয়েছে, তবুও সে বাঁচতে চায়, শরীরের আরো কিছু বাদ দিয়েও যদি বাঁচতে হয় তবুও বাঁচতে চায়—'শিকা'তে যদি ঝুলে থেকেও বাঁচতে হয় 'তব্‌ বি আচ্ছা'—এটা কোন্ বাঁচার সাড়া ? অবস্থার চাপে মনে করছে দেহকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেই বোধ হয় সব। অবস্থার হাবভাবে বুঝ মত যে চলছে, প্রকারান্তরে সমস্ত বৃত্তির উপদ্রব হতে সব কিছু হতে 'বাঁচা' বলে যে শব্দটি বেরিয়ে আসছে, সে বাঁচা দেহকে পোষণ করাই শুধু নয়, সেই যে শব্দ ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, যে কোন অবস্থায় হউক, কোন অন্তরাল হতে বেরিয়ে আসছে, "আমি বাঁচতে চাই'। সেই বাঁচা হলো জ্ঞানের ভেতরে বিরাজ করা, বাঁচা হচ্ছে, আমি বাঁচতে চাই ; মানে, সর্ব্ব অবস্থাকে আমি আমার করে নিতে চাই। বাঁচার উদ্দেশ্যে কি দুঃখকে বরণ করা ? সে জানে যে, অত দুঃখের মধ্যেও তাকে চলতে হবে, তবুও সে বাঁচতে চায়। ক্রিয়া প্রকারান্তরে তার মধ্যে কার্য্যকরী হয়ে যাচ্ছে ; এখন বাইরের ভাবে ওটাকে যে ভাবেই প্রকাশ করুক না কেন, কিন্তু বাঁচা হলো নিজেকে সর্ব্ব অবস্থা হতে জেনে নেওয়া, বুঝে নেওয়া, জাগিয়ে তোলা এবং আয়ত্ত করা নিজেকে। মৃত্যুর মুখ হতে মৃত্যুকে যেমন আয়ত্ত করতে চাইছে, আর বশীভূত করতে চাইছে, ঠিক সেই জাতীয় বশীভূত সমস্ত মৃত্যুর মুখ হতে করতে চাচ্ছে, যাতে সে তাদের মধ্যে জড়িয়ে না পড়ে, তাদের কবলে না পড়ে, তাদের কবল হতে মুক্ত হওয়ার জন্য সে মুক্ততা চাচ্ছে। সেটা মিলিত অবস্থাই হউক, আর বাঁচবার অবস্থাই হউক, আর জ্ঞানের অবস্থাই হউক, কিন্তু মুক্তি তার কাম্য। সেই মুক্ততার মধ্যে যে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে চাইছে, সে ইচ্ছাশক্তি হচ্ছে will-force, সেই will-forceকে বাড়াবার জন্যই তার প্রাণপণ

চেষ্টা, সেই চেষ্টাকে যদি প্রচেষ্টায় পরিণত করতে হয়, তবেই সেখানে আসবে সাধনা, সেখানেই জ্ঞানের প্রয়োজন, সেখানেই আত্মনির্ভরের প্রয়োজন, সেইখানেই চৈতন্যের বিকাশ ; যে চৈতন্য তোমাতে স্থিত, সেই চৈতন্যই প্রকারান্তরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্মভাবে পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে এবং তাহাই জানবার জন্য নানাভাবে উপদ্রবের মধ্যে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, 'আমাকে বের করে নেও', যেমন প্রসূতির ব্যথাতে জানিয়ে দিচ্ছে, 'আমি বের হতে চাই', তাই তার ভেতর যে উপদ্রবের সৃষ্টি করছে বের হওয়ার জন্য—ব্যথা তার জন্যই তোমাতে রয়েছে। সেই ব্যথায় ব্যথায় এমন এক অবস্থার সৃষ্টি ক'রে যে স্বাভাবিক মতে বেরিয়ে পড়ছে, যাতে সে সহজ ভাবে বের হয়ে যেতে পারে, ঠিক এই প্রসূতির অবস্থার মত ঐ স্থিত অবস্থায় সেই প্রাণের চাহিদায় যে মুক্ততা রয়েছে, যে জ্ঞান রয়েছে, যে সত্য রয়েছে, উহার জাগবার জন্যই এ সমস্ত উপদ্রব—প্রসূতির ব্যথার মত উপদ্রব করছে তোমাদের। এ যে প্রসবের ব্যথা—ঘাবড়াবার কি আছে ? ভাববারই বা কি আছে ? ব্যথা যখন আছেই, আর বাচ্চা যখন রয়েছে, বের হবেই, দুদিন আগে আর পাছে। এও ঠিক তোমাদের ভেতর আজ যে ব্যথায় তোমরা ব্যথিত হচ্ছো আগমনের জন্য, তখন দেখবে সে বেরিয়ে আসছে, ফুটে উঠেছে, তখন তার সুবাসিত গন্ধে মো মো করে ফেলবে, তখন দেখবে সব ব্যথা উপশম হয়ে গেছে। সুতরাং যা হচ্ছে, এ তো প্রয়োজনের তাগিদেই হচ্ছে—এতে ঘাবড়াবার কি আছে ? এই প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী তার প্রয়োজনেই যা-কিছু তোমাদের ভেতর প্রকাশ করে যাচ্ছে তার নিজের স্বরূপকে জাগিয়ে তোলার জন্যই—তুমি তার প্রতীক, তোমার ভেতর দিয়েই তার প্রকাশ, তখন তুমি বুঝবে, তুমি যে সে এবং সবই যে তুমি। এই লয়ে আসার জন্যই এত প্রলয়, তাই প্রলয় চলছে তোমাদের ভেতর—লয় ঠিক হবে, হওয়ার জন্যই ঐ সব।"

তিন

ঠাকুর বাইরের ঘরে* বসে আলাপ করছেন। সেদিন আমরা† অনেকেই আছি। সবাই বসে আলাপ শুনছি। ঠাকুর আমাদের বোঝাচ্ছেন যে, একজন হতে শক্তি কি ভাবে আর একজনের উপর প্রভাবান্বিত হয়, কি করে একজন spiritual guide বা মহান্ একজনকে টেনে নেন, কি করে তা সম্ভব এবং কি করে অন্যের ভেতরে শক্তির বিকাশ করান যায় ইত্যাদি। আমরা সবাই মন দিয়ে ঠাকুরের কথা শুনতে লাগলাম। ঠাকুর বলতে লাগলেন, "High voltএর power-house হতে বিদ্যুৎ যখন সারা সহরের ভেতর সরবরাহ হচ্ছে, মোটা বড় তারের ভেতর দিয়ে মাটির নীচ দিয়ে চলে যাচ্ছে, তখন দেখা যাচ্ছে হাত খানেক ব্যবধানে আর একটা বড় তার চলে গিয়েছে। এখন সেই শক্তি তার প্রভাবে ওর মধ্য দিয়ে pass করে যাচ্ছে এবং সারা জায়গা আলোকিত করছে। এই এতটুকুনু যে ভেদ— এর প্রভাবটা এর মধ্যে এমনিভাবে কার্য্যকরী হয়ে যাচ্ছে, যাতে আলো জ্বলতে বাধ্য হয়েছে, current pass করতে বাধ্য হয়েছে; শক্তির প্রভাবই এই রকম, যত distanceই থাক না কেন, ভাব যদি ঠিক থাকে, সে-প্রভাব তার মধ্যে প্রতিফলিত হবেই, voltage যদি বেশী থাকে। তাই একজন মহান্, তাঁর ভেতরে high voltage রয়েছে,

---

* স্বামীবাগ, ঢাকা।

† দ্বিজেন্দ্রপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, ভূপেন রায়, সুভাষ চক্রবর্ত্তী, ভুপেন্দ্র ঘোষ, রবি ঘোষ, বারীন ঘোষ, শান্তি দাস মজুমদার, আরো অনেকে।

ভক্তরা হচ্ছে আর একটি distanceএর তার, কিন্তু distance self a kind of connection, সুতরাং যত distanceই থাক না কেন, voltageএর কাছে কোন distanceই distance থাকে না, তাই অবাধে current pass করে চলছে এবং আলোকিত হচ্ছে, আলোকিত হয়ে তোমাতে জ্ঞানের বিকাশ হচ্ছে। জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার তোমাতে জেগে উঠেছে, ফুটে উঠেছে,—যেমন magnetএর পাহাড় হাজার হাজার মাইল দূরে রয়েছে—এমনই সূক্ষ্ম magnet compass যেদিকেই রাখুক না কেন, ঠিক ওর মুখো হয়ে রয়ে যাচ্ছে। এই যে এক-মুখী-হয়ে-যাওয়া দূরত্বকেও নিকটতমের চেহারা করে ফেলছে—আকর্ষণ দ্বারাই তাহা সম্ভব। সব-কিছুর ভেতরে ওর প্রভাব এমনিভাবে রয়েছে ওর দিকে একমুখী করে রাখার জন্য। এই যে একমুখী সমস্ত জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার—এই সব-কিছুই যে মনের ক্রিয়ার ভেতরে চলছে, সব যেন বিরাটের দিকে এগিয়ে চলছে। মহান্‌রা receiving powerটাকেও তৈরী করছেন এবং transmittingও করছেন; voltage যেমন transmit করছে, receiving এবং transmitting যেমন একই voltage দ্বারা সম্ভব, মহানের প্রভাবের দ্বারাও এই জাতীয় সম্ভব। তোমাদের ভেতর যে প্রভাব দেওয়া হলো, সেই প্রভাবে যেমন তোমরা এগিয়ে চলতে লাগলে সাড়া দিতে এবং সাড়া নিতে—এই দুটো অবস্থাই প্রভাবের দ্বারা তৈরী হয়ে যাচ্ছে এবং তোমাতেও যে সেই শক্তি রয়েছে; আলাদা individual হয়ে battery দিয়ে electrify ক'রে transmitter এবং receiver দুটোই তুমি নিজের ভেতরে পেয়ে যাচ্ছ এবং করে নিতে পারছো—প্রত্যেকেই self transmitter এবং receiver। প্রত্যেকের ভেতরই সেই শক্তি রয়েছে। মহান্‌ই voltage রূপেতে তাহা জাগিয়ে দিচ্ছে এবং জানিয়ে দিচ্ছে যে, তুমি receiver এবং transmitter, তোমার কার্য্যতেই তুমি সম্ভব করে নিতে পারবে এই দুটোর অবস্থাকে। এই

বিরাটে যে সমস্ত অজানার মধ্যে রয়েছে, তুমি এমনি করে transmit করে যাচ্ছ এবং সাথে সাথে সাড়া পাচ্ছ, তুমি একই জায়গায় বসে সমস্ত জিনিষ অবগত করিয়ে অবগতে আনছো। তাই সম্পূর্ণ জিনিষ যে অবগতে রয়েছে, যন্ত্রকে চালিত করলেই তা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারছো। তাই তোমাদের সব সময়তেই বলি, আছে জিনিষকেই জাগিয়ে তুলছো জানার জন্য। তুমি নিজে যখন receiver হয়ে যাবে, তুমি বিশ্বের সব জিনিষ টের পাবে কোথায় কি লুক্কায়িত রয়েছে এবং তুমি যখন জানবার জন্য কিংবা জানাবার জন্য transmit করবে, তখন তারা জেনে তোমায় জেনে জানাবে বা জানবে। এই আদানপ্রদানে হচ্ছে সব-কিছু, যে আদানপ্রদানে চলছে এ খাওয়া-দাওয়া, সব-কিছু যেমন করে চলছে এখানে এও যে এক প্রকার transmitting ও receiving—তুমিও একপ্রকার transmitter ও receiver হয়ে আছ। তুমি একজনকে খাচ্ছ ও আর একজনের খাওয়ার জন্য নিজেকে এগিয়ে দিচ্ছ। এইভাবে আদানপ্রদান সেই বিরাটের সেই প্রভাব সর্ব্ব অবস্থায় আমাদের মধ্যে বিরাজ করছে। যেমন তুমি একজনের দিকে চাইছ ও নিচ্ছ, আর একজনের দিকে চাইছ ও দিচ্ছ, এই অবস্থাতে প্রত্যেক প্রত্যেকের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হচ্ছে, বিনিময়ে তার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে এবং তাহা হতে যে সৃষ্টির উদ্ভব হচ্ছে এবং তাহাতেই যে সৃষ্টি রয়েছে—interest পাচ্ছ ও interest দিচ্ছ—এই যে সমন্বয়ের অবস্থাতে স্রষ্টা সৃষ্টি করছে. আবার সেই সৃষ্টি স্রষ্টা হয়ে আবার সৃষ্টি করছে, আবার স্রষ্টা নিজেই নিজে অবসানের পথে নিজেকে বিলীন করছে ; যেই জাতীয় পদার্থ হতে উদ্ভব, সেই জাতীয় পদার্থে নিজেকে টেনে নিয়ে মূল বস্তুতে গিয়ে উপস্থিত হচ্ছে—এই যে উদ্ভব এবং লয়, এও যে সমভাবে যে একই শক্তি হতে প্রস্ফুটিত হচ্ছে। সেই মূলেই যে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি মূলেরই সন্ধানে এবং সেই সন্ধানে খুঁজছি এখানে

এবং সেই প্রভাবই চলছে জীবের প্রত্যেকের উপর, সবার উপর, প্রত্যেকের প্রত্যেকের একই শক্তিতে গিয়ে পৌঁছবার জন্যে এবং সেই harmony এমনিভাবে রয়েছে, প্রত্যেকেই তালে তালে তাল দিয়ে এগিয়ে চলছে প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী—তার মধ্যেই প্রভাবের মাত্রা বাড়িয়ে বাড়িয়ে প্রকারান্তরে নিজের মধ্যে সে শক্তিকে বিকশিত ক'রে আরো অনেককে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বা এগিয়ে যাওয়ার সহায়তা করছে। যে ধারাবাহিক নিয়মানুযায়ীতে রয়েছে, প্রভাব সেই জন্যই বাড়ছে ও কার্য্যকরী হচ্ছে একে অন্যের ভেতর, তোমাতে তুমি সেই ভাবে প্রতি মুহূর্ত্তে সাড়া দিচ্ছ। কানে receive ক'রে মুখে আর একজনকে transmit করছো, চোখে সাড়া দিয়ে আর একজনকে তার সাড়ার সাড়া নিয়ে আর একজনকে সাড়া দিচ্ছো—আজ সে যন্ত্র তোমাতে রয়েছে। বিরাট ঝড়ের মধ্যে যদি যন্ত্র চালান যায়, শব্দ ঠিকই পাওয়া যাচ্ছে, এত hazy এর disturbance সেখানে একটু smooth হতে হয় অথবা যন্ত্রটিকে বন্ধ ক'রে ঝড় থেকে এড়িয়ে নিতে হয়। তাই আবহাওয়ার একটা meter ঘরে সব সময় রাখতে হয়, সেইভাবে বুঝে বুঝে চললে সব-কিছুর সমতা রক্ষা করা যায়। আজ যে disturbance আমাদের ভেতর চলছে, যে হাহাকার চলছে, তার reflection প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমাদের ভেতর কার্য্যকরী হয়ে যাচ্ছে। তাও নষ্ট করা যায় যদি powerful receiver থাকে, ঝড়ে যদি তাকে না আট্‌কাতে পারে। এমন একটা আবহাওয়াতে আমি আমার কাঁটাকে ধরে রাখছি যে, ওর মাত্রা ছাড়িয়ে অন্য মাত্রার শব্দ এসে সাড়া দিচ্ছে, ঐ ঝড়কে আয়ত্তে রেখে আমি সমস্ত stationএর সাড়া receive করতে পারছি। আজ সেই ঝামেলা, সেই disturbance, সেই অবস্থা বেশীর ভাগ কার্য্যকরী হতে পারছে,—তাতে কি পরিচয় দিচ্ছে? তাতে এই পরিচয় পাচ্ছি যে, আবহাওয়ার কার্য্য তোমাদের ভেতর এসে

কার্য্যকরী হচ্ছে। যন্ত্র তোমাদের ঠিকই রয়েছে, সে পরিচয় তোমরাই তো দিচ্ছ এসে, আর তা না হয়, কাঁটা এরকম একটা জায়গায় ধরে আছ যে, দুই stationএর শব্দ এসে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তাকেও আবার ঝড়ের মতই লাগছে, কিন্তু ঝড় adjust করানোটা শিখিয়ে দিচ্ছে, ঝড়ের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট রয়েছে; তোমার শক্তিকে এমনিভাবে জাগিয়ে তুলতে হবে—এই বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত সাড়াকে আনতে পার এবং দিতে পার, সমস্ত ঝড় হতে নিজেকে এড়ায়ে নিয়ে চলতে পার এবং দখলে আনতে পার—প্রচেষ্টা সেখানেই, সাধনা সেখানেই—spiritual guide তখন তোমার engineerএর কার্য্য করে যাবে মাত্র। তাই তোমরা সেই মূলকে খোঁজ, তবেই সব সন্ধান তোমাতেই মিলবে।" আলোচনা এখানেই শেষ করে ঠাকুর উঠে পড়লেন।

চার

ঠাকুর সন্ধ্যায় প্রায়ই আধ্যাত্মিক ক্লাস* করেন। ঠাকুরের বিভূতির কথা শুনে সাধারণতঃ নানাজনে নানাকথা বলে। বহুদূর হতে বিভূতি দেখবার জন্য লোক আসে। একদিন কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি† এসে ঠাকুরকে ধরলেন। ঠাকুরকে তাঁরা খুব স্নেহের চোখে দেখেন ও নাম ধরেই ডাকেন। তাঁরা বললেন, "তোমার বিভূতির কথা অনেক শুনেছি, আমাদের এমন একটা কিছু দেখাও যাতে আমরা বেশ বুঝতে পারি।" ঠাকুর তাঁদের বেশ মান্যের চোখেই দেখেন। তিনি একটু হেসে বললেন, "বিভূতি তো আর magic নয়, আর দেখাবার উদ্দেশ্যে এই জাতীয় বিভূতি না করাই উচিত।" তাঁরা বললেন, "নানাজনের কাছে শুনেছি, অনেকেই তো তোমার বিভূতি দেখেছে, তারা কি ক'রে দেখলো?" ঠাকুর বললেন, "দেখিয়েছি, এ হিসাবে তারা দেখেনি, দৈনন্দিন যাতায়াত করতো, তার মধ্যে কোন ক্ষেত্রে একটা কিছু আভাস তারা পেয়ে গেছে, সেটা ঠিক দেখাবার উদ্দেশ্য বা অন্য কিছু ছিল না।"

তাঁরা বললেন, "তুমি তো আমাদের আপনজনই, একটা কিছু দেখিয়ে আমাদের মনের সন্দিগ্ধতা ঘুচাও।" ঠাকুর বললেন, "আপনারা নিয়মিত এসে বসবেন, হঠাৎ যদি কিছু হয়ে পড়ে, সেদিন না হয় দেখবেন, সবাই যেমন দেখেছে।" তারপর থেকে তাঁরা

---

* কৃষ্ণনগর, ত্রিপুরা।

† আশু সেন, নিবারণ দত্ত, বিজয় সোম, নরেশ ঘোষ, বিনয় সোম মহেন্দ্র শ্যাম, প্রকাশ বল (শিক্ষক)।

কয়েকদিন বেশ আসা-যাওয়া আরম্ভ করলেন। ঠাকুর দৈনন্দিন তাঁর উপদেশ দিয়ে যেতে লাগলেন। ঠাকুরের বিভূতি তখন প্রায় প্রতিদিনই প্রকাশ পেতো। একদিন সবাই বসে ঠাকুরের উপদেশ শুনছি। এমন সময় খুব ঝড় আরম্ভ হলো। ঠাকুর উপদেশ দিতে দিতে বলে উঠলেন, "খুব ঝড় হচ্ছে, কয়েকজন শিষ্য নদীতে খুব বিপদে পড়েছে, ওদের একটুখানি দেখা দরকার।" কথা বলতে বলতে ঠাকুর হঠাৎ মৌন হয়ে গেলেন এবং সাথে সাথে তাঁর হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন, আবার টেনে নিলেন। এরপর বললেন, "বেঁচে গেছে।" তারপর আমরা* ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করায় তিনি যাদের নাম বললেন, তাদের আমরা চিনি। কয়েকদিন পর খবর পেলাম ওরা সাংঘাতিক ঝড়ে প'ড়ে বেঁচে গেছে। আরো জানলাম যে, ওদের বাঁচাটা যেন নিজেদের কাছেই একটা আশ্চর্য্যের বিষয় হয়ে রয়েছে। এরকম ছোটখাট ঘটনা আরো বহু আছে, যা লিখে পাতা ভরে লাভ নেই। তবে এর মধ্যে কয়েকটা ঘটনা মাত্র উল্লেখ করে গেলাম।

* * *

এরপর ঠাকুর একদিন 'বিভূতি' সম্বন্ধে আলাপ করছেন। তিনি বললেন, "এক জায়গাতে বসে বিশ্বের সমস্ত খবরাখবর পাওয়া যায়, এক জায়গায় বসে যার সাথে ইচ্ছে দেখা করে আসা যায়।" এসব আলাপ করছেন। তিনি যেখানে† ছিলেন সেখানে বসে থেকেই

---

* রমেশ চক্রবর্ত্তী, নিকুঞ্জ বিহারী দাস, হারাধন দাস, মনীন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ধীরেন্দ্র চন্দ্র সাহা, ক্ষিতীশ সাহা, নগেন্দ্র দে, অনুকূল পাল, রমণীমোহন ঘোষ, দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী(৩), সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বিপুল চক্রবর্ত্তী, হরিদাস পাল, মহিম ভূমি দাস, নিকুঞ্জ ভূমি দাস, গৌরাঙ্গ ভূমি দাস, বারীন ঘোষ, অজিত ভট্টাচার্য্য।

† কৃষ্ণনগর, ত্রিপুরা।

আট নয় মাইল দূরে এক জায়গায়* গিয়ে আলাপ করে এলেন, এদিকে বসে বসে আলাপ করছেন ও আমাদেরও† বুঝাচ্ছেন। তারপর ঠাকুর বললেন, "আমি যার সঙ্গে দেখা করে এলাম, তাকে তোমরা চেন। আমার হাতে একটা কিছু দেও, আবার গিয়ে ওকে দিয়ে আসছি।" ঠাকুরের সামনেই কিছু ফল ছিল, এর মধ্যে একজন ঠাকুরের হাতে একটা 'আপেল' দিলেন। তিনি ফলটীকে ছুড়ে ফেলে দিলেন। ঠাকুর কিছুক্ষণ একটু চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, "আমি ওখানে গিয়েছিলেম, 'আপেল'টা ওকে দিয়ে এসেছি।" দু'ই মিনিটের ভেতর সব হয়ে গেল। পরে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, ঠাকুর সেই সময় সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে ফলটি সেই ব্যক্তির হাতে দিয়ে এসেছেন।

* * * *

আর একদিন ঠাকুর বিভূতি সম্পর্কে আলাপ‡ করছেন। ঠাকুর বললেন, "দেখ্, সব দরজা জানালা বন্ধ করে বস।" আমরা ঘরের সব দরজা জানালা বন্ধ করে বসলাম। ঘরে আলো জ্বলছিল। আমাদের সাথে ঠাকুরের পরিচিত কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও ছিলেন। ঠাকুর বলছেন, "এ আলাপ করতে করতে তোমরা শুধু আলাপই শুনবে, অথচ দেখবে কি ভাবে বাষ্পের মত হয়ে মিশে যাচ্ছি। তোমরা নদীর পাড় গিয়ে আমার সাথে দেখা করবে।" ঠাকুর এভাবে আমাদের বুঝিয়ে যাচ্ছেন, আর ক্রমশঃ ক্রমশঃ যেন হাল্‌কা হয়ে যাচ্ছেন, এরপর আস্তে আস্তে বাষ্পের মত হয়ে যেতে লাগলেন—পরে

---

* রামচন্দ্রপুর, ত্রিপুরা, নবদ্বীপ চন্দ্র দাসের বাটী।

† প্রকাশ বল, আশু সেন, নিবারণ দত্ত, মহেন্দ্র শ্যাম, নরেশ ঘোষ, বারীন ঘোষ, অজিত ভট্টাচার্য্য।

‡ কৃষ্ণনগর, ত্রিপুরা।

শব্দ আছে, তিনি নেই—তারপর শব্দও নেই, তিনিও নেই। আমরা* বসে বসে শুধু আসন নাড়ছি আর এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। পরে নদীর পাড় গিয়ে ঠাকুরকে দেখলাম। তখন ঐ ব্যক্তিগণ† ঠাকুরকে দেখেই লম্বা হয়ে পড়লেন এবং বললেন, "তোমাকে এতদিন পুত্র-বাৎসল্যে দেখেছি, আমাদের এখন উদ্ধার করার ব্যবস্থা কর।" ঠাকুর আমাদের সবাইকে নিয়ে ঘরে গেলেন এবং ঐ ভদ্রলোকদের একে একে দীক্ষা দিলেন।

ঠাকুর ঐ বিভূতি সম্বন্ধে বসে আলাপ করছেন। তিনি আমাদের বলছেন, "দেখ, এই অবস্থা দেখে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছুই নেই।" এক জায়গায় থেকে যে, আট নয় মাইল দূরে গিয়ে দেখা দিয়ে এসেছেন সে সম্বন্ধেও বললেন, "ওটা বেশী কিছু নয়। মনের অবস্থাটা চালনা ক'রে মনের দ্বারাই আর এক জায়গায় একটা concrete form করে, এই দেহের একই জাতীয় materialগুলো আছে। ঐ মনকে সেখানে নিয়ে স্থাপন করছে, মনেরই একাগ্রতার দ্বারা ঠিক যে materials এ দেহেতে রয়েছে, same materials সেখানে করিয়ে নিয়ে নেয়। তখন ঠিক এই জাতীয় আর একটি চেহারা সেখানে রূপ দিয়ে যতটুকু যা করা দরকার ক'রে আসে।"

ঠাকুর বলছেন, "একরকম পোকা আছে, যখন আর একটি পোকায় আক্রমণ করতে যায়, তখন সে ভীতিতে রক্ষা পাওয়ার

---

* সত্যভূষণ রায়, দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী(২), হীরালাল সাহা, দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী(৩), সুরেন্দ্র দে, নিরঞ্জন সাহা, বারীন ঘোষ, মহেন্দ্র শ্যাম. প্রকাশ বল(মাষ্টার), নিবারণ দত্ত, আশু সেন, বিনয় সোম, বিজয় সোম, নরেশ ঘোষ, বঙ্কিম মাষ্টার।

† সতীশ সরকার, নিবারণ দত্ত, আশু সেন, বিনয় সোম, বিজয় সোম, নরেশ ঘোষ, বঙ্কিম মাষ্টার।

জন্য ঐ পোকাটিকে চিন্তা ক'রে ঠিক ওর মত রূপ নিয়ে নেয়। এই সাধারণ গতির মধ্যেই এই জাতীয় instinct যে বর্ত্তমান তাহা বোঝা যায়। জীবজগতের সবার ভেতরই সেই instinct আছে। এখন অবস্থার সাথে সাথে প্রয়োগের মাত্রাটা যদি বাড়িয়ে নেওয়া যায়, তবেই সেই instinct জেগে উঠে। এখন instinct চলছে মনের প্রসারতার দিকে, যার নাম দিয়েছে 'বিক্ষিপ্ততা'। তাই যখন এ সমস্ত বিভূতিগুলোর কার্য্যকলাপ মানুষের শ্রবণে গিয়ে পড়ে, তখনই ঐ বিক্ষিপ্ততা হতে হয় 'গাঁজাখুরি', না হয় 'আশ্চর্য্যজনক', নয় 'impossible', শেষ পর্য্যন্ত মাথা খারাপ—এ বদনাম দিয়ে ছেড়ে দেয়। ঐ অবস্থায় এই জাতীয় অবস্থাই বের হয় বেশীর ভাগ দেখা যাচ্ছে। তার মধ্যে, ঐ বিক্ষিপ্ততার মধ্যে, যে যতটা বিচার শক্তিতে নিয়ে বিচার করে, এই instinct রূপটির সত্যতা ততটা বুঝে নিতে পারে। তাই প্রথমতঃ বিচারশক্তিকে বাড়াতে হবে, সেখানে জ্ঞানের অবস্থা গিয়ে পৌঁছে। আর সাধারণতঃ এই সৃষ্টির ভেতরে যত রকম পদার্থ দৃষ্টিতে ও গ্রাহ্যেতে এসেছে, আরো কত সূক্ষ্মে যে রয়েছে তাহা বর্ণনা করা যায় না। 'মাছ রাঙ্গা' যে একটি পাখী, বহুদূর হতে জলের ভেতর মাছকে দৃষ্টিতে লক্ষ্য রেখে বহু উঁচু হতে সে চলন্ত ষ্টীমারের পেছনে ধেয়ে ধেয়ে, অত speedএর সাথে সাথে গিয়েও এত ঢেউয়ের মাঝ থেকেও সে তার খোরাক যুগিয়ে নিচ্ছে,—instinct সন্দেহ নেই। এই যে powerটুকু রয়েছে, সর্ব্বজীবের ভেতর তাহা বিদ্যমান, যে-কোন জীবের, যে-কোন powerএর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। প্রত্যেকটি জীবের প্রত্যেকটি power আয়ত্ত করার অধিকার রয়েছে, অধিকৃত আছে বলেই অধিকারে তারা আসছে। তাই তোমাদের পক্ষেও নিজের দেহকে একটা যে-কোন জীবের চেহারায় পরিণত করা বা যে-কোন লক্ষ্য ক'রে লক্ষ্য ভেদ করা—এই শক্তি যে রয়েছে তার

পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। জীবের প্রত্যেকের প্রত্যেকের আদান-প্রদানে জীবজগতের যে পার্থক্যতার মধ্যে যে শক্তি বিদ্যমান রয়েছে, তাতে যদি তোমার অবস্থাকে প্রত্যেকটির মধ্যে চিন্তা কর এবং প্রত্যেকটি যে তুমি, এ যদি ভেবে নেও—প্রত্যেকটির power যে তোমার, তাহা স্বাভাবিক। তাই প্রথমতঃ তোমাদের চিন্তা করা উচিত, এই প্রাকৃতিক সৃষ্টির মধ্যে কোথায় কি লুক্কায়িত রয়েছে, সেগুলো তোমার দর্পণের কার্য্য করবে, সেই সৃষ্ট জীবের পদার্থ-গুলো তোমার নিজের পরিচয় দেবে—who are you? একটা সর্প্প, তাকে যদি কেউ কোন ঘা বা ব্যথা দেয়, দশ মাইল, বিশ মাইল, ত্রিশ মাইল, একদিনের রাস্তা গিয়ে তাকে দংশন ক'রে এসেছে এবং তার বাড়ীতে গিয়েছে যে, এ রকম বহু প্রমাণ ও উপমা বাস্তবে রয়েছে। বেশী দূর যেতে হবে না, আমারই এক ভক্ত সর্পকে টেঁটা মেরেছিল, সেই টেঁটা ভেঙ্গে সর্পটা চলে যায়। প্রায় পনের মাইল দূরে এ কাজটা করেছিল। বাড়ীতে এসে ঘুমিয়ে আছে। তার দরজার যে চৌকাঠ, তার ভেতরে ছিদ্র ছিল। সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে মধ্যরাত্রে মাথা ঢুকিয়ে সর্পটি ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু সে ঢুকতে পারছে না, তার কারণ, সর্পের গায়ে যে টেঁটা ভাঙ্গা ছিল, তা চৌকাঠে ঠেকছে। ঐ খট্ খট্ শব্দ পেয়ে বাতি জ্বালিয়ে দেখে সর্প। তারপর লাটি নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে গিয়ে ওকে বাড়ি দিয়ে মেরে ফেলে। সেটা এনে সবাইকে দেখিয়েছে। এখন তার ঘ্রাণশক্তি রয়েছে, আর যে-কোন শক্তিই রয়েছে, তা দিয়ে পনের মাইল দূরে গিয়ে ঠিক ঠিকানা বের ক'রে অদ্ভুতেরই পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু অদ্ভুত কিছুই নেই—এই ভূতেতে সব-কিছুই যে রয়েছে, সবই যে তার দ্বারা সম্ভব। প্রত্যেকের প্রত্যেকের গড়াবার জন্য এ হলো natural book। এই বিশ্ব-book study ক'রেই প্রত্যেকের প্রত্যেকের তৈরী হতে

হবে। সুতরাং এক জনের অন্তর্য্যামীত্ব, দূরশ্রবণ, দূরদর্শন, দেহের পরিবর্ত্তন, আর vanishing কিছুই না, যদি প্রত্যেকটিকে study ক'রে ক'রে বুঝে নেয়। কোন কোন জীবের অন্তর্য্যামীত্ব দেখা যাচ্ছে সহজাত, দূরশ্রবণও তথৈবচ, আর দূরদর্শনও ঠিক তাই, আর vanishing তো বিরাজ করা—সে তো তোমার রূপ, তুমি নিজেই নিজের পদার্থকে সৃষ্টি হতে চিন্তা ক'রে এনে বসাও, তবেই বুঝতে পারবে, তুমি কি ভাবে আবির্ভূত হলে এই ভূতেতে। আবার এই ভূত যখন লয়ের চেহারা দেখায়, তখন এই ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, এই যে নামাকরণ কতগুলো আছে, প্রত্যেকটির সঙ্গে সে মিশে যাচ্ছে, মিশবার ক্ষমতা ছিল বলেই তো মিশতে পারছে—এও একজাতীয় vanishing অবস্থা। জীবজগতে সমস্ত পদার্থই যখন জীবন্ত ও চৈতন্যময়, সুতরাং এই পঞ্চভূতের প্রত্যেকটি পদার্থই চৈতন্যযুক্ত। তারা সেই চৈতন্যেরই এক-একটি cell—self like you; সুতরাং সে কিন্তু এখন vanishing—সেইটি কে? তুমি তো, তোমারই তো তবে সবই যে আছে, আনিয়ে নিয়ে কার্য্যে পরিণত করা, এ ছাড়া তো আর কিছু নয়। সুতরাং এখন হচ্ছে অবাক্ বা আশ্চর্য্য বা মাথা খারাপ বা বদনাম—এটা হলো gasএর ক্রিয়া। বড় বড় জাহাজগুলো আছেনা! ঘাটে ভিড়িয়ে রাখলে কয়লা দিয়ে engine তো চালু ক'রে রাখতে হয় steamএর জন্য, তাই মাঝে মাঝে পেছন দিয়ে কিছু ধোঁয়া ছেড়ে দিতে হয়। তাই এখন চলছে 'ধুয়া' ঠিক ধোঁয়ার মত, তবে steam যে আছে তাতো ঠিকই, তা না হলে 'ধুয়া'রূপ ধোঁয়া কোত্থেকে এল? তোমরাই একটু চেষ্টাতে কতটকু balance আয়ত্তে আনতে পার তার পরিচয় তো অহরহ পাচ্ছো। একজন সাধারণ লোক, সে চেষ্টার দ্বারা তারের উপর দিয়ে হাট্‌ছে, তারের উপর দিয়ে cycle চালাচ্ছে, সে শূন্যের উপর তিন চার প্যাঁচ্ মারছে, circusএ এ জাতীয় বহু

খেলা রয়েছে, প্রতি মুহূর্ত্তে বিপদ্‌জনক। একটা ছেলেকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এবং আর একজন দূর হতে চাকু ছুড়ছে, কতটা concentrated হলে ঠিক দুই চুল distance রেখে রেখে তার মাথা হতে পা পর্য্যন্ত ছুড়িকার দ্বারা বিদ্ধ করতে পারছে—তার এতটা বিক্ষিপ্ততার মধ্যে এতটা একাগ্রতার পরিচয় দিতে যদি সমর্থ হয়ে থাকে, আর দর্শককগণ বসে বসে 'ইস্ আর উস্' করছে, যেন gas একটু একটু ছাড়ছে, কারণ সমকক্ষ তো ভাবছে, আমি চেষ্টা করলেও পারতাম, এই সমকক্ষ শুধু সমচেহারার জন্য নয়, জীবজগতে সবাই সমকক্ষ। যা-কিছু যার যার রয়েছে, সব-কিছু তার আয়ত্তে আসতে পারে, আবার সেই লোকটির তোমাদের মত সব বৃত্তি আছে, কোনটাই কমেনি, ওটা করাতে যে তার খাওয়া কমে গেছে কিংবা সে তার কাম ভুলে গেছে তা নয়, সব পরিপূর্ণ আছে। এরকম অজস্র জনগণ যে সমস্ত সূক্ষ্মতার মধ্যে তার নানারকম আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে, তাদের ভেতরও সব-কিছু বিদ্যমান রয়েছে। এই বিক্ষিপ্ততা ঠিকই রয়েছে, এই বিক্ষিপ্ততা হতে একটু একাগ্রতা আসতেই এ বিশালের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। একটা বাষ্পযান কত অজস্র পদার্থাদি টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আরো কত অজস্র ক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছে। দৈহিকের দিক্ দিয়ে পরিচয় দিলে কি হবে, মনের speedএর কাছে যে নগন্য এবং যে মন হতে এ সব আবিষ্কার হয়েছে, কতটুকু আর এর মধ্যে পরিচয় দিয়েছে, এতেই বাহবা, কারণ প্রত্যক্ষে এসেছে, তাই 'বাহবা' রূপে gas বেরিয়ে যাচ্ছে। তার কারণ, চেষ্টা করলে পারা যেত, সমকক্ষ জাতীয়তার মধ্যে পারছে কি না! তোমার মধ্যে যে বৃত্তি রয়েছে, তাদের খুঁজলে একই পাবে, এই আবিষ্কারটুকু হওয়াতে ফুরিয়ে যায়নি কিছু, তার কারণ হচ্ছে, মনের খোরাক ব্রহ্মাণ্ডের সকল খোরাক যে। সবটাকে যেদিন গ্রাস করবে, সেদিন তার পেট ভরবে—উদরটিও তার সেইভাবে তৈরী, হজমশক্তিও তার সেই

জাতীয়তার মধ্যেই যে রয়েছে। সুতরাং তুই শক্তিতে কোন পার্থক্য নেই। একটা এসে তাকে ঠিক রাখছে, আবার ভেতরে গিয়েও নিজে ঠিক রয়ে যাচ্ছে। তুই তু'য়েরই হজম করছে, তু'য়ের ক্রিয়াই সমানভাবে চলছে,—যেমন তুমি food খাচ্ছ; food ভেতরে গিয়ে তোমার জীবনী শক্তিতে ব্যয়িত হচ্ছে, আবার নানাপ্রকারে ব্যয়িত হয়ে নিজে নিজকে relief দিয়ে তোমার সমকক্ষের পরিচয় দিচ্ছে। Both sides are relieved to the same extent and degree। তাই উদরটি এখন কে? উভয়ে উভয়েরই উদর—আমি খাচ্ছি, না আমাকে খাচ্ছে? তুজনের স্বাদই তুজনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে. রহস্য সেখানেই গিয়ে বসে আছে, আবার সমস্ত শক্তিরও বিকাশ করে যাচ্ছে, আবার এই বিকশিত হতেই আয়ত্ত ক'রে যার যার প্রকৃত রূপটিকে বের করছে। তুমি যে সব সময় vanishingএর অবস্থায় আছ, এখন তুমি যদি নিজকে study কর, তাও তোমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 'উপলব্ধি' কথাটা যে বিপদজনক অবস্থা এখানে দেখছি। কিন্তু উপলব্ধি সর্ব্ব অবস্থাতেই যে আছে, সে নিয়ে একটু আলাপ করছি। কারণ এখনকার অবস্থা দেখছি, বেশীর ভাগ, এই 'উপলব্ধি' কথাটা বজ্রপাতের মতই কথা; কিন্তু অহরহ সেটা সব অবস্থায় রয়েছে। তোমার ইন্দ্রিয়াদি হতেই কয়েকটা কথা জানাচ্ছি, তোমার চোখে দেখছ, যে শক্তির দ্বারা তুমি দেখছ, এই sight-powerটা যার উপর গিয়ে পতিত হচ্ছে, যেই যেই বস্তুর ভেতর দিয়ে এটা pass করছে—you, self going there। সুতরাং everything coming from you, self। যেই যেই পদার্থের ভেতর দিয়ে তুমি সহজভাবে দর্শনশক্তি, স্পর্শনশক্তি, ঘ্রাণশক্তি ইত্যাদি যে বহু শক্তির ভেতর দিয়ে আনছ বা টানছ, এই যে সরবরাহ, এই যে passing condition, সেই শক্তিকে যে জাতীয় পদার্থের ভেতর

দিয়ে বহন ক'রে ক'রে যে সমস্ত দর্শন হউক, স্পর্শন হউক, ঘ্রাণ হউক, আর যাই হউক, টেনে আনছে, টেনে এনে রূপ দিচ্ছে, কি শ্রবণে, কি ঘ্রাণে, কি স্মরণে, যে কোন অনুভূতিতে প্রত্যেকটি এক-একটি self bodyর ভেতর দিয়ে এ সমস্ত হচ্ছে। Something না হলে এ সমস্ত আসতে পারতো না ও যেতে পারতো না এবং সেই something গুলো তোমার সব সময় বিরাজিত অবস্থায় না থাকলে এদের ভেতর দিয়ে তুমি যেতে পারতে না, pass করতে পারতে না। তোমার যে বাহ্য বস্তু, material body, body হতে material formএ সব-কিছু materialisticএর পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে, as you are now—এখন তুমি যেমন রয়েছ। যেই material bodyর formএ, সেই জাতীয় সূক্ষ্ম যাহা তোমাতে রয়েছে এবং যাহা তোমার স্পর্শের ভেতর দিয়ে অনুভূত হয়েছে, সেই স্পর্শের অণুগুলো ঠিক সেই জাতীয় না হলে তুমি স্পর্শে realise করতে পারতে না। এখন যে জাতীয় অবস্থায় তোমার দেহের পরিচয় থাক না কেন, ঠিক সেই সেই জাতীয় তার মধ্যে রয়েছে। সমস্ত দেহের cellগুলো যে সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা গোচরে আসছে, সেই সূক্ষ্ম জাতীয় পদার্থগুলোর মত তোমার সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্ব অণুতে, সর্ব্ব sideএ সর্ব্ব partএ, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা যা-কিছু আছে, সব-কিছু বিদ্যমান অবস্থায় রয়েছে তোমার বাহ্য অঙ্গের পরিচয়ের প্রত্যেকটির মধ্যে! যা-কিছু চলছে, এর মধ্যে 'মন'ই এখন সূক্ষ্মতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। দেহটিও self মন, মনেরই আর একটি প্রতীকরূপে দেহকে দেখতে পাচ্ছ। Mind itself এই body, mind itself body, সুতরাং body mindএর সাথে ঘুরবে, bodyও mind হয়ে যাবে, এতে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। 'অবাক্ কথা' কিংবা 'আশ্চর্য্য কথা' solid দেহের পরিচয়ের মত, কয়েকটা solid জাতীয় ভাষা বেরিয়ে গেছে মাত্র। অবাক্ও সেখানে vanish, আশ্চর্য্যও সেখানে vanish, দেহ যেখানে

vanish। আবার মনরূপ মনে গিয়েও বিচরণ করেও সেখানে আবার অবাক্, আবার আশ্চর্য্য এবং infinite সেখানেই বলে বর্ণিত হচ্ছে। সেই জাতীয় জিনিষ আমরা সব সময় টানছি, vanish জাতীয় জিনিষ, যে vanishএ থেকে রূপ দিয়েও vanishএ আছে, আজও আমরা আছি রূপেই vanish, মাধুর্য্য সেখানেই, তাইতো এই বিরাট ওস্তাদ—বিরাট সেখানেই বিরাট নাম নিয়েছে। আমরা সেই বিরাটকেই চর্ব্বণ ক'রে বত্রিশ দন্তে চর্ব্বণ করছি, পৃথিবীকে মটরডালের মত গ্রাস ক'রে উদরস্থ করছি। একটি বৃক্ষ এই পৃথিবীর সমস্ত রসকে টানছে, সমস্ত জাতীয় রসকে টানছে; কি iron, কি stone, in all qualities, যাহা we are eating, প্রকারান্তরে এক-এক গ্রাসে এক-এক পৃথিবীর qualityগুলোকে এই আমরা গ্রাস করছি। এই পৃথিবীতে কত রকম জিনিষ কত রকম পরিচয় দিচ্ছে, যাহা ব্যবহার্য্য পৃথিবীতে দৃষ্ট রয়েছে। এই মৃত্তিকা হয় পর্ব্বত, হয় প্রস্তর, হয় লৌহ, হয় হীরক, হয় স্বর্ণ, হয় সাগর, বত্রিশ দন্তে চর্ব্বণ ক'রে প্রস্রাবে ও নানাভাবে বের ক'রে দিচ্ছি, সব-কিছু যে একই অবস্থায় করছি, সব-কিছুকে আমার ভেতরে এনে আমার ভেতরে গ্রাস করছি। সমস্ত ক্ষমতা আমাতে বিদ্যমান বলেই তো সব-কিছুকে হজম করছি। তাই ইচ্ছা হলে তুমি হতে পার পাহাড়, হতে পার iron, হতে পার প্রস্তর, তোমাতেই যে প্রস্তরের সৃষ্টি হয়। Kidneyতে পাথর হয়—'পাথুরি' ব্যারাম যাকে বলে; তোমা হতেই যে সৃষ্টি, তোমাকেই আবার অবাক্ করে দিচ্ছে, তোমাকে তাচ্ছিল্য করছে, তোমাকে দেখে হাসছে তাহার কঠিনতম চেহারা দেখায়ে—এ যে তোমার তৈরী, তাই সৃষ্ট জীব তোমা হতে তৈরী। অবাক্ আবার তুমি, সর্ব্বগুণে বিভূষিতও তুমিই, আবার তোমার গুণে তুমি আশ্চর্য্য করছ, তোমার গুণেই তুমি আশ্চর্য্য হচ্ছ—রহস্য সেখানেই, বিরাট সেখানেই।"

পাঁচ

একদিন আমরা* ও আরো বহু লোক বসে† আছি। ঠাকুর উপদেশ দিচ্ছেন। বেলা হয়ে যাচ্ছে অনেক, তিনি স্নান করতে নেমে গেছেন। সব লোককে বিদায় দিয়ে দেওয়া হলো। খাওয়া-দাওয়া ক'রে বিশ্রাম করবেন, এমন সময় একজন সাধু ও দুই-তিন জন লোক গাড়ী থেকে নেমে এলেন। ঠাকুরের নাম শুনে ঠাকুরের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। আমরা তাঁদের ভেতরে নিয়ে এলাম। ঠাকুর তাঁদের যথেষ্ট আন্তরিকতা দেখিয়ে বসালেন এবং আহারাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা আহারাদি সম্পন্ন ক'রে এসেছেন জানালেন। ভেতরের ঘরে আমরা কয়েকজন আছি। ঠাকুর তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। সাধুজী বললেন, "ব্রহ্মানন্দ স্বামী।" ঠাকুরের পরিচয়ও জিজ্ঞেস করলেন। ঠাকুর বললেন, "বীরেন্দ্র চন্দ্র দেব শর্ম্মা।" নামটা শুনে তাঁরা যেন অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলেন। ঠাকুর বুঝতে পেরেছেন এবং বুঝেই উত্তর দিচ্ছেন, "এখনও পরীক্ষাটি দেইনি, তাই degreeটা পাইনি। তবে এক-একজন এক-একভাবে সম্ভাষণ করছে—কেউ ব্রহ্মচারী, কেউ গুরুদেব, কেউ বাচ্চা ঠাকুর, কেউ বালক-ঠাকুর, কেউ বালকব্রহ্মচারী—উত্তর দিয়ে যাচ্ছি ; শত্রুরা বলে আবার 'শয়তান ঠাকুর'—সবটাতেই সাড়া দিয়ে যাচ্ছি ; কারণ কোনটাই

---

* ভূপেন রায়, রবি ঘোষ, দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী(২), অমরেন্দ্র দাশ, শান্তি দাস মজুমদার, বারীন ঘোষ, অজিত ভট্টাচার্য্য আর অনেকে।

† স্বামিবাগ, ঢাকা।

যে আমার না; সমাজগতভাবে মা বাবা যে নাম দিয়েছেন, সেই নামেই আমি পরিচয় দিয়ে যাচ্ছি। আপনার মা বাবা বুঝি এ নাম রেখেছেন? আপনার বাবার নাম বলতে আপত্তি আছে কি?" সাধুজী আপত্তি জানালেন। ঠাকুর একটু তাকিয়ে বললেন, "আপনার এ নামের প্রয়োজনীয়তা-সম্পর্কে একটু অবগত হতে চাই।" সাধুজী বললেন, "এটা সন্ন্যাস-আশ্রমের নাম।" ঠাকুর বললেন, "আপনি এই নাম নেওয়াতে এর উপকারিতা-সম্পর্কে কিছুটা উপলব্ধি নিশ্চয়ই করেছেন, কারণ এটা একটা spiritual diplomaর মত, খুশিতে গভর্ণর যেমন, খান সাহেব, খান বাহাদুর, রায় সাহেব, রায় বাহাদুর, অনেক কিছু উপাধি দিয়ে থাকেন। উদ্দেশ্যটা তো বোঝেন?—কতগুলো লোককে হাতে রাখার জন্য আর administration রক্ষা করার জন্য। এই সমস্ত titleএর মর্ম্ম ত বুঝতেই পারছেন, যাঁরা দিচ্ছেন তাঁরাও বোঝেন। আবার তাঁরা ঘরে গিয়ে হাসেন ও বলেন, 'কি আহাম্মকের রাজত্ব রে বাবা!' কেননা, তারা administrationএর দিক্ দিয়ে তো successful, যত ভাবে যত বড় বড় চাল দিয়ে যেতে পারে, যাক সে কথা, সন্ন্যাস-administration চালাবার জন্য সে-জাতীয় তো নয়? বড় বড় নামের উপাধি দেওয়া হলো, কার্য্যে 'কেব্‌লার বাপ'। দেখুন, আমি নিজের clarificationএর জন্য এ সব বলছি, আপনাকে আঘাত দেওয়ার জন্য নয়।" সাধুজীর বেশ একটু রাগরাগ ভাব, আর সাম্যভাবও বজায় রাখতে চাইছেন, কিন্তু হাসি আর নেই। ঠাকুর বললেন, "আপনি যেন রেগে গেলেন, আপনার তো তা সাজে না।" সাধুজী তখন ঠাকুরকে বলছেন, "আপনি কত বৎসর যাবৎ এ পথে আছেন?" ঠাকুর উত্তর দিলেন, "জন্মেছি অবধি তো এই লাইনের ব্যবসা করছি, এখনও করছি, তবে business বড় মন্দা, জিনিস বেশী বিক্রয় হয় না। আশপাশ থেকে ভেজালযুক্ত জিনিস খাঁটি বলে বিক্রি করছে, তা বেশ বিক্রি হচ্ছে—ভেজাল আবার

ভেজাল বলে জেনেও নিচ্ছে, কারণ সস্তায় দিচ্ছে, আর এত পরিশ্রম ক'রে খাঁটি তৈরী করছি, দিতে যাচ্ছি, নিতে চায় না। আমি যদি পয়সা ছাড়াও দিতে যাই তবুও ভয় পায়—দামের তো কোন প্রশ্নই নেই। একেবারে যে না নিচ্ছে তা নয়, যখন ভেজাল খেয়ে 'ডিস্‌পেপ্‌সিয়া'র উদ্ভব হয় এবং খাঁটির prescription যখন পায়, তখন খুঁজতে খুঁজতে আমার নিকটে উপস্থিত হয়েছে দেখা গিয়েছে। সেই সমস্তের সঙ্গেই বেশী সাক্ষাৎ—হালের উদ্যোগে এগিয়ে চলছে সেই নানারকম বাহ্যিক ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানে মাতোয়ারা হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সংস্কারের ভেতর বেশীর ভাগ জনগণ। সংস্কারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে এমন একটি অবস্থা তার মধ্যে সৃষ্টি হয়, তার মধ্যে সে যেন নিজেই হারিয়ে যায়, ঠিক গমে আর কাঠের গুঁড়োতে মিশিয়ে যাওয়ার মত। তারপর ছাক্‌নিতে ফেলে যার যার রূপকে বের করে যথাস্থানে রাখা হয়, পরিস্থিতির অবস্থা ক্রমশঃ এইরূপ অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, বেশীর ভাগ জনগণের ভেতর এমন একটা food-poisonএর ক্রিয়া করছে, বেশীর ভাগই অসুস্থতার পরিচয় দিচ্ছে। একরকম জন্তু আছে, রক্ত পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিজের পা চাটতে চাটতে রক্ত বের করছে, সেই রক্তের স্বাদ পেয়ে নিজের 'পা'ই খাচ্ছে। সে ভাবছে ওকে বুঝি কেউ পেছন থেকে তাড়া দিচ্ছে 'খেয়েনি, খেয়ে গিয়ে ওকে ধরবো'। এদিকে কিন্তু পা' খানা শেষ ক'রে ফেলেছে, তারপর নিজের দুঃখে নিজেই জ্বলছে। আজ সেই জ্বলন্ত অবস্থা আমাদের মধ্যে দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে। আগেই তার প্রতিকার বিধেয়। সেই চিকিৎসা ছেলে মায়ের সম্পর্ক যুক্ত অবস্থার মত না হলে স্নেহের টানে মনপ্রাণে এগিয়ে যে যাবে, তার মূলে যুক্ততাটাই ঐ সমস্ত maintain করছে। ঠিক সেই জাতীয় উভয়ের আকর্ষণ ঐ জাতীয় সমতুল্য অবস্থা হবে, তখনই সমতা maintain হবে সর্ব্বতোভাবে সবার উপরে। গর্ভধারিণী মা যেমন ছেলের কাছে

মাতৃত্ব প্রমাণ করার চিন্তাও মনে আনেন না, সৎমা'ই যান সেই পরিচয় দিতে, সন্দিগ্ধতার মাঝে নিজে আছেন বলে। ছেলে মায়ের এমন মধুর সম্পর্ক, সর্ব্ব অবস্থায় তার মাতৃত্ব যে কোন অবস্থায় রক্ষিত হবে, মা'ও জানে ছেলেও জানে। তাই শত ঝগড়াবিবাদ তাদের ভেতর মধুরতম অবস্থার স্থায়িত্ব রেখেই সব-কিছু হয়। আর এক মাসের শিশুকেও যদি এনে কোন মেয়ে লালনপালন করে, পুত্র-স্নেহে, সন্তান-জ্ঞানে মানুষ করতে থাকে, দুনিয়ার আর কেউ না জানুক, মা তো জানে 'ছেলে আমার না', ছেলে জানে, স্বয়ং তার মা। মায়ের আচরণে প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রকৃত রূপটি নানাভাবে বিকাশ হবে, সন্তান অজ্ঞান, সে কিন্তু কিছুই জানে না। সন্তানের রাগ কিংবা অভিমান এমন একটা ব্যবহারের ভেতর এসে দাঁড়াতে পারে, যাহাতে ছেলে মায়ের একটা ঝগড়ার অবস্থার মত সৃষ্টি হলো। ঠিক ঐ যে সৎ মা, real মা হিসাবে যে পরিচয় দিয়েছে, realityটা তার really বেরিয়ে যাবে তখন, 'পরের ছেলে হয় না কখনও আপন'—এই উক্তি বেরিয়ে যাবে, আশ্চর্য্য সেখানেই। এত বছর রেখে দেওয়া সত্ত্বেও, মনের একাগ্রতা সত্ত্বেও মনকে মাতৃত্বের প্রকৃত রূপ দিতে সমর্থ হয়ে উঠেনি। এই জাতীয় অবস্থা যদি নিজের জ্ঞানে, মনে সর্ব্বতোভাবে যদি রয়ে যায়, তবে গলদ থেকেই যাবে! তাই সৃষ্টির সম্পূর্ণ তত্ত্বকে অবগত হয়ে সন্তান-বাৎসল্যে এক জাতীয় অবস্থা রেখে এই বিশ্ববোধে, স্রষ্টা সৃষ্টি বোধে বা পিতা পুত্র বোধে, ঐ জাতীয় মনের আকর্ষণ, উভয়ের স্নেহযুক্ত অবস্থা যদি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ব অবস্থায় maintain করতে পারে, তবেই হবে প্রকৃতস্থ এবং প্রকৃত সম্পর্ক নষ্ট হবে না, তখন শত অপরাধে ও শত বিক্ষিপ্ততাতে, সব-কিছুর মূলে আবদার-পূর্ণ, শ্রদ্ধামিশ্রিত, স্নেহযুক্ত সমস্ত ঠিক একটা মিছরী জাতীয় অবস্থার মত হবে, যেমন খেতে খেতে মিছরীতেই ডুবে রইলো, কিন্তু সেই মৃত্যুকেও আনন্দে বরণ করছে, একটি যুক্ততার মধ্যে রয়েছে বলে।

আবার এ জাতীয় তার একটা উপমা রয়েছে—'মিষ্টির হাঁড়িতে পড়ে অজ্ঞানতায় ডুবে মরছে—সেখানে হলো জ্বালা। সৎমা ও ছেলের বেলায়ও এ জাতীয়, যদি অজ্ঞানতা এসে দাঁড়ায়। মা যদি ছেলেকে মারতে মারতে অজ্ঞান ক'রে ফেলে, বিরক্ততার মাঝেও বিরাট আকর্ষণ যে রয়ে যাচ্ছে, সন্তান চীৎকার করছে, 'মা, মেরে ফেললে, মেরে ফেললে', মা'ও চোখের জল রাখতে পারছে না। এই উপমা-গুলোর প্রয়োজন হচ্ছে, আমরা যে বিরাট থেকে উদ্ভব, এই বিরাটেই যদি মনোনিবেশ করে থাকি, বিরাটকেই পিতৃমাতৃতুল্য ক'রে রাখি এবং সেই আকর্ষণযুক্ত হয়ে যখন সব-কিছু পাচ্ছি, রক্ষণাবেক্ষণ সেই করছে, সমস্ত কিছু যখন তার থেকে উদ্ভব আবার স্রষ্টার সকল ক্ষমতা যখন আমাতে রয়েছে, সুতরাং সফলতাও সেখানেই রয়েছে, সেই জাতীয় পরিচয়ই বাস্তবে সর্ব্বক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে।" সাধুর সঙ্গে আলাপ হলো, সাধুজী আলাপগুলো সব শুনলেন। তিনি আরো নানাবিষয় জিজ্ঞেস করলেন এবং শেষে বললেন, "আমি কি জানি? আমায় যা দিয়েছে, সেই ভাবেই নিয়ে আছি।" ঠাকুর বললেন, "আপনাকে কোন আক্রমণজনক কথা বলছি না, তবে দেশের আব-হাওয়ার কথা বলছি।" তারপর সাধুজী আর একদিন আসবেন বললেন। যাওয়ার সময় বললেন—"আমি খুব খুশী হয়েছি।"

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

ছয়

ছেলে বয়সে একবার সরস্বতী-পূজো উপলক্ষে পূজোর ভার আমার উপর পড়ে। আমি* ঠাকুরকে এর মধ্যে টেনে নিয়ে গেলাম। ছোট বয়স হতেই আমি ঠাকুরের সাথে একত্র থাকি, তাই ঠাকুরকে এই সরস্বতী-পূজোতে টানতে পেরেছিলাম। তিনি পূজোয় চাঁদাও দিয়েছিলেন, পূজোর জন্য যতটা সহযোগিতা করা দরকার, সবই তিনি করেছিলেন। ফুলের ভার আমার উপর পড়েছিলো, তার কারণ ঠাকুর আমার আবদারের মধ্যে থাকাতে তারা এ ভারটা আমায় দিয়েছেন। কারণ ফুল যেখান থেকে আনতে হবে, কারুর সাধ্য নেই আনে। একমাত্র ঠাকুর যদি ব্যবস্থা না করেন, তাই বুঝেই বন্ধুরা আমার উপর এই ভার দিয়েছিলো। আমি এসে ঠাকুরকে বললাম, "এ অবস্থায় আমি ফুল কোথা হতে আনি? আমার উপর এ ভার দিয়েছে, আমি তো ফুল যুগিয়ে দেব বলে এসেছি।" ঠাকুর বললেন, "ঠিক আছে ভট্টাইজ্† চিন্তা করার কি আছে? ফুল যুগিয়ে দেওয়া যাবেই।" আমি বললাম, "তোমায় এর মধ্যে থেকে সব-কিছু গুছিয়ে দিতে হবে, সবাই চায় তুমি এর মধ্যে সহযোগিতা কর।" ঠাকুর বললেন, "বেশ তো, তুমি যখন আছ আমি নিশ্চয়ই যাবো, এ যে আনন্দেরই ব্যাপার, আমাকে যাওয়ার সময় নিয়ে যেও। আর ফুল যোগাড় করতে হলে পূজোর আগের দিন গিয়ে ওকে গুছাতে হবে।

---

* অজিত ভট্টাচার্য্য।

† ভট্টাইজ্—ঠাকুর ভট্টাইজ্ বলে ডাকতেন।

তুমি ডালা ধরবে, আমি ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে দেবো, আর যা গুছাবার আমি গুছিয়ে নেব। ঐ সব চুরিটুরি ক'রে আনতে পারবো না, ওটা কোনরকম আনন্দের অঙ্গ নয়। তুমি কোন্ কেতাবে জেনে এলে যে এভাবে ফুল আনতে হবে?" আমি বললাম, "না, তুমি পারবে বলেই ওরা আমায় ভার দিয়েছে।"

তারপর পূজোর আগের দিন বিকেলবেলা ঠাকুর আমাকে নিয়ে ঐ বাড়ীতে* গেলেন। ঠাকুর সাধারণতঃ কারুর বাড়ী বেশী যান না, ছোট বয়স হতেই এ স্বভাব। ওদের বাড়ী যাওয়াতে ওরা বেশ খুশী হয়েছে, আবার তারা সন্দেহও করলো, 'ঠাকুর কেন এলো হঠাৎ!' আমাকে সাথে দেখে বেশ বুঝতে পারলো, কেন ঠাকুরকে নিয়ে গেছি। তারা আগেই বলে উঠেছে, "ফুল কিন্তু কাউকে দেবো না, এক তোমাকে কয়েকটা দিতে পারি। বড় বড় রাজ-গাঁদা ছিঁড়তে সত্যই খুব মায়া লাগে।" ঐ বেচারার† পিত্তশূল ব্যথা ছিল। ঠাকুর বললেন, "আমি তো একটা ঔষধ জানি, সেটা সাময়িক ব্যবহার করে দেখতে পারেন কি রকম হয়।" ঠাকুরের আবার একটা নীতি আছে, কিছু ক'রে তার বিনিময়ে কিছু নেওয়াটা তিনি পছন্দ করতেন না। বেচারার ব্যথা তখনও চলছিলো, কারণ ব্যথা প্রায় সকল সময়ই থাকে। ঠাকুর কিছু আঠাল মাটি নিয়ে পেটে প্রলেপ দিতে বললেন। তারপর ঐ বেচারা জিজ্ঞেস করলো, "কোন নিয়ম-কানুন পালতে হবে নাকি?" তখন ঠাকুর আমাকে বললেন, "তোমায় যে কয়টা নিয়ম বলে দিচ্ছি তা ওকে জানিয়ে দেও, আমি এদিকে ফুলের ব্যবস্থা করি।" এরপর আমায় কয়েকটা নিয়ম বলে দিলেন, আমি তাকে ডেকে নিয়মগুলো বলে দিলাম,

---

* বিক্রমপুর।

† উপেন্দ্র পাল।

—"বেশী জোরে কথা বলা নিষেধ, রাগ করা নিষেধ, তাড়াতাড়ি হাঁটা নিষেধ।" আমি দেখলাম, এই নিয়ম ঠিক রেখেই আর একটু বাড়িয়ে বললে মন্দ হয় না, তাই বললাম, "ঘরে আগুন লাগলেও চীৎকার করা নিষেধ, রাত্রি জাগাও নিষেধ, এরকমভাবে যদি নিয়ম মেনে ঠিকমত চলতে পারেন, তবে আর ব্যথা হবে না।" ঠাকুর আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, "নিয়মগুলো মানে কিনা তুমি লক্ষ্য করো।" আমি তাকে বললাম, "আপনি নিয়মমত চলেন কিনা, আমাকে দেখতে বলছেন।" ঠাকুর ঔষধ দিয়ে চুপ করে আছেন। এর মধ্যেই ব্যথা কমে গেছে। আমি তাকে বললাম, "এখন আপনার পরীক্ষা হবে।" তখন সে তো আর বুঝতে পারে নাই যে, ঠাকুর গিয়ে গাছের ফুল ছিঁড়বেন। তখন তাদের বাড়ী থেকে লণ্ঠন ও ডালা নিয়ে আমার হাতে দিলেন, ঐ বেচারা এ দেখে তাড়াতাড়ি পিছে পিছে আসতে লাগলো, তখন সাথে সাথেই আমি বলে উঠলাম, "এই তো আপনি নিয়ম অমান্য করতে আরম্ভ করেছেন।" আর এদিকে ঠাকুর একটা-একটা ক'রে ফুল ছিঁড়ছেন আর আমার হাতের ডালায় দিচ্ছেন। ভদ্রলোক রাগতেও পারছে না, চট্‌তেও পারছে না, বেশী জোরে কথাও বলতে পারছে না। সে বলছে, "সবই কি নেবে নাকি ?" ঠাকুর বলছেন, "আরো নম্র হতে হবে, নতুবা পরীক্ষায় টেকা যে বড় দায়, পরীক্ষায় আপনিও পড়েছেন, আমরাও পড়েছি—আমরা নেবো, আপনি দেখবেন। আপনার আইনে আপনি চট্‌বেন না, আমরা আবার পরীক্ষামূলকের চেহারায় আমাদের কাজটা গুছিয়ে নিচ্ছি।" উনি বলছেন, "বোঝলাম তো বাবা, ব্যথা কমে গেছে, তাই চট্‌তে নিষেধ করছো। ফুলগাছ আর ক'দিন থাকবে ও আবার বাড়ানো যাবে। ব্যথা তো আর হাজার টাকা খরচ ক'রে কমাতে পারছি না, তাই তোমার ফুল-তোলাটা আনন্দই যে লাগছে, না হলে আমার গাছের ফুলে আবার হাত দেয়, তাও

আবার আমার সামনে?" ঠাকুর তখনও ফুল ছিঁড়ছেন আর আমার ডালায় দিচ্ছেন। ঠাকুর বললেন, "আপনার একটা বৈরাগ্য, নম্রতা, শান্তভাব শত চেষ্টা করলেও হতো না, উপদেশ দিলেও তেমন হতো কিনা সন্দেহ—একটুতেই কতটা চেহারা বদ্‌লে গেছে আপনার। আপনিও, ফুল তুলছি, রাগ করতে পারছেন না, আনন্দই পাচ্ছেন।" সে বললো, "হ্যাঁ, আমি আনন্দই পাচ্ছি তুমি যে ফুল তুলছ।" ঠাকুর বললেন, "আপনিই তুলে দিতেন।" বললো, "হ্যাঁ, দিতেম। তোমার হাতে যে ফুল দিতে পারছি তাতেই আনন্দ পাচ্ছি।" "এক উপশমেই সব পরিবর্ত্তন ক'রে ফেলেছে। এইভাবে যদি সব-কিছু ফুল হয়ে ফোটে, যে আনন্দ বাগান ক'রে পেয়েছেন, ঐ জাতীয় যদি ভেতরের ফুল ফুটে উঠে, তখন কতই না আনন্দ পাওয়া যাবে। ব্যথা সেরে যাওয়াতে আর কতটুকু উপশম পেয়েছেন। এর চেয়ে আরো অনেক কিছু রয়েছে, যেখানে গেলে আর বলার কিছু থাকে না।" সাথে সাথে ঠাকুর তার কাজ ক'রে যাচ্ছেন। এর মধ্যে আমার ডালা ফুলে প্রায় ভর্ত্তি হয়ে গেছে, আমার কাজও শেষ হয়ে গেল, ঠাকুরকে নিয়ে চলে এলাম। আমার সাথীরা তো ফুল দেখে সবাই অবাক্। কি ভাবে তাহা হলো, ঘটনাটা সবার জানাজানি হয়ে গেল। সরস্বতী পূজোর সময় ঠাকুর সব সময় দেখাশুনা করেছেন, প্রসাদ-বিতরণের দিক্ দিয়েও তিনি খুব ব্যস্ততা দেখিয়েছিলেন, যাতে সবাই পায় তার জন্য বিশেষ দৃষ্টি রেখেছিলেন, সেজন্য লোকও অনেক হয়েছিলো, ঠাকুরকে দিয়ে আরতি করানোর জন্য সবাই আমাকে ধরেছিলো। আমি বললাম, "একি সম্ভব? আরতি কি আর করবে? যখন বলেছেন, তখন বলে দেখি কি পর্য্যন্ত হয়।" তারপর গিয়ে তাঁকে বললাম, "সবাই আমায় ধরেছে তোমার আরতি দেখবে।" তখন ঠাকুর বললেন, "ঠিক আছে, আমি একা? তুমিও কিন্তু

নাচবে!" আমি বললাম, "তুমি বললে নাচবো।" তখন ঠাকুর আরতি আরম্ভ করলেন, ধূপতি হাতে আমিও সাথে সাথে আরতি করছি। সময়-সময় আরতি করার সময় ধোঁয়াতে ঠাকুরকে আর দেখা যায় না। সবাই এ আনন্দটা বেশ উপভোগ করছিলো বসে বসে। তারপর আমরা আরতি শেষ করলাম। এরপর ঠাকুর সবার সাথে আলাপ করছেন এবং সবাইকে বোঝাচ্ছেন, "দেখ, আজ আমরা যে একত্র হয়েছি এবং আনন্দ করছি, জ্ঞানের প্রতীকহিসাবে পূজো করছি; শুভ্রতা হচ্ছে জ্ঞানকে যদি বশীভূত করা যায়, তবে সব সময় ধব্‌ধবে ভাব—এ প্রভাবটাই সবার ভেতরে গিয়ে ফুটে উঠে, যাকে বলে সাত্ত্বিকতা ভাব। আজ সেই জ্ঞানের রূপ হিসাবে একে যে আমরা সবাই আরাধনা করছি, প্রকারান্তরে আমরা জ্ঞানেরই পূজো করছি। তাই সেই বীণাতে আমরা সুর মিলাচ্ছি—তবেই বেজে উঠবে আমাদের সেই বাজনা, যেই বাজনা বাজলে সব-কিছুকে বাজিয়ে নিতে পারি—তার সাধনাই আমরা করছি এই মূর্ত্তিকে প্রতীকহিসাবে গ্রহণ ক'রে। এই যে গ্রন্থাদি ও সমস্ত বই তাঁর কাছে রাখা হয়েছে, তার মানেই হচ্ছে সমস্ত জিনিষকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সব গ্রন্থাদিকে বুঝে যেন হজম করতে পারি। সেই স্মরণশক্তিটাকেই স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য জ্ঞানময়ীর মূর্ত্তির নিকটেই আমাদের আন্তরিকতা জানাচ্ছি। আজ এই মূর্ত্তি তোমরা বাইরের পূজোতে নিজের অন্তরে প্রতিষ্ঠা করার যে চেষ্টা করছো, তা অন্তরেই যাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, সে অবস্থাই কাম্য। তখন বাইরের আড়ম্বর আর থাকবে না। তাই আমার এই সহযোগিতার কারণই হচ্ছে আমার আন্তরিক অবস্থাকে জানিয়ে দেওয়া।" তারপর সবাই খুব খুশী হলেন। তিনি ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ভাবে সবার সাথে আলাপ করলেন। তিনি প্রত্যেকের সাথে এভাবে মেলামেশা ক'রে তার প্রকৃত রূপটিকে তিনি সকলকে বুঝিয়ে দিতেন। আরো অনেক কিছু

দেখেছি, তিনি উৎসাহ ক'রে মিশে যেতেন, যেন কাজটা তাঁরই, প্রকারান্তরে দেখা গেল তাঁর উদ্দেশ্য তাদের মধ্যে প্রত্যেকের হাব-ভাবের মধ্যে খাপ খাইয়ে নিয়ে তাঁর মনের অবস্থাগুলো সবাইকে জানিয়ে দিয়ে আসা। ঠাকুর বলতেন, "হঠাৎ টান মারলে ছিঁড়ে যাওয়ার ভয় থাকে, তাই সুতাকে আস্তে আস্তে ছেড়ে ছেড়ে খেলায়ে খেলায়ে প্রকৃত রূপকে জানিয়ে দিতে হয়।"

সাত

তখন ঠাকুরের গ্রামের* স্কুলে যাতায়াত ছিল—প্রায় ছাড়া ছাড়া ভাব। আমাদের বয়সও তখন বেশী নয়। ঠাকুরের কাছে অন্যান্য ভক্ত যাঁরা থাকতেন, তাঁদের একজনের কাছ থেকে এটা সংগ্রহ করা হয়েছে। অল্প বয়স হতেই ঠাকুরের নিকট বহু লোকের সমাগম হতো। নাম শুনে বহু দূর দূর দেশ থেকে লোক আসা-যাওয়া করতো—আবালবৃদ্ধবনিতা সবারই সমাগম ছিল। তখন ঠাকুরের বয়স বারো পার হয়ে তেরোতে পড়বে। বহু ছেলেমেয়ে আসতো, তাই আশপাশের লোকেরা ঠাকুরকে বদনাম দিচ্ছে, 'এক ঠাকুর এসেছে, বহু মেয়ে নিয়ে থাকে'। ভক্তরা সেই বদনাম শুনে এসে দুঃখ করতো, "লোকগুলো কি একেবারে মস্তিষ্কহীন?" ভক্তদের সাথে রাস্তায় একজনের† তর্ক হলো, 'বহু মেয়ে যায়, এইতো ব্যবসা ইত্যাদি'। ভক্ত বলেছিলো, "আপনারা যাবেন, গিয়ে দেখে আসবেন।" তারা বললো, "হ্যাঁ, আজ আমরা গিয়ে দেখবো।" তারপর কয়েকজন যুবক এসে উপস্থিত হলো, দেখে অবাক্ হয়ে চেয়ে আছে, বলছে "এ্যাঁ রে, এযে দেখি একেবারে বাচ্চা, জানি না তো এত অল্প বয়স।" তখন এক ভক্ত তাদের বললেন, "বদ্‌নাম তো আগেই রটিয়ে দিয়েছেন।" ওরা বললো, "কিন্তু বয়সটা তো আর

---

* কৃষ্ণনগর, ত্রিপুরা।

† সতীশ সরকার।

জানতাম না, লোকের মুখে শোনা কথা।" ঠাকুর ওদের ডাকলেন এবং তাদের বাড়ী-ঘর সম্বন্ধে আলাপ করলেন। এক ভক্ত ঠাকুরকে বললেন, "এরা খুব বদনাম শুনেছিলো, তাই তোমাকে দেখতে এসেছে।" ঠাকুর ওদের বললেন, "বদনামই যে আগমনবার্ত্তা নিয়ে তোমাদের বহন করে নিয়ে এলো, সুতরাং এরও প্রয়োজন রয়েছে। একটা বোঝা তো আছে সাথে। যে সমস্যা নিয়ে এসেছিলে, সেটাকে কি বাড়িয়ে নিয়ে গেলে, না সমাধানে এলে?" তারা তখন বললো, "আমরা একটা ভুল শুনেছিলাম, এসে দেখি একে বারে উল্টো। মনের সন্দেহ মেটাবার জন্যই এসেছিলাম।" ঠাকুর বললেন, "শুনে কিংবা জেনে প্রকৃত ব্যাপারটি জানতে ইচ্ছুক হয়ে যে এসেছ, তাতে আমি খুশীই হলেম এবং প্রকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে এই নিয়ম। হঠাৎ শুনেই যে মতবাদ না ক'রে, এসে জেনে তারপর যা হয় মতবাদ সে করুক। এবং এই যে বদনাম তোমরা শুনে এসেছ, তোমরা তো এসে বুঝে গেলে; কিন্তু যাদের যাদের আরো বলে আসা হয়েছে, ওরা তো ছড়াতে ছড়াতে চলেছে। বদ্‌নাম দেওয়ার জন্য আগ্রহ যতটা থাকে, পরে সংশোধন করিয়ে দেওয়ার জন্য তেমন আগ্রহ থাকে না।" এর মধ্যে একজন ভক্ত এক কলসী দুধ নিয়ে উপস্থিত হলো। সে এসে অনেক্ষণ যাবতই দাঁড়িয়ে ছিল। আলাপ-আলোচনা হচ্ছিলো বলে সে আর সামনে আসতে সাহস করেনি। ঠাকুর ওকে ডাকলেন। সে দুধ নিকটে রেখে প্রণাম করে বসলো। তখন ঠাকুর বললেন, "একটা গ্লাস নিয়ে এসো, সবাইকে এক-এক গ্লাস ক'রে দুধ খাইয়ে দেও।" বহুলোক সেখানে উপস্থিত ছিল। সুতরাং এক কলসী দুধে সবাইকে এক-এক গ্লাস ক'রে দেওয়া সম্ভব ছিল না। ঠাকুর বললেন, "তোমরা গরম দুধ খেতে ভালবাস, না ঠাণ্ডা বরফের মত দুধ খেতে ভালবাস?" ঠাকুরের কথার উত্তরে কেউ বললো গরম, কেউ বললো ঠাণ্ডা। ঠাকুর বললেন, "বেশ, গ্লাস নেওয়ার

সময় বলবে কে গরম, কে ঠাণ্ডা খাবে। আমার কাছে উনুন আছে, ঠাণ্ডা করার পাত্রও আছে, সুতরাং তুই দেওয়া যাবে।” বদনাম শুনে যারা এসেছিলো, তাদের মধ্য থেকে একজনকে ঠাকুর ডেকে বললেন, “তুমি না হয় তুধ বিতরণ কর। এবার তোমায় দেখবো তোমার দেওয়ার মত ক্ষমতা আছে কি না, প্রত্যেকের আনন্দে তুমি আনন্দিত হও কি না—যে খেতে জানে সে খাওয়াতেও জানে! নিজের খাওয়ার চেয়েও অনেকে আছে অন্যকে খাইয়ে তৃপ্তি বেশী পায়। তোমাকে দেখবো, খাইয়ে তুমি তৃপ্তি পাও কি না।” তখন কয়েকটি গ্লাস ওকে দেওয়া হলো, সে কলশী নিয়ে দিতে আরম্ভ করলো। কেউ বলছে, ‘ঠাণ্ডা খাবো’; কেউ বলছে, ‘গরম খাবো’। যে যার ইচ্ছামত বলতে লাগলো, আর সেও সেই অনুযায়ী দিয়ে যেতে লাগলো। যখন গরম তুধ চাইছে, তখন গ্লাস এত গরম যে হাতে রাখা যাচ্ছে না; আবার যখন ঠাণ্ডা তুধ চাইছে, তখন গ্লাস এত ঠাণ্ডা যে হাতে রাখা যাচ্ছে না। ঠাকুর তাহা দেখে মুচকি মুচকি হাসছেন আর বলছেন, “তোমরা চাইতে পারছো, আর সহ্য করতে পারছো না, চাওয়াকে পাকা কর, তখন উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্ত মতে সব আসবে, তখন সহ্য-ক্ষমতা ও ধৈর্য্য-ক্ষমতা স্বাভাবিক মতে পাবে। গুণকে যদি বিরক্ততায় ধরে নেও, সে তোমার নির্গুণতার জন্য তো? গরম সহ্য করতে পারছো না, গরমের উপর বিরক্ত হয়ে গেলে। ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারছো না, তার উপর বিরক্ত হয়ে গেলে। মন যদি সেভাবে তৈরী না থাকে, তখন যে কোন সুন্দর বস্তুকেও তাচ্ছল্যতার চোখে দেখে, ঠাট্টা-বিদ্রূপ তখনই আসে—একটুতেই অসহ্য, হতাশ চিত্ত-চাঞ্চল্য, না বুঝে অপবাদ দেওয়া, অপমান করা, বুঝবার জন্য অনিচ্ছা—এই জাতীয় অবস্থাগুলো পাত্রটা তৈরী নয় ব’লে। এই পাত্র যখন তৈরী হয়, শক্তিশালী হয় এবং শক্তিতে আসে, তখন সব-কিছুকে সহ্য করতে পারে, জেনে নিতে পারে,

জানবার ইচ্ছা জাগে, হঠাৎ কোন মত প্রকাশ করে না, গুণের আদর তখনই হয়। তখন যদি একটি ওর মাত্রা মতে মতে ভিজে গামছায় আর ঠাণ্ডা হলে একটা গরম কাপড়ে ওকে বাড়িয়ে নেওয়া যায়, তখন ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রে ওকে আপন ক'রে নিয়ে নেওয়া যায়, আর সংযতকে একটু সংযমে এনে তখন রসনাকে অপেক্ষা করিয়ে নিতে হবে ওর প্রতীক্ষার জন্য, মানে, পেয় বস্তু; সুতরাং ঐ আবরণ একটি তৈরী করে নিতে হবে, আর উচ্ছ্বাসের একটি খাপ-খাওয়ানোর মত মাফিক্ মাপেতে মাপেতে মেপে মেপে চলতে হবে মাপজাতীয় জিনিষকে আনার জন্যে।" ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'উচ্ছ্বাসটার মানে কি?' ঠাকুর বললেন, "ভাষার দিক্ দিয়ে যা হউক না হউক, ভাবটা হচ্ছে একটা উন্মাদনার প্রকাশ—উন্মাদনা হলেই যে সে কাজটা করতে হবে। সেখানে একটা অসংযমের প্রকাশ, তার সাথে রাখতে হবে একটা মাপকাঠি নিক্তির মাপের মত। যদিও নিক্তিতে কুঁচ ও সোনাতে অনেক পার্থক্য, তবে ওজনে এক। এক পয়সা দিয়ে একশত কুঁচ আনা যায়, কিন্তু কতগুলো কুঁচ একত্র হয়ে বহু মূল্যবান বস্তুর ওজন দিয়ে যাচ্ছে। এখন কথা হচ্ছে ওজনটাকে বহন করতে হবে, মূল্য পরে আসছে, তাই খাপ্ খাইয়ে চলতে হবে। যে সমস্ত মহান্ যে বিভূতি প্রকাশ ক'রে গেছেন, হঠাৎ শুনে তাঁদের উপর কিছু মতবাদ না ক'রে তোমার কুঁচরূপ মন যেটুক্ এখন আছে তা দিয়ে ওকে ওজনে করতে চেষ্টা কর। ওজনে যখন আনতে পারবে, তখন মূল্য কষতে বেশী সময় নিবে না—সেই জায়গায়ই আসছে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার। তোমাদের যে বিক্ষিপ্ত মন বলে বলছো বা চাঞ্চল্য বলে বলছো, না হয় আমি তাকে কুঁচরূপ বৃত্তিই দিলাম, হঠাৎ যা কিছু শুনবে যা আসবে একটু ওজনে এনে রেখো, তবে দেখবে তার প্রকৃত স্বরূপকে। এখন বস্তায় কি আছে, না জেনেই একটা মতবাদ করে বসলে এবং সেই বস্তা নিয়েই

চলে গেলে একটা কিছু বুঝে, গিয়ে দেখলে চাল না হয়ে ভুষির বস্তাই হয়ে গেল,—দাম তো ঠিকই দিয়ে এলে। তারপর যখন খুলে দেখলে ভুষি, তখন মনে হলো বস্তা ভরে যেন আপসোসই নিয়ে এলাম, তখন বাড়ীভর্ত্তি অনুতাপ ছাড়া আর কিছু নেই। তাই একটা জিনিষ দেখলেই তাকে খুঁজতে চেষ্টা করবে, তখনই বুঝবে তার প্রকৃত রূপটি—তার জন্য নিজেও তৈরী হতে হবে। তাতো তোমাদের আছেই, এলোমেলো যখন রয়েছে, এলোমেলো যখন করতে শিখেছ, তোমরা যখন বলছো মন এলোমেলো দিকে চলে যাচ্ছে, তখনই এ সবকে মিলিত ক'রে এক শক্তির বিকাশ করতে হবে। শক্তিতে এলোমেলোকে প্রকাশ করছে—এলোমেলোই তোমায় জানিয়ে দিচ্ছে, তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছে তার একাগ্রতার রূপটিকে।" তারপর তারা খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেল এবং খুশী হয়ে সব দীক্ষা নিয়ে গেল। ঠাকুর বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন, আমরাও সাথে সাথে চলে গেলাম।

আট

সেদিন ছোটখাট একটা উৎসব* চলছে, বৃষ্টিও খুব হচ্ছে। ঠাকুর নীচের ঘরে বসে আমাদের† উপদেশ দিচ্ছেন। এর মধ্যে কয়েকজন লোক একটি উন্মাদ লোককে‡ নিয়ে ঘরে ঢুকলো। তার আত্মীয়স্বজনেরা বললো যে, লোকটি কেবল দেখে কোন এক সাহেব কবর হতে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। আর সাহেবকে দেখে পাগলটি প্রায় সর্ব্বদাই এখানে সেখানে দৌড়াদৌড়ি করে ও লাফালাফি ক'রে একটা ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি করে। সুতরাং সেই উন্মাদ লোকটি তার বাড়ীতে এক উপদ্রব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহু চিকিৎসা তারা করেছে, কিন্তু কোন চিকিৎসাই কাজে লাগছে না এবং এ বাবত বহু টাকা ব্যয় ক'রে অবশেষে ঠাকুরের কথা শুনে নিয়ে এসেছে। সেদিনের উৎসবের ব্যস্ততার জন্য তাকে তার পরের দিন নিয়ে আসতে বলা হলো। তার আত্মীয়স্বজন যারা সাথে এসেছিলো, তাদের বলা হলো তারা যেন আসবার সময় এক পাঁজা কাঠ ও একটি নূতন কলসী সাথে ক'রে নিয়ে আসে এবং যাওয়ার সময় যেন রাস্তায় রাস্তায় ওকে বলে, 'কাল চিতা সাজিয়ে সাহেবকে পুড়িয়ে মারা হবে' ; আবার আসবার সময়ও যেন তাকে একই কথা

---

* স্বামীবাগ, ঢাকা।

† রবি ঘোষ, সুভাষ চক্রবর্ত্তী, যদু রায়, দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী(২), বারীন ঘোষ, অজিত ভট্টাচার্য্য, শান্তি দাস মজুমদার আরো অনেকে।

‡ অনুকূল পাল।

বলতে বলতে নিয়ে আসে এবং সে যেন শুনতে পায় যে ঠাকুরই সাহেবকে ভস্মীভূত করবেন।

তারা ঠিক সেইভাবে ঠাকুরের আদেশ মত রাস্তায় যেতে যেতে তাকে ওসব কথা শোনালো এবং পরদিনও ঐ ভাবেই বলতে বলতে কাঠকলসীসহ উন্মাদটিকে নিয়ে এলো। উন্মাদটি তখনও বলছে যে সাহেব তার পিছু-পিছু ডাকছে। তার আত্মীয়স্বজনেরা এসে ঠাকুরকে জানালো যে, ওসব কথা শুনে যাবার ও আসবার সময় উন্মাদটি মনে মনে বেশ আনন্দ পেয়েছে। যখনই সাহেবকে পুড়িয়ে মারার কথা বলা হয়েছে, তখনই পাগলটা একটু নেচে নেচে মাথা নাড়িয়েছে। আমরাও দেখলাম সে মাথা নাড়িয়ে এমন একটা ভাব প্রকাশ করছে, যেন 'এবার সাহেব যাবে কোথায়'। ঠাকুরও উন্মাদটির মাথা নাড়ার সাথে সায় দিয়ে ওকে বোঝালেন, 'সাহেব, এবার তুমি যাবে কোথায় ?' এরপর ঠাকুর তাঁর আসন হতে উঠে দাঁড়ালেন এবং আমাদের বললেন, "তোমরা ওদিকে যাও ও কাঠ দিয়ে চিতা সাজাও, নিকটে কলসীটি রাখ।" তার নিকটে একটা খালি শয্যাও রাখা হলো। ঠাকুর উন্মাদটির হাত ধরে বললেন, "ঐ যে তোর সাহেবকে দেখেছিস্ ? ঐ যে সাহেব বসেছে দেখেছিস্ ?" এভাবে ঠাকুর পাগলের সাথে ক্রমশঃ ক্রমশঃ মিশে গেলেন। তারপর ঠাকুর আমাদের মধ্যে দু'জনকে বললেন, "তোমরা ধরাধরি ক'রে সাহেবকে বিছানায় শোয়াও। ওকে বিছানায় শুইয়ে রোগ দিয়ে মেরে ফেলবো।" কিন্তু একি আশ্চর্য্য! আমরা যে দেখছি সবই শূন্য! এরপর ঠাকুর গেলেন সাহেবের মাথার কাছে এবং উন্মাদটি গেল পায়ের কাছে, ঠিকই যেন সাহেবকে শোয়ান হয়েছে। তারপর উন্মাদটিও বসলো, ঠাকুরও বসলেন। ঠাকুর বললেন, "দেখতো এবার যাবে কোথায়, সাহেবের চোখ উল্টে আসছে। আচ্ছা, আর একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি।" আবার কতক্ষণ পর ঠাকুর বললেন, "এখন তো

দেখা যাচ্ছে শক্ত হয়ে গেছে, ওকে ধরাধরি ক'রে নিয়ে শ্মশানে চাপিয়ে দে।" একজন ভক্তকে ঠাকুর পাঠালেন। সে বিছানার কাছে গিয়ে সাহেবকে ধরতে বালিসটাকেই ধরে নিয়ে এলো, অমনি পাগলটা তাকে ধমক্ দিয়ে উঠলো, "হেই, বালিশটাকে আনছো কেন? সাহেবের মাথা ধরে নিয়ে এস।" ভক্তটি শূন্য হ'তে কি ক'রে সাহেবের মাথা ধরে আনবে তাই ভাবতে লাগলো। তখন ঠাকুর নিজেই উঠে গিয়ে 'খালি' ধরে নিয়ে এলেন। আমরা তো সব শূন্যই দেখছি! শ্মশানে শূন্যই চাপানো হলো, শূন্যই জ্বলতে আরম্ভ করলো, শূন্যই দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগলো। ঠাকুর বললেন, "কেমন হে! এবার সাহেব যাবে কোথায়?—ছাই হয়ে যাচ্ছে যে।" কতক্ষণ পর পাগল বলে উঠলো, "যাঃ, ছাই হয়ে যাচ্ছে।" যখন একেবারে ভস্মীভূত হয়ে গেল, তখন ঠাকুর বললেন, "এক কাজ কর, এখন একটু ছাই নিয়ে জানলা দিয়ে ফেলে দাও।" পাগলটি সঙ্গে সঙ্গে একটু ছাই নিয়ে জানলা দিয়ে ফেলে দিলো। তারপর সমস্ত পরিষ্কার করে ফেলে উন্মাদটি নিজেই কলসীটাকে সেখানে বসিয়ে রাখলো। এরপর মরা ছোঁয়া হয়েছে বলে ঠাকুরও স্নান করলেন, উন্মাদটিও স্নান করলো। ঠাকুর যে ভাবে যা যা করলেন সেও ঠিক তা তা করলো। স্নান শেষ ক'রে ঠাকুর ওকে নিয়ে বসলেন। উন্মাদটি হঠাৎ যেন তুনিয়াকে একটু ভিন্নভাবে দেখতে আরম্ভ করলো, আস্তে আস্তে সে যেন সবই বুঝতে পারলো। তখন সে ঠাকুরের পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগলো এবং ঠাকুরকে বললো, "আমাকে আপনি বাঁচালেন। আমি আপনার কাছে চিরঋণী চিরকৃতজ্ঞ।" ঠাকুর বললেন, "তুমি ভাল হয়েছ এতেই আমার আনন্দ।" এরপর ঠাকুর ওর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। লোকটি ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে তার আত্মীয়স্বজনদের সাথে চলে গেল।

এর প্রায় দশ বারো দিন পর সেই লোকটি আবার ঠাকুরের

সঙ্গে দেখা করতে এলো। ঠাকুর তখন তাকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলেন, "ঐ যে অবস্থা তোমার ভেতর চলছিলো এবং তুমি যে সাহেব দেখছিলে—ঐ জাতীয় treatment না হলে তুমি ভাল হতে না। তাই তোমায় ঐ জাতীয় treatment ক'রেই উপশম ক'রে দেওয়া হয়েছে।" তখন সে ঠাকুরকে টাকা দেওয়ার চেষ্টা করলো। ঠাকুর বললেন, "তোমার তো আর টাকা বেশী হয়নি। বাড়ী গিয়ে ছেলেপিলেদের পড়াশুনার ব্যবস্থা কর, ওদের জন্য খরচ কর।" তারপর সে ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে খুশী হয়ে চলে গেল।

নয়

আমরা* কয়েকজন ঠাকুরের নিকট বসে† আছি। রাত্রি প্রায় বারোটা সাড়ে বারোটা হবে। এমন সময় এক ফকির ঠাকুরের নিকট এসে উপস্থিত হলেন। তিনি সিদ্ধিতে‡ সব সময় তন্ময় থাকেন। তিনি কল্‌কে সাজিয়ে ঠাকুরের কাছে এসে বলছেন, "বাচ্চা, তুই একটু প্রসাদ করে দে।" ঠাকুর আবার এসব হতে বঞ্চিত—মাদক দ্রব্য তো দূরের কথা, তিনি কোনরকম নেশারই বশীভূত নন, এমন কি পান পর্য্যন্ত উনি খান না। কিন্তু ফকিরের অনুরোধে ঠাকুর হেসে বললেন, "বেশ তো, রাখ।" তখন কতকটা জায়গা একটু মুছে কল্‌কেটাকে সাজিয়ে রাখা হলো। ঠাকুর হঠাৎ নিজের হাত মুঠ ক'রে খালি মুঠেই টান দিলেন। টান দেওয়ার সাথে সাথেই ঐ মেঝের উপর সাজানো কল্‌কের ভেতরে যে আগুন ছিল, তা হঠাৎ 'দপ্' ক'রে জ্বলে উঠে,—কল্‌কেটা ফেটে গেল। ফকির অবাক্ হয়ে দেখলেন এ কি হলো। ঠাকুর বললেন, "নেশার টান! এই নেশায় আর সহ্য করতে না পেরে কল্‌কেটা ফেটে যেতে বাধ্য হলো।" তখন আমরা অবাক্ হয়ে ব্যাপারটা দেখলাম এবং জিজ্ঞেস

---

* অমল দাস, মণীন্দ্র চক্রবর্ত্তী, হরিদাস পাল, রমেশ চক্রবর্ত্তী, অনুকূল পাল, নগেন্দ্র দে, বারীন ঘোষ, অজিত ভট্টাচার্য্য।

† কৃষ্ণনগর, ত্রিপুরা।

‡ গাঁজা।

করলাম, "এ কি হলো ?" তখন ঠাকুর বললেন, "একটা খালি পাত্র যদি মুখে টান দিয়ে রাখা যায়, তবে খালি পাত্রটিও মুখে লেগে থাকে। টানের মাত্রা যদি বেশী হয়ে যায়, কল্‌কে ফাটবে আর বেশী কি! মূলাধার হতে সহস্রার পর্য্যন্ত এই টানেই ফাটে। সুতরাং সিদ্ধি অবস্থাটাই হচ্ছে একটা তন্ময় অবস্থা, তাই নাম দিয়েছে 'সিদ্ধি'। তাই যে-কোন বিষয় বস্তুতে যদি সিদ্ধ হওয়া যায়, তবে সিদ্ধি হতে আর কতক্ষণ ? অতএব ঠিক একই অবস্থাতে একই শক্তিতে মনন করার সাথে সাথে যাহা চিন্তা করা যায়, সেই অবস্থাটিই সেই অনুযায়ী সফলতার দিকে এগিয়ে যায়—এ হলো শক্তির প্রয়োগ ও বিকাশ। যেহেতু আমি ভাবলাম এটা ফেটে যাওয়া দরকার, ঐ নেশাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, সেহেতু ওটা ফেটে যেতে বাধ্য হলো।"

দশ

ঠাকুর তখন সহরে* আছেন। আমরা† কয়েকজন তাঁর সঙ্গেই আছি। অনেকেই ঠাকুরের নাম শুনে এসে হাজির হয়েছে। বহু লোক দীক্ষা নিচ্ছে। এর মধ্যে একদিন বেলা প্রায় দশটা নাগাদ একজন রোগী‡ খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে উপস্থিত। লোকটির পায়ে সাংঘাতিক 'ঘা', তার পা বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা রস পড়ছে, পায়ের আঙ্গুলগুলো প্রায় খসে পড়ার উপক্রম—ভয়ানক দুর্গন্ধ। লোকটি ঠাকুরকে জানালো যে তার গলিত কুষ্ঠ। আমরা সবাই নির্ব্বাক্ হয়ে ঐ লোকটির দিকে চেয়ে রইলাম। লোকটি ক্রমশঃ এগিয়ে গিয়ে ঠাকুরের নিকট কান্নাকাটি করতে লাগলো। ঠাকুর তাকে নানারকম প্রশ্ন ক'রে সব কথা জানলেন এবং তাকে পরীক্ষা করার জন্য কতকগুলো কঠিন ব্যবস্থা দিলেন। লোকটি সব ব্যবস্থাকেই সহজভাবে মেনে নিতে রাজী হলো। এ ভাবে একটা-একটা করে ঠাকুর তার মনের বলের পরিচয় নিলেন। তারপর ঠাকুর তাকে কতকগুলো পথ্যের ব্যবস্থা দিলেন এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে থাকার জন্য কতকগুলো নিয়ম বলে দিলেন। তার-পর ঠাকুর এক গ্লাস জলে আঙ্গুল ডুবিয়ে গ্লাসটা ওর হাতে দিয়ে বললেন, "এটা খেলে তোমার রোগের উপশম অনিবার্য্য।" ক্রমশঃ ক্রমশঃ দশদিন খেয়ে একেবারে সাধারণ সুস্থ লোকের মত হেঁটে

---

* স্বামীবাগ, ঢাকা।

† দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী (১), ভুপেন রায়, পরেশ রায়, গুরুদাস বসাক, শান্তিদাস মজুমদার, বারীন ঘোষ, অজিত ভট্টাচার্য্য ইত্যাদি আরো অনেকে।

‡ ব্রজগোপাল বসাক।

এসে উপস্থিত হলো। ঠাকুরের জন্য অনেক ফুল নিয়ে এসেছে। ঠাকুর বললেন, "তুমি ভাল হয়েছে?" সে বললো, "হ্যাঁ, আপনার অশেষ কৃপায় ভাল হয়েছি।" ঠাকুর বললেন, "মনের বলেই সব-কিছু সম্ভব—মনের শক্তি যদি থাকে সব-কিছুই সম্ভব হয়। আমি যে চিন্তাশক্তিতে দিয়েছি, তুমি যে চিন্তাশক্তিতে গ্রহণ করেছ এবং প্রয়োগ করছো, সেই মনের বলেই ও একাগ্রতাতেই ক্রমশঃ ক্রমশঃ ঐ, সমস্ত জীবাণুগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছে। শক্তি উভয়েরই থাকা দরকার—যিনি করেন ও যিনি নেবেন। আবার যদি তা নাও থাকে, এখন যদি শিশু হতো, যিনি দেবেন তাঁর confidenceটা তার উপর যদি সম্পূর্ণ থাকে, it will be cured, —তা হলে উপশম হতে বাধ্য। কারণ সাধারণতঃ যত চীৎকার করেই থাক না কেন, একটা সন্দিগ্ধতা থেকে যায়। এই যে দেওয়া হলো, সফল হবে কিনা—ঐ সফলতার দিকে একটা সূক্ষ্ম confusion নিজের মধ্যে এমনিভাবে খেলতে থাকে যে ওটা কার্য্যকরীও ultimately সেই ভাবেই হয়ে থাকে।

তাই যে-কোন ব্যক্তির যদি নিজের উপর confidence থাকে, নিজের চিন্তায় যদি সম্পূর্ণ বিলীন থাকে, বাইরের কার্য্য ও ভেতরের সমস্ত ক্ষমতা রক্ষা করে যদি চলতে পারে, তবে বাস্তবের সব-কিছু করা তার পক্ষে সম্ভব এবং শক্তি যার উপরই প্রয়োগ করুক না কেন, তার সাড়া সে পাবেই এবং তার জন্যই যে সাধনা প্রথম করতে হবে। নিজের চিন্তাধারার উপরে নিজের বলের উপরে এমনিভাবে concentrate করতে হবে যে তার কার্য্যের উপর সে যেন সর্ব্বদা তৃপ্ত থাকে, সে তৃপ্ততা যদি সে maintain করতে পারে সর্ব্বতোভাবে, তবেই মনঃশক্তির পরিচয় সব সময় দিয়ে যেতে পারবে। বাইরের হাসি কিংবা গতিবিধিতে তৃপ্ততা নয়, তৃপ্ততা হচ্ছে নিজের মনে সূক্ষ্ম কোণে—যেমন একলা

মনে একা ঘরে যে-কোন অবস্থায় তুমি থাক না কেন, নিজের তৃপ্তিতে নিজেই রয়েছো, কোন সন্দিগ্ধ ক্ষেত্রে যায়নি ও রয়নি, তবেই হবে সাধনার প্রকৃত কার্য্য। সেই জন্যেই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে ; সত্য এবং জ্ঞান সমভাবে যে নিয়ে চলবে এবং সর্ব্বোতভাবে যদি সূক্ষ্মেও সেই পরিচয় দিয়ে যেতে পারে কি মনে কি বাইরে, তবে সফলতা অনিবার্য্য—will-force তখনই আসবে। আজ সন্দিগ্ধতার মাঝে অতৃপ্ততার মাঝে নিজের দ্বন্দ্বে নিজেই জ্বলছে, নিজের confusionএ নিজেই রয়েছে। যত আনন্দ যত স্ফূর্ত্তি, যাই হোক না কেন, এ যেন বাইরের একটা আলগা উচ্ছ্বাস ; কিন্তু বস্তুতঃ সত্য যেন বহু দূরে রয়েছে, জ্ঞান যেন বহু দূরে রয়েছে। জিনিষকে খুঁজতে হবে, তেল সরবরাহ করবার জন্য যেমন 'হেজাগ্' লাইটের ছিদ্রকে pin করতে হয় এবং সেই তেলে বাতি যেমন খুব উজ্জ্বলভাবে আলোকিত হয়ে উঠে, সেই ভাবে মনের সূক্ষ্ম কোণে যে অতৃপ্ততারূপ অজ্ঞানতা রয়েছে, জ্ঞানরূপ সূক্ষ্ম pin দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে দিতে হবে, তবেই তেল আপনমনে বিরাজ করবে—জ্ঞানালোকে আলোকিত তখনই হবে। সূক্ষ্ম চিন্তাতে যেতে হবে—এই ভাবে শক্তি যখন সঞ্চিত হবে, বিকাশ হবে, তখন তোমার প্রভাব যে-কোন কিছুর উপর চালাতে পারবে, তখন তোমার আনন্দে তোমার সত্যের উন্মাদনায় তুমি নিজেই বিভোর হয়ে থাকবে ; হরিণ যেমন নিজের কস্তুরীর গন্ধে নিজেই উন্মাদ হয়ে ছুটতে থাকে, নিজের সুবাসিত গন্ধে নিজেই সেই গন্ধে আপনমনে ছুটতে থাকে, —কোথায় ?......কোথায় ? কি যেন একটা ব্যতিব্যস্ততার মধ্যে চলতে থাকে ঠিক তোমার সেই চিদানন্দ, তোমার সেই মহানন্দ—তোমার সেই জ্ঞানে ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত যে ধারা চলবে, তাহার সেই ধারা এমনি ধারা, যে ধারা তোমাকে এমনি করে ধাবমান করে নেবে, তুমি তার উন্মাদনায় নিজেই যেন ব্যতিব্যস্ত থাকবে।

সেই ব্যতিব্যস্ততায় বিরাট শান্তি আছে, বিরাট শক্তি আছে, কারণ সত্যান্বেষী হয়ে সত্যের সন্ধানে সন্ধানে এগিয়ে যেতে থাকবে, তখন তুমি সত্যময় হয়ে জ্ঞানময় হয়ে আলোকিত থাকবে ও করবে, তখন প্রভাব আপনা-আপনি হবে। তাই মহান্‌রা যাঁরা মন সংযম ক'রে সমস্ত শক্তিকে এই ভাবে সঞ্চয় ক'রে এই ভাবেই পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন, সেই শক্তি তোমাদের ভেতরও রয়েছে। তাই তোমরা নিজেকে নিজে খোঁজ, নিজের তৃপ্তিতে নিজে প্রতিষ্ঠিত হও, সত্যে প্রতিষ্ঠিত হও, তোমরা নিজেকে জানতে চেষ্টা কর, সেই সাধনার জন্যই বিশ্বরূপ। এই রূপকে বিভিন্নতার মধ্যে মানুষ ধ্যান ক'রে ধারণা ক'রে নিজেকেই বিকশিত করতে চেষ্টা করছে। তোমরা নিজেকে নিজে পূজা কর, তারই মূলমন্ত্র জপ কর। সেই মূলমন্ত্র জপ হচ্ছে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত শক্তি—একটি শব্দে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আবার সর্ব্ব শব্দই যে মূলমন্ত্র। সেই শক্তিকে পুনঃ পুনঃ জপ করলে তোমার সমস্ত মনের বৃত্তিগুলো সেই অর্থবোধে গিয়ে গিয়ে এগিয়ে যেতে থাকবে। তোমার সমস্ত অণুপরমাণু এমনি একটা অবস্থায় পৌঁছবে—মূল তুমিই, মূল যে তুমিই,—তুমিই তোমাকে পরিস্ফুটিত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছো। মুল যে তুমিই—তোমাতে আর মূলেতে এক অন্তরে রয়েছে, এক মূলেতে রয়েছে। তাকে চিন্তা করতে তোমাকেই যে প্রকারান্তরে জানছো। ঠিক দর্পণে যেমন নিজেকে তৈরী করছো, সে ভাবে তোমাকেই তুমি দেখছো। দর্পণ শুধু তোমাকে দেখিয়ে দেওয়ার কার্য্য করছে। তুমিই দর্পণে রয়েছো, তুমিই তোমাকে rectify করছো। মূলমন্ত্র দর্পণ স্বরূপ, তুমিই তার ভেতর উদ্ভাসিত করছো, তোমাকেই তার ভেতর দেখছো, তুমিই তৈরী হচ্ছো, তোমার জপ তুমি করছো। কি দর্পণ, কি মূর্ত্তি, কি আরাধ্য, কি বিশ্বরূপ—সবই যে তোমার রূপ।" কথা এখানেই শেষ করে ঠাকুর ভেতরে চলে গেলেন।

এগারো

ঠাকুর বসে* আছেন। এক-এক করে আমরা† প্রায় সবাই এসে হাজির হলাম। দু'চার জন বাইরের লোকও এসেছে। আলাপ চলছে। ঠাকুর ছোট ছোট নানাপ্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। এর মধ্যে একজন তার কতগুলো ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলো। ঠাকুর তারও উত্তর দিলেন। তারপর আমরা পূর্ব্ব দিনের অসমাপ্ত আলাপ আরম্ভ করলাম। আমাদের মধ্যে একজন ঠাকুরকে পূর্ব্বের প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা ঠাকুর, আমরা কোন পথ অবলম্বন করলে মনকে সব সময় বিরাটের দিকে রাখতে পারি?" ঠাকুর বলতে লাগলেন, "জীবজগতের প্রত্যেকেই যে বিরাটে রয়েছে এবং বিরাট হয়ে আছে ;—সে জিনিষটুকুই বুঝতে হবে এবং উপলব্ধি করতে হবে।

প্রথম অবস্থায় তাই যদি বুঝে নেওয়া যায়, তবে চিন্তাশক্তি সেখানেই গিয়ে দাঁড়াবে। তুমি তোমার অবস্থা প্রতি মুহূর্ত্তে যদি চিন্তা কর, সেই চিন্তাই যদি সর্ব্ব অবস্থায় maintain করতে পার, তবেই শক্তির বিকাশ হবে ; সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চিন্তা হতে ক্রমশঃ ক্রমশঃ

---

* স্বামীবাগ, ঢাকা।

† বিরাজ দত্ত, ধীরেন সাহা, দক্ষিণা মোহন ঠাকুর, উপেন সাহা, সুধীর লাল চক্রবর্ত্তী, সত্যেন রায়, বসন্ত দাস, জলধর ব্যানার্জ্জি, দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী, সুভাষ চক্রবর্ত্তী, ভুপেন রায়, নীহার দাশ, অনিল ভট্টাচার্য্য, রাণী রায়, দুর্গাময়ী দাশ, গোপাল ঘোষ, মনোরঞ্জন সাহা, অমৃত লাল ব্যানার্জ্জি, রবীন ঘোষ, অজিত ভট্টাচার্য্য, শান্তি দাস মজুমদার আরো অনেকে।

সূক্ষ্ম এবং সব সময় সূক্ষ্মতার মধ্যেই যে রয়েছি সূক্ষ্ম হ'য়ে। সেই অবস্থায় মনকেও যদি সেই সেই অবস্থাতে চিন্তাযুক্ত রেখে দেওয়া যেতে পারে, তবে সমস্ত অবস্থাগুলো সেই সূক্ষ্মতার মধ্যে গিয়ে পৌঁছবে। মনের শক্তিও তখন প্রত্যেকটি যুক্ততার মধ্যে গিয়ে জেনে নিতে পারবে। এই ভাবে জানতে জানতে জানার পথে চলে যেতে পারবে। তোমার জানাও শেষ হচ্ছে না, বস্তুতঃ তত্ত্বও জেনে শেষ করতে পারছো না। মনের সঞ্চালন, মনের movements সব সময় যদি চিন্তা ক'রে সর্ব্ব অবস্থায় রাখা যায়, শক্তির বিকাশ তখনই হবে এবং মনের একগ্রতা, সূক্ষ্ম শক্তি, সব-কিছুই পাওয়া যাবে, যদি ঐ অবস্থাকে maintain করে নেওয়া যেতে পারে। সৃষ্টির সাথে সাথে মনকেও যদি এ ভাবে ব্যস্ততায় রেখে দেওয়া যায়, চিন্তাযুক্ত রেখে দেওয়া যায়, কোন সূক্ষ্ম হতে উদ্ভব, সেই উদ্ভবের সাথে সাথে আমার মনও চলছে, আমার বুঝও চলছে সাথে সাথে, তখন মনের speedও সেই অনুযায়ী বেড়ে যাবে এবং একটা constructive formএ সব কিছুকে আয়ত্ত করে রাখা যাবে, জ্ঞান ও বুঝ সেই জায়গায় নিয়ে constructionএর ভেতর থেকে যাবে, যেই অবস্থায় আমরা রয়েছি। সেই অবস্থাকেই ভাল করে analysis করে প্রত্যেকটি তার তত্ত্বকে বের করতে হবে—সাধনা সেখানেই গিয়ে দাঁড়াবে। সেই তত্ত্ববস্তুগুলো কি? তোমার অবস্থা তুমি নিজে নিয়ে সম্পূর্ণরূপে study কর, তুমি যেরূপ এখন আছো, কত রূপের মধ্য দিয়ে তুমি এখানে এসেছো, কতগুলো রূপের মধ্যে তুমি আছো। তোমার রূপটি কোথায়?—তার সত্ত্বা ও তত্ত্বকে আগে বুঝে নেও এবং খুঁজতে খুঁজতে তুমি কোথায় চলে যাও, তখন দেখবে তুমি এমন এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছবে, যে এগিয়েই চলছো, যে দিক্ থেকে এসেছো, তারও শেষ পাওয়া যাচ্ছে না। অসীমের বস্তু হতে তুমি উদ্ভব, অসীমেই যে লয় এবং অসীমে যে আছো, তাহা তুমি প্রতি মুহূর্ত্তে বুঝতে চেষ্টা

কর এবং তুমি যে নিজে রয়েছো, তাও উপলব্ধি কর। যে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার তোমাতের রয়েছে, তাতেই সম্ভব এ সমস্ত জানা। তুমি যখন একদিন সূক্ষ্মে ছিলে, সেই সূক্ষ্ম হতে যখন আরো সূক্ষ্মে ছিলে, আজ যে রূপটিতে তুমি আছো, কোন এক জাতীয়ের কাছে তুমি সে জাতীয় সূক্ষ্ম এখনও রয়েছো—এই ভাবে তুমি সব সময় সূক্ষ্মতা maintain করছো আর একটি রূপের কাছে। এই অবস্থায় যে রূপটি তোমার রয়েছে, পিছনের দিকে যদি পিছিয়ে যেতে থাক, যে পর্য্যন্ত তুমি নিয়ে বুঝতে পারছো বা তুমি যে ছিলে একদিন আর একটি রূপে—যেমন তুমি নিজেকে বুঝতে পারছো, যেমন শিশু অবস্থায় তুমি যে শিশু ছিলে, আর একটি শিশু দেখে তুমি তা বুঝতে পারছো; শিশু এবং তোমাতে কি পার্থক্যতা, সব-কিছু ইন্দ্রিয় বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সমস্ত কিছু বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তুমি এখন যে 'বুঝ' বুঝতে পারছো, শিশু তখন তাহা ধরতে পারছিলো না, কিন্তু ধরার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিলে। তুমি যে অবস্থায় পড়ে এখন যা-কিছু বুঝতে পারছো, ক্রমশঃ এগিয়ে এগিয়ে আজ এই অবস্থায় পৌঁছছো, বৃত্তিগুলো যে-ভাবে এসে ধরছে, ইন্দ্রিয়াদিও সেইভাবে গড়ে উঠছে। যখন তুমি গর্ভে ছিলে, তখন ছিলে আর এক অবস্থায়—যখন তুমি কীটে ছিলে, তখন ছিলে এক অবস্থায়—যখন তুমি রক্তে ছিলে, তখন ছিলে এক অবস্থায়—তারপর এই ভাবে আয়ত্তে আয়ত্তে বহুতে ছিলে। প্রত্যেকটি অবস্থায় এক-একটি রূপ নিয়েই ছিলে এবং স্তরে স্তরে এক-এক ভাবে এসে এসে এক-এক রকম রূপ দিচ্ছ, আজ সেই রূপটি যে তুমি, প্রকারান্তরে তুমি হয় কীট অবস্থায় আছ, গর্ভস্থ অবস্থায় আছ, রক্তকণিকার অবস্থায় আছ, আরও বহুতে যে রয়েছ, সম্মুখীন বহু যারা রয়েছে তাদের নিকট ঠিক এই ভাবে ভাবে তোমরা রূপের পরিবর্ত্তন হয়ে যাচ্ছে এবং এগিয়ে যাওয়ার অবস্থাতে সেই অবস্থাকে তুমি বুঝে বুঝে এগিয়ে চলছো, যেমন তুমি এখন এ

অবস্থা বুঝতে পারছো আগের অবস্থা হ'তে। যতদূর এগিয়ে চলুক তাতে তোমার কিছু আসে যায় না। তুমি শুধু এই বুঝটুকুনু রাখ যে, আমি সূক্ষ্মতার মাঝে সূক্ষ্ম হয়ে হয়ে সূক্ষ্ম কার্য্যের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছি সূক্ষ্মকে বুঝে বুঝে—অণুশক্তি সেখানেই গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, এই vanishএর মাঝে vanish হয়ে রূপ দিচ্ছে, আবার বিলীনের মাঝে বিলীন হয়ে বিলীনতারও একটি পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে—বিশ্বরহস্যের রহস্য সেখানেই, এটাকেই বলে mysterious universe। 'আমি' যখন আমায় খুঁজি, 'আমি'তে 'আমিই' হারিয়ে পড়ি,—তুমি কোথায়? খুঁজে দেখবে no where, আবার দেখবে সর্ব্বত্র, এখনও যে তুমি কি যে অবস্থায় রয়েছ, আবার সত্ত্বার পরিচয় দিচ্ছে যে, আমি আছি, যখন 'আমি'কে আমিত্ব বলে বলছো সমস্ত.........* 'আমি' সাড়া দিচ্ছে তোমার আমিত্বে, তুমি যে 'আমি' বলে বলছো, 'আমি' খুঁজে দেখবে সর্ব্বত্র। সে বুঝটুকুনু বুঝতে চেষ্টা কর এবং তখনই দেখবে, তোমার অস্তিত্ব কোথায়......... সর্ব্বত্র.........। তুমি যে সর্ব্বত্র অবস্থা হতে সৃষ্টি, সর্ব্বত্রই যে তোমার একত্ব হয়ে এসেছে, একত্ব হয়ে তোমার রূপ দিচ্ছে—প্রত্যেকটি বিভিন্নতাও একত্বেরই একটি রূপ; তোমার যে একটি রূপ, সে যে তুমিই প্রকাশ করছো তোমার ভেতর দিয়ে। তুমি যখন আরো এগিয়ে চলছো, আরও বুঝকে যখন আরও বুঝে নিচ্ছ, তখন দেখবে একই বুঝে তুমি বুঝে রয়েছে। এগিয়েও যাও নাই, পিছিয়েও যাও নাই, ভাষায় শুধু বলা মাত্র 'এগিয়ে যাচ্ছি', 'পিছিয়ে যাচ্ছি'। শক্তি তোমার ঠিকই রয়েছে—শুধু পরিবর্ত্তিত অবস্থায় সেই শক্তিকে বিকাশ করে যাচ্ছো—এর মধ্যে মধ্যে করা হচ্ছে আমাদের কারুকার্য্য, তাই নিজেকে নিজে যতটুকু study ক'রে যতদূর এগিয়ে যেতে পারা যায় এগিয়ে যেতে থাকে; কোন অবস্থা হ'তে এসেছে কোন কোন অবস্থাতে,—

* বাদ পড়েছে।

সেগুলোকে তুমি সম্পূর্ণরূপে ধাতস্থেতে আন, তখন দেখবে তুমি নিজেকে নিজে খুঁজে বেড়াচ্ছ; এমন এক জায়গায় যাচ্ছ যেখানে খুঁজেই বেড়াচ্ছ—সম্মুখীন এই অবস্থায়ই ছুটতে হবে। তাই আমাদের সাধনাই হচ্ছে অণিমা। এই অণুশক্তির মধ্যে অণু হয়ে যে পরিচয় দিচ্ছি, ঐ শক্তিকেই মনের ভেতরে রেখে রেখে চিন্তার ভেতরে গিয়ে সাধনাতে প্রয়োগ করতে হবে—এই সাধনাই আমাদের একমাত্র সাধনা। খড়্গ যতই ধার দেওয়া হবে ততই ধার হবে, তখন যে কোন বস্তুকেই কর্ত্তন করা যাবে। সেইরূপ সাধনাতে মনকে যতই ব্যস্ত রাখবে মন ততই sharp হবে, তখন যে-কোন বস্তুই কর্ত্তন করা যাবে অর্থাৎ তাকে বুঝতে ও জানতে পারবে।”

বারো

একদিন আমরা* কয়েকজন নদীর† পাড়ে বসে আছি। হঠাৎ দেখি তিনি নদীর উপর দিয়ে হেঁটে আসছেন। আমাদের কাছে এসে হেসে বললেন, "তাকিয়ে তাকিয়ে তোরা কি দেখছিস্?" আমরা বললাম, "দেখছি তোমাকে।" ঠাকুর বললেন, "ভাবছিস্ বুঝি, কি ক'রে সম্ভব? তবে শোন।" এ কথা বলে তিনি আমাদের নিকটেই বসে পড়লেন এবং বলতে লাগলেন, "একটা লোক jump দিয়ে দু'হাত উঠতে পারে, চেষ্টা করলে আট হাতও উঠা যায়, আবার এর ভেতর চেষ্টা করলে ডিগবাজিও খেয়ে নেওয়া যায়। তাতে কি বোঝা যায়? মনের একাগ্রতা কর্ম্মমিশ্রিত দেহের সঞ্চালন এবং সেই অনুযায়ী সমস্ত দেহের partগুলো তার movement মত কার্য্যকরী ক'রে নেওয়ার দিকের অবস্থার মতন হয়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থার মতন করে নেওয়ার যে সাধনা, তার প্রচেষ্টাই হচ্ছে জীবগণের জনগণের। এই যে শূন্যে অতটুকু উঠা এবং তার

---

* প্রকাশ বল (মাষ্টার), দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী (৩), বিজয় সোম, নগেন্দ্র দে, অনুকূল পাল, হরিচরণ দে, হীরালাল চক্রবর্ত্তী, নিরঞ্জন সাহা, নবদ্বীপ নমঃ, হীরালাল সাহা, মহেন্দ্র শ্যাম, মহিম ভূইমালী, গৌরাঙ্গ দাস, নিকুঞ্জ ভূইমালী, রমেশ সাহা, অমূল্য দে, ধীরেন সাহা, শশী মাঝি, অজিত নমঃ, হাজি মিঞা, বিপুল চক্রবর্ত্তী, জিন্নত আলী, সুরেন্দ্র দে, বারীন ঘোষ, অজিত ভট্টাচার্য্য আরো অনেকে।

† তিতাস নদী, কৃষ্ণনগর, ত্রিপুরা।

ভেতর যতটুকু কার্য্যকরী হলো, তার ভেতর কি কি শক্তি ব্যয় হলো, সমস্ত দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেহের partগুলো, বায়ু করেই হউক, বায়ু সঞ্চালন করেই হউক, মনের সঞ্চালনেই হউক, চার পাঁচ সেকেণ্ডেই হউক, তার সে সময়টুকুর জন্য ক'রে নেওয়া হলো। এক সেকেণ্ড যদি কেউ শূন্যে থাকতে পারে, এক ঘণ্টা থাকতে পারার ক্ষমতা তার মধ্যে থাকে, বিশ ঘণ্টা থাকার ক্ষমতাও তার ভেতর থেকে যায়—এর আগেই বলা বিরাট শক্তির পূর্ব্বাভাস প্রথম স্তরেই পরিচয়; constant যে থাকতে পারে, এক সেকেণ্ডে পাঁচ সেকেণ্ডের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। একে স্বভাবজাত শক্তি বলবে? আমিও ঠিক তাই বলি, স্বভাবজাত inborn quality। কথাটুকু মনে রেখো, সময়ের ধাপে ধাপে সাময়িক স্বীকার ক'রে পরবর্ত্তী শক্তিকে অস্বীকার ক'রে পিছিয়ে যাবে না। বৃত্তির পরিচয় যত ভাবেই তুমি দিয়ে যাও না কেন, সাময়িকভাবে সাময়িক নৃত্য করা ছাড়া কিছু নয়। বস্তুতঃ সত্য তোমায় ছাড়বে না— সব সময়ই যে স্থিত। তাই compassএর মত যত দিকেই তুমি ঘোর না কেন, বিন্দুকে ছেড়ে তুমি কোন দিকে যেতে পারবে না, বিন্দুও আবার তোমায় ছাড়বে না। তাই সীমাও অসীম ছাড়া নয়, অসীমই আবার সীমাতে রয়েছে; সুতরাং সীমা অসীম—দুই এক। পৃথিবী ঘুরতে যেই সময় লাগবে, তোমার বিন্দুটিও ঘুরতে সেই সময় লাগবে একই সূত্রে গাঁথা আছে বলে। তাই বিরাট শক্তি সীমার মাঝে খেলেও অসীমেরই পরিচয় দিচ্ছে, আবার অসীমেই লীন হয়ে যাচ্ছে—এ যে আভাসেরই পূর্ব্বাভাস। এক সেকেণ্ডের ধাপে তুমি মাটিতে পড়লে, পাঁচ সেকেণ্ড থেকে যদি মাটিতে পড়তে পার, দশ সেকেণ্ড থেকে যদি মাটিতে পড়তে পার, তাতে তোমায় কি বুঝিয়ে দিচ্ছে? পড়ে যাওয়ার অবস্থাটা যে গতিতে টেনে আনছে, যে আকর্ষণে টেনে আনছে, সেই আকর্ষণের শক্তিকে surpass ক'রে নেওয়া যায়, এক সেকেণ্ডে surpass করে নেওয়া

যায়। কিন্তু তুমি বহু ভাবে মনকে ব্যস্ত রেখেছ বলে percentage of mind যে অনুযায়ী concentrationএ থাকবে, সেই অনুযায়ী সেই সেই qualityগুলো বের হবে—কি সেকেণ্ডে, কি মিনিটে, কি ঘণ্টায়। তুমি percentage of mind বেশী ব্যয় কর, সেকেণ্ড তখন ঘণ্টা হবে, ঘণ্টা দিন হবে, দিন সপ্তাহ হবে, সপ্তাহ মাস হবে—percentage ক্রমশই বাড়ছে। তোমরাই তো বল—যদি majority-vote দেওয়া যায়, তবে সাধারণ লোকও রাজা হতে পারে, majorty-vote যাকে দেওয়া যায় সে রাজা হতে পারে ; কিন্তু রাজা হওয়ার শক্তি সবারই মধ্যে বিদ্যমান। জনসাধারণ-majorty ইচ্ছে করলে 'যাকে তাকে' রাজা বানাতে পারে। মনের কার্য্যগতিবিধি জনসাধারণের মত বহু অবস্থায় এমনিভাবে ব্যাপ্তমান রয়েছে, জনসাধারণের প্রত্যেকটি যেন ভিখারীর মত হাত পেতে রয়েছে,—বহু হাতের সম্মিলিত শক্তি এক হাতে অর্পণ করলেই হয় রাজা, নতুবা থাকে প্রজা। রাজা প্রজা ভেদাভেদ শুধু বহু হস্তের সম্মিলিত মাত্রা বিশেষ ; তুমিও ঠিক তাই, আমার মনেও এমনিভাবে এসেছে। সমস্ত সঞ্চিত শক্তি একত্রিত হয়েই যখন রাজশক্তি, আবার প্রতিটিতে যেমন রাজশক্তি বিদ্যমান, এই স্থিত শক্তি আবার একত্রিত হয়ে সেই শক্তিকে প্রকাশ করছে। তুমিও কিন্তু রাজা ছাড়া নও। সব-কিছুই যে স্বভাবজাত স্বভাবসিদ্ধ ভুলে যেও না। সুতরাং আমার জলে হেঁটে আসার গতিটুকু তার বাইরে নয়, তোমার সাড়ে-তিন হাত লম্বা দেহটি জলে ভেসে আসতে পারে নানা balance নানা অবস্থা বজায় রেখে ; ঠিক মধ্যবিত্ত হয়ে তালুকদার হয়নি, জমিদারও হয়নি, তারপর তো—বহু দূরে। আমার 'পা' এক বিঘত দু'আঙ্গুল, সাড়ে-তিন হাতের concentrated forceকে তার মধ্যে ব্যয় করেছি কিনা, তাই সমস্ত শক্তি সেই ভাবেই খেলা করছে। কি শূন্যে,

কি জলে, কি স্থলে, সর্ব্ব অবস্থায়, সর্ব্ব জায়গায় আমি majority-force নিয়ে নিয়েই যে চলে যাই—শুধু তাই নয়, আরো অনেক আছে।"

*　　*　　*

একদিন আমরা* কয়েকজন একটা বিরাট 'হল' ঘরে ঠাকুরের নিকট বসে আছি। ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ, আলো জ্বলছে। ঠাকুর বললেন, "আমি একটু বহু দূরে যাবো, তোরা একটু বসে থাক।" কিছুক্ষণ পরে দেখলাম তিনি আসনে নেই, ঘরেও নেই। আস্তে আস্তে বরফ থেকে যেমন জল হয়ে যায়, জলে তাপ দিলে যেমন বাষ্প হয়ে মিশে মিশে যায় এবং তা যেমন বুঝতে পারা যায়, ঠিক তেমনি ক'রে তিনি মিশে যাচ্ছেন দেখছি। একি স্বপ্ন! না প্রত্যক্ষ! নিজেকে নিজে টিপে দেখছি আমি ঘুমন্ত, না জাগ্রত। দেখলাম ঠিকই জেগে আছি। তারপর কি করবো ভাবছি। অনেক ভেবে চিন্তে পুরানো ভক্তদের জিজ্ঞেস করলাম, "কি করবো?" তারা বলল, "চল, নদীর† পাড়ে গিয়ে দেখি।" কিছু ঘরে বসলো, কিছু নদীর পাড়ে গেলাম। জ্যোৎস্না ফুট্‌ফুট্ করছে। নদীর ওপাড় থেকে ঠাকুর চীৎকার ক'রে বলছেন, "আমায় নিয়ে যাও।" নদীর এপাড় থেকে আমরা বললাম, "কি করে আনবো? তুমি যে-ভাবে গেছ, সে-ভাবে এসো।" তখন তিনি ঠিক বেলুনের মত হয়ে আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। আমরা সবাই অবাক্ হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি আমাদের বললেন, "চল,

---

* অহীন্দ্র ঘোষ, সুরেন্দ্র দে, রমেশ চক্রবর্ত্তী, জগদীশ নমঃ, বিনয় সোম, ভরত ধোপী, আশু সেন, সুরেন্দ্র নমঃ, ভুপেন রায়, মহম্মদ্ আলী, নিবারণ দত্ত, শ্যাম বিনোদ সেতারী, বারীন্দ্র ঘোষ, অজিত ভট্টাচার্য্য আরো অনেকে।

† তিতাস নদী, কৃষ্ণনগর, ত্রিপুরা।

ঘরে যাই।" তারপর তিনি হাঁটতে হাঁটতে ঘরে গেলেন, আমরাও সাথে সাথে গেলাম এবং একে একে সবাই প্রণাম ক'রে বসলাম। আমাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা ঠাকুর, এই যা দেখলাম, এ কি করে সম্ভব হলো?" তিনি বললেন, "এই যে vanishing অবস্থাটা,—এটা কি ক'রে সম্ভব? তোমার মনের সঞ্চালন-ক্রিয়া তোমার উপর যেমন কার্য্যকরী হয়, কি সুস্থ, কি অসুস্থ, শান্তি, অশান্তি, বুঝ, অবুঝ, যে-কোন দিক্ দিয়েই হউক না কেন—সমস্ত কিছুর পারদর্শিতা এ যে মনেরই। এই অবস্থাতে সমস্ত কার্য্যকলাপ হয়ে যাচ্ছে। এ মনই যখন বহু ভাবে ব্যাপ্তমান হয়ে ছড়ছে—এখন বিক্ষিপ্ততার দিক্ দিয়েই হউক, আর একাগ্রতার দিক্ দিয়েই হউক, এক দিক্ না এক দিক্ দিয়ে যাচ্ছে। ঘুমন্ত অবস্থায় চক্ষু উন্মীলিত অবস্থায় রয়েছে, সে কিন্তু দেখে না রে। আবার একটু নাড়া দিলে উন্মীলিত কিন্তু মুদ্রিত হলো না। সেই উন্মীলিত অবস্থায়ই হেসে কথা বললো,—কি করে তা সম্ভব? চক্ষু কিন্তু নিজে দেখে না রে, দেহ নিজে নড়ে না রে,—সব-কিছু চলছে মনের সঞ্চালনে, আবার এই মন চলছে ইন্দ্রিয়াদির সঞ্চালনে। এই দ্বন্দ্বে প্রতিদ্বন্দ্বে, ঘাতে প্রতিঘাতে, ঘর্ষণে ঘর্ষণে যে সঞ্চালন হয়, তাহাই জীবনী শক্তির পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে প্রতি অণুতে প্রতি ইন্দ্রিয়তে—সবই যে মন; তার নামই যে দিয়েছে 'মন'। এই যে চক্ষুকে দর্শনশক্তি, কর্ণকে শ্রবণশক্তি, নাসিকাকে ঘ্রাণশক্তি, জিহ্বাকে স্বাদশক্তি—এই সব শক্তি মনঃশক্তি হতেই যে বিকাশ। এই সূক্ষ্মতার ভেতর দিয়ে যদি মনের শক্তির প্রকাশ হতে পারে এবং সেই জাতীয় অণুপরমাণু যদি বিকশিত হতে পারে,—দেহ আর কি রে ছাই? সেই শক্তিতে যেতে মন দেহকে সেই অনুযায়ী করে নেয়। এটাই হচ্ছে real function of mind। সর্ব্বস্তরে সর্ব্বজায়গায়ই যে মনের গতি রে—ভুলে যাচ্ছিস্ কেন? তোমার সৃষ্টি মন হতেই

যে; বৃত্তি নিবৃত্তি—তুমিই তো তাহা যে; মন হতেই যে উদ্ভব, মনেরই যে ক্রিয়া, তবে তাকে যদি 'মন' বলি, ভুল হবে রে? সেই মনই যে তুই। তুই ভুলে যাচ্ছিস্ অস্থিচর্ম্ম একটা solid পদার্থ দেখে বুঝি কি করে তা সম্ভবে? সেই রক্তকণিকা হতে চিন্তা করে দেখ্ দেখি কি করে তুই solidএ পরিণত হলি। মনের সঞ্চালনে, আবহাওয়ার অবস্থাতে, যে-কোন সাহায্যেই হউক না কেন, এর আগেই তো বলেছি, বহুত্বে একত্ব ও একত্বে যে বহুত্ব, তাহা যে স্বভাবসিদ্ধ, সহজজাত—তুই যে তার মত একজন রে। সুতরাং 'vanishing' আর কি রে? আলো বলো, তাপ বলো, কিরণ বলো, যাই বলো না কেন, এ মনের গতি অনন্ত গতি—সেই গতি যে তুই নিজে স্বয়ং। তুই নিজেই যে মন, বহু ভাবে ব্যাপ্ত-মান রয়েছিস্ বলে majorityর দিকে একটা sideএ কম খেলা করছিস্, তাই তো তুই দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খাচ্ছিস্। আমার বেলায় কিন্তু তা হয়নি। দেয়ালে যে অনন্ত সূক্ষ্ম ছিদ্র রয়েছে, তাই সব দেয়ালে আমার অবাধ গতি। এই মনরূপ যে দেহ, majority যে দেওয়া আছে কিনা, তুই majority ভুলে যাস্‌নে, majority যে সব সময়ই দেওয়া—সে যে বহুত্বের একটি অবস্থা মাত্র। আর তুই কি কর্‌লি? চিন্তা ক'রে দেওয়ালের ভেতর একটা দরজা তৈরী কর্‌লি, তাতে majorityর একটা পরিচয় দিচ্ছিস্, আসা-যাওয়ার একটা পথ করছিস্,—এও যে শক্তি ছাড়া নয় রে। এরকম লক্ষ ভিখারীর লক্ষ চাহিদা, 'বাবা, একটি পয়সা দেও না'। একত্র করে লক্ষ পয়সা হয়, জানিস্ তো? এই লক্ষ পয়সা দিয়ে যে কোন লক্ষ্যকে লক্ষ্যভেদ করতে পারবি। Vanishingএর বেলায়ও তাই, সমস্ত শক্তির বিকাশের বেলায়ও তাই, যা-কিছু করুক না তাই।"

আমরা সবাই অবাক্ হয়ে শোনলাম। প্রাণে বেশ উৎসাহ পেলাম, 'তবে বুঝি আমাদেরও হবে।'

তেরো

ঠাকুর গ্রাম থেকে দু'দিন হয় সহরে* এসেছেন। লোকের ভিড় ক্রমশই বাড়ছে। এর মধ্যে একদিন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ঠাকুরের সঙ্গে অনেক আলাপ-আলোচনা করলেন। পণ্ডিত ব্যক্তি সারাজীবন পড়াশুনা করেছেন এবং জীবনের সমস্ত রোজগার এই গ্রন্থাদির জন্যই ব্যয় করেছেন। বরাবরই আধ্যাত্মিক দিকে তার ঝোঁক। এই কারণে তিনি বিবাহ পর্য্যন্ত করেননি এবং যেখানেই গিয়েছেন কোন জায়গা হতেই একটা ভাল ধারণা নিয়ে আসতে পারেন নি। এত পড়াশুনা করেছেন যে কোথাও গিয়ে নিজের ব্যক্তিগত ধারণাকে কারোর সাথে মিল খাওয়াতে পারেননি। নিজের জীবনকে তিনি নিজভাবেই চালনা করে গিয়েছেন। একবেলা নিরামিষ আহার করেন আর একবেলা ফলমূল খেয়ে থাকেন। যেখানেই সাধু বা মহাপুরুষের নাম শোনেন, সেখানে গিয়ে আলাপ-আলোচনা করে আসেন। ঠাকুরের সঙ্গে তর্ক তিনি যথেষ্ট করে যাচ্ছেন, কিন্তু তার মধ্যে সাম্যতা, জানবার স্পৃহা এবং সঙ্গে সঙ্গে বাজাবার স্পৃহাও রয়েছে। ঠাকুরকে অল্প বয়স দেখে তিনি প্রশ্ন করতে আর দ্বিধা বোধ করেননি। নানারকম আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে নিজের পাণ্ডিত্যের প্রকাশ করে যাচ্ছেন, ঠাকুর বসে বসে

---

* স্বামীবাগ, ঢাকা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ :—শান্তিদাস মজুমদার, অজিত ভট্টাচার্য্য, বারীন ঘোষ, বিপুল চক্রবর্ত্তী, গীতা চক্রবর্ত্তী, ভূপেন্দ্র লাল রায় আরো অনেকে।

শুনছেন, আর পণ্ডিত ব্যক্তি শাস্ত্রগ্রন্থ হতে বাক্য উদ্ধৃত ক'রে দৃষ্টান্ত দিয়ে যাচ্ছেন। গ্রন্থগুলো তাঁর এত পাঠ করা যে শুনতেও বেশ ভাল লাগছে। তার আলাপ শেষ হওয়ার পর ঠাকুর বললেন, "সব তো বুঝলাম, এ যে খালি ঘরে বন্ধ ঘরে ইচ্ছামত নৃত্য করার মত—এ যে নিজের নৃত্য নিজেই দেখার মত। তালে তালে পা পড়ছে না, তাহা ঠিক হচ্ছে কি না, সে দিক দিয়ে লক্ষ্য করেছেন কি? এ যে ক্ষণে রাজা ক্ষণে প্রজা, ক্ষণে কৃষ্ণ ক্ষণে রাধা—যতই সাজানো যাক্ না কেন, নিজের যে রূপটি রয়েছে, বহু রূপেতে গিয়েও 'বহুরূপী' যে হচ্ছে, তাতো আপনি বুঝতে পারছেন। প্রকৃত রূপটি কি, তা কি জানতে চেয়েছেন? ছেলের হাতে diamond খেলার সামিল যে—পাছে আবার ভয় আছে, যদি এটাকে জেহ্বাতে লাগান যায় 'লোলা' ভেবে, বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা—নাড়াচাড়া তো বহু করছেন। না চটকালে কি করে পিণ্ড হবে? পাণ্ডিত্য তখনই হবে, পিণ্ডি চটকাতে চটকাতে পণ্ডিত হয়। যখন একটা concrete solid formএ এসে দাঁড়ায়, প্রথমতঃ সমস্ত বস্তু নিয়ে চটকান, বস্তু আরো আহরণ করুন; তারপর ভাল করে চটকান, তখনই পিণ্ড হবে—এ যে ছড়িয়ে আছে। আলগাভাবে হালকা থেকে যে যাঁর মন্তব্য করে যাচ্ছেন, তাদের একত্র করুন। যখন তরকারি রান্না করা হয়, রান্নাঘরের 'তাকে' একত্রে বহু পদ থাকে, সম্বারের প্রয়োজনে একে একে ধরে আনে তরকারিকে প্রস্তুত করার জন্যে। আবার বহু বহু তরকারি একত্র করেই একটা পদে আনে। তার আগ পর্য্যন্ত ডালার ভেতর কুমড়া বলে, 'আমি বেটা'; পটল বলে, 'আমিও তাই'; ঝিঙ্গে কয়, 'আমি কম কিসে?' কলা বলে, 'আমিও ছাড়া নই'; 'দা' বলে কি, 'রাখ, তোদের কেটে এক করবো, তবেই তোদের বাহাদুরি বের হবে।' আর 'তাকে' বসে নৃত্য করছে কালিজিরা, গুয়ামৌরি, তেজপাতা; তার সহযোগে উনুন মশায় বসে হাসছেন, 'আগুনে চড়াও করিব যখন,

তখন বুঝাবো মজা তোমাদের।' সব যখন হলো একত্রিত, নুন গিয়ে বৃদ্ধি করলো স্বাদের দিকে। প্রত্যেকের রূপকেই একত্রে প্রকাশ করলো যখন তাপেতে ওদের মজিয়ে একাকার ক'রে একটা পর্য্যায়েতে গিয়ে পৌঁছে দিল। কথা হলো এই যে, 'বিক্ষিপ্ততা,' 'নৈরাশ্য' এবং এই যে ভাষার ছড়াছড়ি, গ্রন্থের নানাভাবে লড়ালড়ি, এ যে জ্ঞানানলে না মজাতে পারলে যার যার দম্ভ সে সে করবে আলাদা থেকে থেকে, যতক্ষণ না উনুনে চাপাবে। উনুনে চাপানো সব মিটে যাবে। তখন গন্ধে, শব্দে, স্পর্শে স্বাদ নিজেই টের পাবে। তাই আপনাকে দেখছি, পড়াশুনার দিক্ দিয়ে একটা আলগা পোষাকের মত, বরযাত্রী যাওয়ার মত একটা পোষাক করে নিয়েছেন; এদিকে ছেঁড়া জামা শেলাই ক'রে পরছেন। যাত্রীকের সময় হাওলাত ক'রে জমিদারি চাল চালাবার জন্যে বরের partner হয়ে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্যে balance স্থাপন ক'রে যাচ্ছেন বিজ্ঞের চেহারার মতে ক'রে ক'রে—এও একজাতীয় উন্মাদেরই পরিচয় বিশেষ। ঠিক এত পড়াশুনার শাস্ত্রের ভাবাভাবিতে, ভাষার ঢেউয়ে ঢেউয়ে এমনি ক'রে সাজিয়ে নিয়েছেন; ক্ষণিকের পণ্ডিত সাজবার জন্য নিজের গতিবিধিগুলোও ঐ জাতীয় ক'রে চালিয়ে নিচ্ছেন—রূপটি আপনার ছেঁড়া জামার শেলাইর মত। বৃত্তিতে সব কিছু রয়েছে—coating খালি change। এতে কি ক'রে চলবে? হজম করুন, তখন আপনিই ভেসে উঠবে। আপনার চেষ্টা করতে হবে না, যখন আপনি কোন জিনিষ উদরস্থ করছেন—প্রয়োজনের তাগিদে সুস্থতার কিংবা অসুস্থতার যা-কিছু যেখানে যেখানে যেই যেই কেন্দ্রেতে যাওয়া দরকার, সেই টেনে নিচ্ছে। শ্বাসপ্রশ্বাস তো আর আপনি ফেলছেন না? ফেলিয়ে যে নিচ্ছে, আর আনছে। বুদ্ধিবৃত্তিতে কেবল মুক্ত বায়ু, স্বাস্থ্যকর জায়গা, স্বাস্থ্যকর খাওয়া—তাও যে প্রয়োজনের তাগিদেই। স্বাভাবিক বুদ্ধিতে ঐ'সমস্ত বুদ্ধিগুলো খুলে যাচ্ছে। এও

যে ঠিক তাই, হজম করলে বিকাশ আপনিই যে হবে। কোন জিনিষ ছাড়তে হবে, হবে না, কি গতিবিধি, চালচলন—সব-কিছু ঠিক হজম-ক্রিয়ার মত নেওয়ার দরকারে করিয়ে নেবে। জীবনভরা এত পড়াশুনা করায় আজ আপনাকে দাম্ভিকতার stageএ নিয়ে দাঁড়া করিয়ে দেওয়ার উপক্রম করছে। তখনই অভিমান সম্মান এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রকৃত জানবার স্পৃহাতে প্রকৃত স্পৃহা যদি থাকতো, আর প্রকৃত যদি পড়ার মত পড়া থাকতো, পড়ায়ই তো আপনাকে পড়ছে—আপনি আর পড়াকে পড়লেন কোথায়? যে কথাগুলো আপনাকে জানান হলো, যে কথাগুলো আপনাকে বলা হলো, আপনার মজ্জায় মজ্জায় সেগুলো কাঁটায় কাঁটায় বাঁধছে কিনা বলুন। আমাকেও জিজ্ঞেস করুন—আমার বেলায়ও তো তা হতে পারে। আমি যে চটাং চটাং কথা বলছি—এও তো একটা অহমিকার প্রকাশ হতে পারে? আমাকে জেরা করুন, আমারও তো বদহজমের কথা হতে পারে। কিছু থাকলে হজম জাতীয় কথা বলুন। জ্ঞানের আলোচনাতে মারামারি হয় না, তর্ক সেখানে দাঁড়ায় না—মীমাংসা সেখানে। সেখানে মান-অভিমানের প্রশ্ন কিসের? ওস্তাদরা নিজেরা যখন যুদ্ধ করে, তখন একজন আর একজনকে ক্ষেপিয়ে নেয়, তবেই যুদ্ধটা বেশ বাধে। তাই নানাভাবে প্রশ্ন উভয়ের মধ্যে ক'রে উভয়কে চাটিয়ে নিন্, না চটালে তো স্বরূপ বোঝা যায় না। তাই সমাজের ভদ্রতাতেই নিষ্প্রভতার পরিচয় দিতে যাচ্ছে, ইচ্ছা থাকলেও সত্য বস্তুকে মনের দিকে এড়িয়ে যাচ্ছে। সমাজের ব্যাপারই হচ্ছে—একজন যদি বড় তার্কিক থাকে, আর একজন যদি বড় critic থাকে, উভয়ের মধ্যে বাস্তবের relation এমন গড়িয়ে ফেলেছে, প্রতিবাদের বস্তু থাকলেও এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না—তাতে শুধু নিস্তেজতারই পরিচয় পাওয়া যায়। সেটা উপযুক্ততার পরিচয় নয়, যাঁরা এরকম করে থাকেন। জ্ঞানের যন্ত্র নিজেকেও ছাড়বে না, আর তো কথাই নেই। তাই এ

যে বাড়াবাড়ি কথা বললাম, কার্য্যকালে আপনি যদি এ জাতীয় অবস্থায় না থেকে থাকেন, আপনি প্রতিবাদ করুন।" পণ্ডিত ব্যক্তি বললেন, "আপনি যা বলেছেন তা অস্বীকার্য্য নয়, তবে বই পড়তে পড়তে বইয়ের নেশাতে মেতে রয়েছি। যেখানে গিয়েছি সেখানেই আমার পাণ্ডিত্যের আদরই পেয়েছি; এ জাতীয় কথা আমায় কেউ শোনায়নি।" ঠাকুর বললেন, "আপনার আলোচ্যের ভেতর দিয়ে যা পেয়েছি তাই আপনাকে জানিয়েছি।" পণ্ডিত ব্যক্তি বললেন, "এ ঠিকই, কেউ যদি একটু রেওয়াজ মারে, ভেতরের ব্যাপারের দিক্ দিয়ে অস্বীকার করতে পারি না।" ঠাকুর বললেন, "কেউ যদি কিছু শিখে নেয় mistake যদি কেউ কোথাও করে, না জানিয়ে পারে না—এটা স্বভাবজাত ধর্ম্ম। কেউ যদি নামতা পড়ে, 'পাঁচে একে পাঁচ, পাঁচ তু'গুনে দশ, তে পাঁচা আঠারো', নামতা যার জানা আছে, ঐ জাতীয় শুনে সংশোধন না করিয়ে কেউ যেতে পারে না। যদি কেউ না বলে চলে যায়, হয় সে শ্রবণশক্তি হতে বঞ্চিত, না হয় ঐ ব্যাপারে অজ্ঞ। তা বলে আমি বলেছি বলে বিজ্ঞ ব'লে বলছি না—স্বাভাবিক রীতিনীতিটুকুই বলছি। তবে আমারও জানবার ইচ্ছা আছে কিনা, তাই মাঝে মাঝে চটিয়ে দিয়ে প্রকৃত স্বরূপটিকে দেখতে ইচ্ছে আমার থাকে। সুতরাং এ জাতীয় তর্ক মীমাংসাতে পৌছাবার জন্যই উভয়ের মধ্যে এ জাতীয় আলোড়নকে উদ্ভব করা বেশীর ভাগ। ব্যক্তিগত সমাধানের আগেই সমস্যার উদ্ভব ক'রে বিবাদপূর্ণ একজাতীয় বৈষম্যের সৃষ্টি করে যাতে তারা সমস্যার জন্য এগিয়ে যেতে পারে এবং মন্তব্য তার মধ্যেই করে যাচ্ছেন। আর যারা training দিচ্ছে, শিক্ষা দিচ্ছে, তাদের বহু রূপের সঙ্গে সঙ্গে মিশে তাদের শিখিয়ে যেতে হচ্ছে। যাদের নৃত্য শেখাবে, নিজে নৃত্য ক'রে ক'রে শিখিয়ে দিচ্ছে। যাদের খোঁড়ার অভিনয় শেখাচ্ছে, সে নিজেও ঐ জাতীয় ক'রে শিখাচ্ছে, আর পাশের লোক না বুঝে তাকে খোঁড়া বলেই বদনাম ক'রে

বেড়াচ্ছে। যে-কোন জিনিষই প্রকৃত সঙ্গতে না আসা পর্য্যন্ত কোন জাতীয় কোন মন্তব্য করা বিধেয় নয়। হঠাৎ এক কথা মনে পড়লো— একদিন ষ্টীমারে যাচ্ছি। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ। সে খুব ঘোড়দৌড় খেলে। খেলে খেলে সব-কিছু হারিয়েছে। সে দুঃখ ক'রে আমায় বলছে, বহু রকম বাধা সত্ত্বেও সে কোন বাধাতেই আটকে থাকতে পারে না, যখন শনিবার এসে উপস্থিত হয়। সে চোখের জল ফেলে জীবনের ইতিহাস বলতে আরম্ভ করলো। এমন সময় আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে আছি। সে দেখলো আমি তার চেয়েও বড় দুঃখী। তখন আমায় সে বলে উঠলো, 'আপনিও?' আমি বললাম, 'কি আর বলবো বলুন, আমিও সব—।' সে আমায় পুনঃপুনঃ উপদেশ দিচ্ছে, 'আপনি আর যাবেন না।' আমি বললাম, 'একবার নেশায় পড়লে সে নেশা ছাড়া বড় দায়, তাই এ নেশায় নেশায় সব ভুলে রয়েছি।' সে দেখলো তার চেয়েও 'বড়'! দুঃখটা আমার জন্য সাংঘাতিক তার হলো। তখন আমার ঠিক ঠিকানা জিজ্ঞেস করছে, কোথায় যাবো না যাবো। আমি একটা ঠিকানা বলে দিলাম। সে সেখানে গিয়ে আমাকে খোঁজ করছে। বহু লোকের সমাগম সেখানে, আমার গলায় ফুলের মালা, আমার নাম ধরে, 'অমুক—বাবু আছেন, অমুকবাবু আছেন', তখন ভক্তদের থেকে বলছে, 'আপনি কাকে ডাকছেন, উপরে গিয়ে খোঁজ করুন।' তারপর উপরে যখন তাকে দেখলাম, হাত ইসারা ক'রে তাকে ডাকলাম। কাছে এসে প্রণাম ক'রে বসলো। আমায় বললো, 'আপনার একভক্ত—ষ্টীমারে আমার সাথে সাক্ষাৎ, তাই এসেছি।' তখন সে সমস্ত দুঃখ আমার কাছে বলতে আরম্ভ করলো। আমি বললাম, 'সে এখন ঘোড়দৌড় হতে বঞ্চিত।' সে বহু আলাপ ইত্যাদি শুনে দীক্ষিত হলো। তার বছরখানেক পর রহস্য উদ্‌ঘাটন—তাকে সব খুলে বলা হলো। আমি যে জাতীয় কথা বলেছি, সে নিজেই তার ভাবের রূপ দিয়ে

তার জাতীয় রূপ দিয়ে আমার ভাবটি বুঝে নিচ্ছে ; আমার ভাবকে এর ভাবে এনে এনে স্বাভাবিক মতে ভেবে যাচ্ছে। এর আগে বহু গীতা, ভাগবত স্পর্শ করেও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারেনি। প্রকৃত পথই হচ্ছে—যখন বড়শিতে মাছ আটকায়, তখন সূতা ছেড়ে দিতে হয়, পরে আপনিই সে পরিশ্রান্ত হয়ে হাঁপিয়ে পড়ে, তখন সূতা গুটিয়ে গুটিয়ে মাছ নিকটে নিয়ে আসে। প্রত্যেকটি জিনিষই প্রথম অবস্থাতে একটু সহজ ক'রে ক'রে তারপর তাকে আঁট করতে হয়। তাই বাইরের বাস্তবেতে বাইরে থেকে অনেকে না বুঝে বহুরকম মন্তব্য করে। কিন্তু এর আগে প্রথমতঃ বুঝে নেওয়া দরকার তার সম্পর্কে।"
তারপর এভাবে আলাপ-আলোচনার পর সে পণ্ডিত ব্যক্তি খুব সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন।

চৌদ্দ

আমরা* নৌকাযোগে গ্রাম† থেকে সহরে যাচ্ছি। নদীর পর নদী—তিতাস, মেঘনা, শীতললক্ষা। নদীর উপর দিয়ে মাইল ত্রিশ হবে। রাস্তায় খাওয়ার ব্যবস্থার জন্য কোন এক বাজারে‡ নৌকা ভিড়ানো হলো। নৌকা থেকে নেমে খাবার নিয়ে নিলাম। নৌকা§ আবার চলতে আরম্ভ করলো। খুব জোর বাতাস বইছে। নৌকা পাল খাটিয়ে হুহু করে চলছে। নদীতে ঢেউও মন্দ উঠেনি। হঠাৎ একটা চীৎকার শোনা গেল, 'হায়, হায়!' আমরা পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, হালের বৈঠা ছিঁড়ে জলে পড়ে গেছে। আমরা জলের তলে, না উপরে তাই ভাবছিলাম। ঠাকুর মনে হয় আগেই টের পেয়েছিলেন। নৌকা ঠিক ভাবেই চলছে—বরাবর যাচ্ছে। ঠাকুর বলছেন, "মনের হাল যদি ঠিক থাকে, যে-কোন বেগতিককে গতিতে এনে গতির দিকে নিয়ে নেওয়া যেতে পারে,—যেমন নৌকাটাকে দেখলি, যেমন তোমরা এক-একজন এক-একজনের হালের কাজ করে যাচ্ছো, একটা প্রবল কিছু ইচ্ছা হলেই যেমন তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছো না—মনের ঝড়ে উথালপাথাল খেয়ে যাচ্ছে ; হালটি ও যে তোমার ঠিক মাফিক মত চলে আসছে, বেশী ঝড়ে ভেঙ্গে নেওয়ার

---

* অজিত ভট্টাচার্য্য, দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী(৩), বিপুল চক্রবর্ত্তী, বারীন ঘোষ।

† কৃষ্ণনগর, ত্রিপুরা।

‡ বৈদ্যের বাজার।

§ নৌকাচালক—সুরেন্দ্র মাঝি, জগদীশ মাঝি, রামকেষ্ট মাঝি।

ভয় তো সব সময়ই থাকে—কসরৎ যে তার জন্যই। ঝড়ের সাথে সাথে মনের বেগও বাড়িয়ে দিতে হয়, তবেই তো সমতা রক্ষা করতে পারা যায়।"

নৌকা সহরে ভিড়ল। দূর হতেই দেখছি ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার উপক্রম। আমরা গিয়ে টিকিট ক'রে গাড়ীতে উঠছি, এমন সময় শোনলাম গাড়ীখানা পঁয়ত্রিশ মিনিট দেরীতে ছাড়ছে। মনে মনে ভাবলাম, এও বুঝি ঐ নৌকার মত আর একটি অবস্থা। কিন্তু ঠাকুর ঐ সম্পর্কে কিছু বললেন না। সময় মত আমরা বাড়ী* এসে পৌঁছলাম। ধীরে ধীরে অনেকেই খবর পেল, ঠাকুর সহরে এসেছেন। ক্রমশঃ লোকের ভিড় হতে লাগল।

* * *

এরই মধ্যে এক ভদ্রমহিলা† ঠাকুরের নিকট এসে উপস্থিত হলেন। মহিলাটি এসেই ঠাকুরের পায়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। ঘরভর্ত্তি লোক‡, সবাই ঠাকুরের কথা শুনছিলো। ঐ ভদ্রমহিলাটির অবস্থা দেখে ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কাঁদছ কেন? কি হয়েছে?" তখন ভদ্রমহিলাটি বললেন, "আমার ছেলে§ মরণাপন্ন, এখন-তখন অবস্থা। আপনি অনেককে ভাল করেছেন, আমার ছেলেকেও আপনার ভাল করতেই হবে।" ঠাকুর বললেন,

---

* স্বামীবাগ, ঢাকা।

† ৺জ্যোতিষ রায়ের স্ত্রী মণিকুন্তলা রায়।

‡ কৃষ্ণপ্রসন্ন তর্কবাগীশ সপ্ততীর্থ, যদুনাথ রায়, গিরীশ ঘোষ, অমূল্য বসু, গোপাল ঘোষ, উষা দাসগুপ্তা, রাজেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, দ্বিজেন্দ্র চক্রবর্ত্তী(১), ভূপেন্দ্রলাল রায়, প্রাণশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, ভূপেন রায়, পান্নালাল বসু, চারুলতা ঘোষ, রবি ঘোষ, অনিল ঘোষ, মনীষ রায়, কালিদাস ব্যানার্জ্জি, প্রিয়প্রসাদ গুপ্ত, বারীন ঘোষ, অজিত ভট্টাচার্য্য, শান্তিদাস মজুমদার।

§ রামানন্দ রায়।

"আচ্ছা, সব কথা তো শোনলাম, যতটুকু আমার দ্বারা সম্ভব চেষ্টা করবো।" তখন মহিলাটি বললেন, "আমি সে সব বুঝি না। অনেককে আপনি ভাল করেছেন তা আমি শুনেছি, আর যার* বাড়ী আছি, তার মুখেও শুনেছি। আপনার কি প্রয়োজন হবে আমায় বলুন। আমার জায়গাজমি বিক্রি করেও যদি ছেলে সুস্থ হয় তাই আমি করবো। এখন থাকার মধ্যে ঐটুকুই মাত্র আছে, আমি শেষ চেষ্টা করতে চাই। আপনি একটু দয়া করুন।" ঠাকুর বললেন, "ছিঃ ছিঃ ছিঃ, এ সকল কথা কেন বলছ? আমার এই কাজে টাকার প্রয়োজন হয় না, আর হয়ও নি আজ পর্য্যন্ত; যতটুকু পেরেছি অন্তরের টানেই করেছি। ধর্ম্ম তো আর ব্যবসা নয়? কেনাবেচার কি আছে? যারা ঐ সকল করে, তারা ব্যবসার জন্য করে বেশীর ভাগ।" তখন ভদ্রমহিলাটি বললেন, "আমার চিকিৎসার সামর্থ্য নেই—যা ছিল সবই গেছে। এখন আপনাদের কৃপা ছাড়া উপায় নেই। যাহার কাছে গেছি, সেই নিরাশ করেছে। শান্তিস্বস্ত্যয়ন, ডাক্তার, কবিরাজ—সবই করেছি। শেষ বেলায় স্বামীর বন্ধু 'সিভিল-সার্জ্জন', তিনিও আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন—কোনটাতেই আর আশার আশা পাই নি। এর মধ্যে আমার স্বামীর এক 'মাতাজী' জানিয়েছেন, 'বাঁচবে না, আমি ওর পরলোকের সুবন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছি, তুমি ওর জন্য আর বৃথা মায়া কর না।' এ সংবাদে মায়ের প্রাণ কি হতে পারে তাতো আপনার আর বোঝবার বাকি নেই। স্বামীর রোজগারের সমস্তই সেখানে সেই মায়ের আশ্রমেই দিয়েছেন—ঘরের দিকে একটুও চাননি। আমার ছেলের যে পথ্য আনবো আজ সে পয়সাও আমার হাতে নেই। মনের দিক্ দিয়ে কি করলে যে ভাল হবে—যে যা বলছে তাই করছি। এর মধ্যে সমস্ত অলঙ্কার বিক্রি ক'রে এক সাধুকে দিয়ে যজ্ঞ করালাম, তাতে কিছুই ফল হলো না,

* কামিনী জজের স্ত্রী।

ছেলে ক্রমশই নিস্তেজ হয়ে আসছে।” মহিলাটি হাউহাউ ক'রে কাঁদতে সুরু করলেন। আমাদের প্রাণেও বেশ লেগেছে। ঠাকুর বললেন, “আমি তোমার কি ব্যবস্থা করতে পারি দেখি। আমি বিকেলের দিকে যাবো।” তারপর নানাকাজের পর কয়েক জনকে* নিয়ে বিকেলবেলা সেখানে+ গেলেন। গিয়ে দেখেন ছেলে মুমূর্ষু—বিছানার সাথে প্রায় মিশে যাওয়ার উপক্রম, নড়বার ক্ষমতাও নেই, হাতটাও নাড়াবার ক্ষমতা নেই, নিষ্প্রভ দৃষ্টি। মিনিট পনরো ঠাকুর ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন। ওর গায়ে একটু হাত বুলিয়ে বললেন, “কিছু পয়সা খরচ করতে পারবে তো? আমার জন্য নয়, ওর পথ্যাদির জন্য, একটু ভাল খাওয়াতে হবে।” তারপর তিনি এক গ্লাস জলস্পর্শ করে ওকে খাইয়ে দিলেন ও বললেন, “তুমি চার পাঁচ দিনের মধ্যে ভাল হয়ে যাবে।” “একটু ভাল হলে ওকে গ্রামের বাড়ীতে নিয়ে যেও, তবেই সব ঠিক হয়ে যাবে,” ওর মা'কে একথা ঠাকুর বললেন। আমরা সহরে থাকাকালীনই সেই রোগী ঠাকুরের বাটীতে হেঁটে এসেছিল এবং ঠাকুরের নিকট কয়েকদিন ছিল। মাসখানিকের মধ্যে তার সবলতা ফিরে এসেছিল।

---

* শান্তি দাস মজুমদার, বারীন ঘোষ, অজিত ভট্টাচার্য্য, রমেশ চক্রবর্ত্তী।

\+ 'শ্যামাবাস', টিকাটুলী, ঢাকা।

পনরো

একদিন আমরা* নদীর† পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি। ঠাকুরও দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বেশ মজার মজার কথা বলছেন। আমরাও শুনে মাঝে মাঝে বেশ হাসছি। এমন সময় একটা বড় নৌকা, যাকে আমরা 'গয়না' বলি, পাড়ে এসে ভিড়লো। 'গয়না' হতে চারজন লোক‡ নেমে এল। শীতের দিন। ওদের হাতে কয়েকটি কফি, বেগুন। তখন ভোর প্রায় পাঁচটা হবে। ঠাকুর স্নান করার জন্য নদীতে নেমে-ছেন। আমরা কাপড়-গামছা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ওরা নৌকা থেকে নেমেই ঠাকুরকে ডাকছেন, "এই খোকা, শোন তো।" আমরাই দৌড়ে যাচ্ছিলাম, ঠাকুর বাধা দিয়ে বললেন, "তোরা ওদিকে দাঁড়া।" সুতরাং আমরা দূর থেকে দাঁড়িয়ে কাণ্ড দেখছিলাম। ভদ্রলোকেরা বলছিলেন, "এই খোকা, এখানে একজন বাচ্চা ঠাকুর আছেন। কোথায় থাকেন বলতে পার ?" ঠাকুর বলছেন, "আপনারা কি ক'রে বাচ্চা ঠাকুরের কথা শুনলেন ?" ওদের মধ্যে একজন বলছেন, "আমার এক বন্ধুর§ ছেলে মরণাপন্ন হয়েছিল, তিনি বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তাই তাঁর ঠিকানা নিয়ে আমরা এসেছি।" ঠাকুর আমাদের দেখিয়ে বললেন, "ঐ যে

---

* অজিত ভট্টাচার্য্য, বিজয় সোম, ধীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বিনয় সোম, সুরেন্দ্র নমঃ, জগদীশ নমঃ।

† তিতাস, কৃষ্ণনগর।

‡ নগেন ঘোষ, বঙ্কিম দে, মরণ রায় চৌধুরী, অহীন্দ্র ঘোষ।

§ সারদা বসু।

ওরা দাঁড়িয়ে আছে, ওদের কাছে বলুন, ওরা নিয়ে যাবে। ওরা তাঁকে ভালভাবেই চেনে।" তারা আমাদের পেছন পেছন চললো। আমরা ঠাকুরের ঘরে নিয়ে তাদের বসালেম। এদিকে ঠাকুর স্নান ইত্যাদি সেরে চাদর গায় দিয়ে ঘরে ঢুকলেন। আমরা বললাম, "ইনিই আমাদের ঠাকুর।" অবাক্ হয়ে ওরা চেয়ে রইল। ঠাকুর বললেন, "আমি খোকা ঠাকুর, অনেকেই ভুল করে, মনে কিছু না করাই উচিত।" ঠাকুর সাধারণতঃ কাউকে 'আপনি' বা 'তুমি' কিছুই বলেন না, passive voiceএই বেশী কথা বলেন, "কোথা হতে আসা হলো? কি প্রয়োজন, তাড়াতাড়ি বললেই ভাল হয়।" তারা সবাই ক্ষমা চাইছে নদীর পাড়ের ব্যাপারে—ভুলে যে ঐরূপ করেছে। ঠাকুর বললেন, "ও কথা তো আগেই চুকে গেছে। এরকম অনেকেই করে।" কফি, বেগুন তাঁর জন্যই এনেছিল। ওরা সেখানেই সব প্রসাদ নেবে। এর মধ্যে ওরা একটা পোঁটলা খুলছে, তার ভেতর কি যেন নিয়ে এসেছে, সহর থেকে এসেছে কিনা তাই। ঠাকুর বললেন, "ওটা কি? এক গাঠ্ঠি ফুল নিয়ে আসা হয়েছে কেন?" ওরা বলল, "ফল নিয়ে এসেছি।" ঠাকুর বললেন, "আমি ভেবেছিলাম দীক্ষা নেওয়া হবে, তাই ফুল নিয়ে আসা হয়েছে।" ওরা বলল, "আপনার জন্য কিছু ফল নিয়ে এসেছি।" ঠাকুর বললেন, "আমি দেখছি ফুল, বলা হচ্ছে ফল!" ওরা বলল, "সে কি করে হবে? নিয়ে যে এসেছি ফল!" ঠাকুর হেসে বললেন, "এত তর্কের প্রয়োজন কি? খুলে দেখলেই হয়।" ওরা তখন পোঁটলা খুলল, দেখা গেল এক পোঁটলা গোলাপ ফুল। তখন ওরা অবাক্ হয়ে একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে—বাক্‌শক্তি প্রায় রহিত। ঠাকুর বললেন, "এত ভুল কি করে হয়?" ওরা বলল, "আমরা আজ দীক্ষা নিতে পারবো কি?" ঠাকুর বললেন, "নতুবা এগুলো নিয়ে এসেছ কেন? আমি তো সেইজন্যই অপেক্ষা করছিলাম।" ওরা তাড়াতাড়ি সব

নদী থেকে স্নান করে এসে দীক্ষা নিতে বসল, দীক্ষিত হলো। পরে তারা আমাদের বলল, "আমরা সব সময় 'ফল ফল' চিন্তা করছিলাম, —আনলাম কি আর হলো কি! কিন্তু ঠাকুর যখন ফুলগুলো আমাদের হাতে দিতে লাগলেন, আমরা ওগুলো হাতে নিয়ে দেখলাম, সেগুলো ফুল নয়, সবই ফল,—আপেল, আঙ্গুর, সপেটা, যেগুলো আমরা ঠাকুরের জন্য নিয়ে এসেছিলাম।"

এদিকে বহু লোকের ভিড় হয়ে গেছে। তাদের সঙ্গেও ঠাকুর দেখা করলেন। ওদের মধ্যে ঐ আলোচনাই চলছে। ওরা ঠাকুরকে বলতে লাগল, "বাবা, তুমিই সব, তুমিই সব-কিছু।" তখন ঠাকুর আর ওদের 'তুমি' বলতে দ্বিধা করছেন না। তিনি বললেন, "অবাক্ হবার কি আছে?—প্রথম বীজ, তারপর গাছ, তারপর ফুল, তারপর ফল, এও যে ঠিক তাই, ক্ষণে ফুল, ক্ষণে ফল—অবাক্ হওয়ার কি? তোমরা যে এ অহরহ দেখছ নিজের গাছে, হাটে, মাঠে, সর্ব্বত্র! অমন করছ কেন?" এইভাবে ঠাকুর ওদের খুব সহজ ভাবে সব বুঝিয়ে দিলেন, ওরা চারজন বেশ ভালভাবে বুঝে গেল। এরপর ঠাকুর ভেতরে চলে গেলেন।

ষোল

'সহস্রারে'র কথা ঠাকুর আলাপ* করছেন, "সহস্রারে যখন মনোনিবেশ করা হয়, তখন সেই জায়গায় যে সমস্ত glandগুলো চিন্তার সাথে সাথে secretion হয়, ক্ষুধার সাথে সাথে যেমন পিত্ত নির্গত হয়, ঠিক সে জাতীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়, তখন আর একটা সূক্ষ্ম জিনিষের চাহিদা হতে থাকে। এই বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে, আগুন যখন জ্বলবে তখনই একটু জোর বাতাস আসবে। এই মনের যে 'বিক্ষিপ্ততা' 'বিক্ষিপ্ততা' self একটা concentrated অবস্থা, যাহা হতে মনের উদ্ভব, সেই উদ্ভব-মন ছড়ে যাচ্ছে। তাতে কি হচ্ছে? হচ্ছে একাগ্রতার আর একটি রূপের সৃষ্টি, যেমন—ঝরণার জল যত ছড়ে পড়ে, ততই টানে। এই ছড়ে যাওয়ার অবস্থা একাগ্রতার আর একটি অবস্থা—যত বেশী ছড়ছে তত বেশী—। সহস্রার অবস্থার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র partগুলো চিন্তার সাথে সাথে তার সমষ্টির বিশেষে এই যে ধ্বনি, এটাই নাদ। নাদ এ ধ্বনির সাথে সাথে ধ্বনির দিকে শব্দের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—শব্দরূপই ব্রহ্মময় অবস্থা, ব্রহ্মের সমস্ত শক্তি যা ব্রহ্ম-রূপে, সেই শব্দই বাস্তবে 'প্রণব' নাম দিয়েছে। মণিপুর হতে আজ্ঞা-চক্র অবধি ধাপে ধাপে যে অবস্থা, তাহা গিয়ে সহস্রারে সাড়া দিচ্ছে।

---

* স্বামীবাগ, ঢাকা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ:—সুভাষ চক্রবর্ত্তী, গোপাল ঘোষ, শচীন গুহ, মণ্টু রায়, দিলীপ সাহা, অমরেন্দ্র দাশ, উপেন সেন, স্নেহলতা রায় চৌধুরী, ঊষারাণী দত্ত, সুধীর লাল চক্রবর্ত্তী, শম্ভু পাল, বারীন ঘোষ, শান্তিদাস মজুমদার, অজিত ভট্টাচার্য্য আরো অনেকে।

সেই সাড়ার সাথে সাথে যে শব্দের সৃষ্টি হচ্ছে এবং সেখানেই একটা সঙ্গমের অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে—সেই সঙ্গমই হচ্ছে প্রকৃতি-পুরুষের মিলিত অবস্থা, একে বলে 'শিবশক্তি'। এই সঙ্গমই হচ্ছে ঠিক mountain and fountain। সব সময় একটা রসের উৎপত্তি হচ্ছে, যাকে বলে স্খলিত অবস্থা। স্খলিত অবস্থা কি? বাস্তবের সাময়িক ক্ষণিকের যে আনন্দ, ঐ বিরাট শক্তির একটি মাত্র নমুনা বিশেষ। বিরাট একটি যে আছে, তার নমুনার কিছু পরিচয় দিচ্ছে এই বাস্তবতার মাঝ দিয়ে যেমন mill। Sampleগুলোকে নিয়ে যেমন millকে বিচার করে, ঠিক সেই জাতীয় অবস্থা এই বিরাটের বিভিন্ন রূপের ভেতর তার শক্তির বিকাশ, তার বিকাশ। এ সমস্ত হচ্ছে তার sample—নমুনা বিশেষ। একটা নমুনাকে অনুসরণ ক'রে ক'রে যেমন যেতে হবে, এও ঠিক এগিয়ে যেতে হবে চলার পথে বাস্তবের order দেওয়ার মত। সুতরাং এই মূলমন্ত্রের শব্দই হচ্ছে—সমস্ত অণুপরমাণুর শক্তির শব্দরূপে ব্যবহার হচ্ছে। মূলাধার হতে সহস্রার পর্য্যন্ত আসা-যাওয়ার যে গতি, এই গতিকে maintain করছে সেই মূলকেই প্রকাশ করবার জন্য—মূলেতেই রয়েছে সে সমস্ত। সৃষ্টির বীজেত যে সমস্ত জিনিষ সঞ্চিত থাকে, এই মূলে এই বীজ নিয়ে সেই সমস্ত জায়গাতে গিয়ে অবস্থিত হয়—সেই চাহিদাই পূর্ণ হচ্ছে সহস্রারে মন-সংযমে। যে শূন্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং শূন্যতাই শূন্যতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে, এই মূল এ বীজ সেখান হতেই উদ্ভব হচ্ছে। অজানার বস্তুকে জেনে জেনে যাওয়ার জন্য জানার পথে এগিয়ে চলছে। Universeএর নিয়মের মধ্যে যতটুকু পাওয়া যাচ্ছে, তাহা হচ্ছে জানার পথে জেনে জেনে জাগিয়ে জেনে যাওয়া,—যেমন জানিয়ে জেনে যাওয়াই হচ্ছে, যে জিনিষটা আছে তাকে জাগিয়ে জেনে যাওয়া। যেমন তোমরা রীলের ছবি দেখ, সেটা রীলে আগেই থাকে, সেটা পরবর্ত্তী দেখে নেওয়া হচ্ছে। উত্তেজিতের বৃত্তির

নিবৃত্তিই যখন সৃষ্টি, সেই উত্তেজিতের বৃত্তির নিবৃত্তিই যখন সৃষ্টি, সেই উত্তেজিত অবস্থার সৃষ্টি হয় প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ; এবং মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ঘর্ষণে যে বিদ্যুতের সৃষ্টি হয়, সে বিদ্যুৎ বহুরকম বহু অবস্থায় জ্যোতির সৃষ্টি হয়, সে বিদ্যুৎ বহুরকম অবস্থায় জ্যোতির সৃষ্টি ক'রে তার যে রূপ দিয়েছে বহুভাবে বিদ্যুৎ জাতীয় অবস্থার। বিশ্ব নিজেকে নিজে জানবার প্রয়াসে সৃষ্টি, তাকে জানবার জন্য সে নিজেই যখন উদ্ভব, universe স্বয়ং তার নিজের প্রয়োজনে বহুরূপে উদ্ভব এবং উদ্ভাসিত হচ্ছে। সেই সমস্ত মনের একমাত্র খোরাকই হচ্ছে ব্রহ্মের সমস্ত জিনিষকে আপন করে নেওয়া ; একমাত্র মনই তাকে গ্রহণ করতে পারে। আজ সেই মনকেই যেন সাময়িক খোরাক দিয়ে দৈন্যতার মাঝে বিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হাতীকে যদি ছাগলের বাড়ীতে নেমন্তন করে, তার খোরাক খেয়ে হাতীর যে অবস্থা হবে, ঠিক তেমনি করে এ মনকে সাময়িক সংসারের খোরাক দিলে সেই অবস্থার মত হবে। হাতীকে ছাগলের খোরাক দিলে যেমন চলবে না, মনকে সংসার-সংস্কার খোরাক দিলে চলবে না, তাকে দিতে হবে তার খোরাক, সমস্ত বিশ্বকে তার খোরাক করে দিতে হবে, তবেই হবে সঙ্গম অবস্থা—সেই সঙ্গম অবস্থাই হচ্ছে সৃষ্টি। বাস্তবে বাস্তবে বিশেষ বিশেষ বিভিন্ন রূপ দিয়ে এ জাতীয় সৃষ্টির সত্ত্ব রক্ষা করছে, এই সমস্ত সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ব্রহ্ম স্বয়ং তার সত্ত্বাকে তোমাদের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করছেন। তিনি যে চৈতন্যময়, সেই চৈতন্যেরই কিছু খোরাক চৈত্যন্যের কিছুটা পরিচয় দিচ্ছেন।”

সতরো

একদিন আমরা* দশ পনেরো জন বসে† আছি। একজন ওস্তাদ‡ বেশ ওস্তাদি ঢংএ ঠাকুরকে বাজনা শুনাচ্ছেন। সারাদিন পরিশ্রান্ত হয়ে ঠাকুর একটু বিশ্রাম করছেন। তাঁর বিশ্রামের সময়ও আমাদের মধ্যে কয়েকজন থাকতো। সবাইকে নিয়েই ছিল তার বিশ্রাম। হঠাৎ তিনজন যুবক এসে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হলো। অভিনয়ের সুরে এরা বললো, "নমস্কার।" ঠাকুর তাদের বসতে বললেন। আমরা ওদের বসালাম। বাজনা চলছে। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "কোন প্রয়োজন আছে কি?" এরা মনে হয় এসেছিল কিছু একটা শুনে, কিন্তু এখানে এসে দেখে আর একরকম। তারপর ওরা ঠাকুরের সঙ্গে খুব উত্তেজিত ভাবে কথা বলছে আর হাত গুটাচ্ছে, মনে হয় যেন মুষ্টিযোদ্ধা। পরে আমরা জেনেছি ওদের একজন মুষ্টিযোদ্ধাই। তারা উল্টোপাল্টা তর্ক করছে। মনে হচ্ছিল যেন ঝগড়া করার উদ্দেশ্যেই এসেছে। ওদের ভেতর যে ছেলেটি হাত গুটিয়ে বসে আছে, সে ঠাকুরকে বলে উঠলো,

---

* রবি ঘোষ, নৃপেন রায়, অনিল ঘোষ, কালিদাস ব্যানার্জ্জি, যদুনাথ রায়, অশ্বিনী চাটার্জ্জি, মনীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বারীন্দ্র ঘোষ, অহীন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী, শান্তিদাস মজুমদার আরো অনেকে।

† স্বামীবাগ, ঢাকা।

‡ শ্যামবিনোদ সেতারী।

"আপনি তো খুব সৌখিন দেখছি! দেশের লোক দুর্ভিক্ষে মরে যাচ্ছে, কিন্তু আপনার বিলাসিতার তো কোন ত্রুটি দেখছি না।" নানা ভাবে ঠাকুরকে খুব জব্দ করার চেষ্টা করছে। ঠাকুর বললেন, "আমি কি হলে আপনারা খুশী হন?" ছেলেটি বলছে, "আপনি থাকবেন বেশ নেংটি-পরা এবং অন্য কোন বেশভূষা থাকবে না।" ঠাকুর বললেন, "তাতে আপনারা ওরকম পোষাক পরলে কি মনে করবেন? আমি সাধারণ পোষাক, খদ্দর বা তার চেয়েও মোটা কিংবা কৌপীন পর্য্যন্ত না হয় গেলাম, তাতে আপনারা এসে আমায় কি ভাববেন?" ছেলেটি বলছে, "তখন আমরা ভাববো লোকটা খুব ত্যাগী, সংসারের কোন জিনিষে তার আকর্ষণ নেই, দুনিয়ার সাথে কোন সম্বন্ধ নেই।" ঠাকুর বললেন, "বেশ, এইভাবে যদি ত্যাগী আর ভোগী আপনার ভাবেই যদি নিয়ে নেওয়া যায়, সেটা তো খুবই সুন্দর। আর আপনার চিন্তাধারা তো দেখছি খেলা করছে শুধু পোষাকের মাইর প্যাঁচে। আপনার চিন্তা বুঝি পোষাকী চিন্তা? পোষাকের সাথে সাথে আপনার চিন্তা বুঝি পরিবর্ত্তিত হয়? আর যারা নেংটা, তারা কি আপনার কাছে?" সে বললো, "তারা অসভ্য।" ঠাকুর বললেন, "তবে একটা কিছু নিবারণের জন্য থাকা চাই বুঝি? আর আপনারা এসে আমায় কোন কথা জিজ্ঞেস না ক'রে পরিচয় না দিয়ে হঠাৎ এরূপ মন্তব্যের কারণ কি? আর আপনাদের চিন্তাশক্তির যে গতিবিধি তার উপর নড়চড় করাটা কি বিধেয়? আমার ব্যক্তিগত মনের দিক্ দিয়ে কি আছে বা না আছে, পোষাকে কতটুকু effect করেছে, না করেছে তাতো আপনি জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। আমারও সেই প্রশ্ন আপনার কাছে। আপনি কি পোষাকী মনের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন আমার কাছে? এই জাতীয় চিন্তাধারা নিয়ে যদি বাস্তবে চলেন, তবে আপনার চলার পেছনে সংশোধনের অভাব থেকে যাচ্ছে। চিন্তাশক্তিকে একটু solid

করুন, তবেই আপনি বুঝতে পারবেন, কোথায় রয়েছে কার গলদ। যদি আমার পোষাকের জন্য ব্যক্তিগত অপকার বোধ করি, সেটা সংশোধন করবোই। আর যা বলেছেন আপনি হিতাকাঙ্খী হয়ে, হিতে যদি আমার আসে তাহা পালন না করার তো কোন কারণ নেই ?" সেখানে দু'টি মেয়েও বসে বসে ঠাকুরের কথা শুনছিলো। ঠাকুর হঠাৎ বললেন, "আপনি যে আমার সঙ্গে কথা বলছেন, কিছুটা অংশ ব্যয় করছেন মেয়েদের দিকে আর কিছুটা আমার উপর ব্যয় করছেন। আপনি দেখছি বেশ মেয়েলীমিশ্রিত হয়ে মিশ্রিযুক্ত অবস্থায় কথা বলছেন। একি আপনার credit নেওয়ার জন্য ? তাতে ভালবাসা মিলবে না। অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী, তাতো জানেন ? সুতরাং ভয় পাবে মিশতে আপনার সাথে। যে আশাতে ফাঁদ পেতেছিলেন, তার গোড়ায় নিষ্ফলই যে রয়ে যাচ্ছে। আপনার জন্যই বলছি, যদি বাস্তবিকই কিছু চাওয়া মনে করেন, তবে সেই চাওয়াকে চাওয়ার মত করে নিন না। হালকা ভাবে বেলুনের মত উড়িয়ে পিছু-পিছু দৌড়াবার মানে নেই, পিছু ছোটার মানে নেই।" তখন হঠাৎ রাগ হয়ে উঠেছে, "আমি কি মেয়ের কথা ভেবেছি নাকি ? ওটা মিছে কথা।" ঠাকুর বললেন, "মিছে কথা হলে কি আমায় ছেড়ে দিতেন ? সেই সাহস তো আপনার নেই। সাহসের গোড়ায় ঘুণে ধরেছে, এখন বাহাদুরি নেওয়ার জন্য না হয় কুঁদতে পারেন।" ঠাকুর হেসে হেসে বললেন, "জানেন তো আমি নিয়মিত ব্যায়াম করি, আপনারা তিন চারজন আমার সাথে দৈহিক লড়াইতেও পারবেন না, আর অন্য দিকে এখন বাদ থাক, হাত গুটাচ্ছেন কিনা, তাই একটু বললাম। আপনার শক্তিকে যেন আগেই কেউ গ্রাস ক'রে ফেলেছে, বাহাদুরির কোন দৌড়ত্ব নেই।" সে বললো, "বেশ তো, বলুন আপনার কি কথা ?" বেশ রাগ রাগ ভাবে কথা বলতে চাইছে। ঠাকুর তখন বললেন, "দেখো, তুমি কথার বাড়াবাড়ি করছো,

কার্য্যে কিন্তু তুমি লেংটা, পকেট তোমার খালি। কাল তুপুরে যে তুমি হস্ত-মৈথুনে ব্যস্ত ছিলে, একটা মেয়েকে চিন্তা করছিলে সেই সাথে—এই তো তোমার দৌড়ত্ব। বল, এও না করবে নাকি? খালি হাতে যুদ্ধ আর বিশেষ কি হবে? কোঁদাকুঁদি—অঙ্গেই তার মারামারি।" ক্রমশঃ ক্রমশঃ তার সার্টের গুটানো আস্তিন নেমে আসছে—সুর অনেক নম্র। ঠাকুর বললেন, "বল, তোমার কি বলার আছে? আরো বলবো তোমার কিছু কথা?" তখন সে ছিল টুলে বসা, নীচে নেমে বসলো। চুপচাপ হয়ে বসে আছে কোন কথা বলছে না। সঙ্গে যে আর তুজন আছে তারা দেখি ওকে উসকাচ্ছে। ঠাকুর দেখলেন যে; ওদের উসকানি একটু বন্ধ করা দরকার। ঠাকুর বললেন, "কি হে, তোমাদেরও তো সেই গলদ রয়েছে। বোনের উপর অত্যাচার, এও কি পোষাকের মধ্যে পড়ে নাকি?" "না, না, না," বলছে। ঠাকুর বললেন, "এখনও সুরে আছ? মাথা একেবারে তো গরম হয়েছিল, মনে নেই বুঝি, ঔষধ কোথায় পাওয়া যায় তাই খুঁজ্ছিলে। হঠাৎ মুক্ত হয়ে যাওয়াতে তুমি রেহাই পেলে। সেই কম্প তো দেখছি এখনও রয়েছে।" হঠাৎ বলে ফেললো, "আপনি কি করে জানেন?" ঠাকুর বললেন, "নতুবা জানি কি ক'রে?" তখন সে অন্যায় স্বীকার করলো এবং মৈথুনবাবুও তার দোষ স্বীকার করলো। আর যিনি ভজনে রত ছিলেন রতিতে, আমরা তার নাম দিলাম 'ভজনানন্দ'। খুব রগড়ের ভেতর দিয়ে এসব গুরুতর জিনিষগুলোকে সহজ করে ঠাকুর হালকা করে দিলেন। কারণ অল্প বেশী সকলেই দোষগুণ মিশ্রিত কিনা তাই। ঠাকুর সাধারণতঃ এ রকম বেইজ্জৎ কাউকে করতেন না, তবে মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে তাদের বড় বেশী তুর্ভোগ ভুগতে হতো। এরূপ মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেই তাদের জন্যে উপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করতেন। কথায় আছে, 'যেমন কুকুর তেমন মুগুর'

—প্রয়োজন বিশেষে তার দরকার হয়। তবে একটা সুবিধা আছে, ঐ জায়গায় খোলাখুলি সব বললেও কারো সম্মানের লাঘব হয় না।

তারপর দিন ঐ ছেলেরা এসে দীক্ষা নিয়ে গেল, আর আমরা তো আসন ফুল নিয়ে আছিই।

—

আঠারো

একদিন ঠাকুর কোন এক নিরিবিলি জায়গায়* একটু বিশ্রামের জন্য গেলেন, যদিও বিশ্রাম কোনদিন তাঁর আমরা বড় বেশী দেখেনি। কিন্তু এখানে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ঠাকুরের উপস্থিতির সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো। এখানেও আস্তে আস্তে অনেক লোক আসতে লাগলো। এর মধ্যে একদিন ঠাকুরের উপস্থিতির সংবাদ পেয়ে কয়েকজন ভদ্রলোক একটি উন্মাদিনী স্ত্রীলোককে নিয়ে এসে উপস্থিত হলো। এক-এক ক'রে অনেকেই যার যার ব্যক্তিগত আলাপ ঠাকুরের সাথে সেরে নিলো। আবার কেউ কেউ ঠাকুরকে প্রণাম করে চলে গেল। ঠাকুর ঐ স্ত্রীলোকটিকে ডাকালেন। দু'তিন জন ধরাধরি ক'রে মহিলাটিকে ঠাকুরের নিকট নিয়ে এলো। ভদ্র-মহিলার বয়স আনুমানিক চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হবে। মহিলাটি ঠাকুরের নিকটে এসেই তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, "তোকে না Burmaতে দেখেছি? কেমন আছিস্? ভাল আছিস্ তো?" একটু হাসি-হাসি মুখে ঠাকুরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। এভাবেই মহিলাটি তার প্রথম সম্ভাষণ ঠাকুরকে জানালো। ঠাকুরও ঠিক তেমনিভাবে মহিলাটির কথা সাদরে গ্রহণ করলেন এবং উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, ভাল আছি। তুমি ভাল আছো তো?" মহিলাটি ঠাকুরকে

---

* নারিন্দা, ঢাকা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ :—ভূপেন রায়, নৃপেন রায়, শান্তিদাস মজুমদার, বারীন ঘোষ, যদু রায়।

জিজ্ঞেস করলো, "তুই নাকি আমাকে ভাল করবি শুনলাম! আমি কি আর ভাল হবো? কেউ আমাকে ভাল করতে পারবে না।" মহিলাটি ক্ষণে উন্মাদিনী, ক্ষণে ভাল, ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কাঁদে—এ এক অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়েমানুষ। তার ছেলেমেয়েরা তাকে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা কেউ ধূপ জ্বালাচ্ছি, কেউ ঠাকুরকে বাতাস করছি, কেউ কেউ লিখছি, আবার অনেকে বসে বসে শুনছি। এদিকে আমাদের কারো কারো বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় অনুপস্থিতির দরুণ প্রায় খতম হওয়ার উপক্রম হয়েছে; সেইজন্য ঠাকুরের কাছে মাঝে মাঝে গালিও খাচ্ছি। আমাদের সাথে একজন 'পেন্‌সন্' প্রাপ্ত ভদ্রলোকও* আছেন। ঠাকুর তাকে ডেকে বললেন, "একটা কাজ কর, তুমি একটা মাদুলি নিয়ে এসো এবং এই ফুলটি ওর মধ্যে ভরে দেও।" এই বলে ঠাকুর ঐ ভদ্রলোকটির হাতে একটি ফুল দিলেন। ভদ্রলোক ফুলটিকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন এবং কিছুক্ষণ বাদে ফুলটিকে মাদুলিতে ভরে মুখটা মোম দিয়ে বন্ধ ক'রে নিয়ে এলেন ও ঠাকুরের হাতে দিলেন। ঠাকুর মাদুলিটিকে নিজের হাতে নিলেন, তারপর মহিলাটিকে ডেকে তার হাতে দিয়ে বললেন, "আমি তোমার এমন কিছু পাচ্ছি না যার জন্য তোমার অন্য কোন শক্তির প্রয়োজন; তোমার যেরকম পাগলামি হালকা, medicineও হালকাই দিচ্ছি। কিন্তু medicineটা একমাত্র কার্য্যকরী হবে, যদি তুমি সতী বলে গণ্য হয়ে থাক। অসতীর পক্ষে এটা কার্য্যকরীতে আসবে না।" এরপর ঠাকুর এ কথাটার মর্ম্মার্থ মহিলাটির সাথের লোকজনকে ডেকে বুঝিয়ে দিলেন। তিনি আরো বললেন, "এটা psycological treatment করলাম, তোমরা জেনে রাখ। কারণ এটা যদি কার্য্যকরী না হলো, তখন যাতে মায়ের উপর তোমাদের খারাপ ধারণা না হয়, সেজন্যই আগে থেকে সকল clear ক'রে বুঝিয়ে

* যদুনাথ রায়।

দিলাম।” হঠাৎ মহিলাটি মাদুলিটিকে হাতে নিয়ে একটু বেশ যেন চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অবশেষে তাকে নিয়ে তার আত্মীয়স্বজন সবাই ঠাকুরকে প্রণাম ক’রে চলে গেল। এর প্রায় সাত-আট দিন পর, ঠাকুর তখন ঐ বাড়ীতেই আছেন, হঠাৎ ঐ ভদ্রলোক যে মহিলাটিকে নিয়ে এসেছিলো, সে এসে ঠাকুরকে জানালো যে তার আত্মীয়াটি সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এখন আর তার কোন পাগলামি নেই। ঠাকুর একটু হেসে বললেন, “না ধরে তো উপায় নেই, ঔষধ তো কাজ করবেই। অসতী যাতে না হয়ে পড়ে, তার চিন্তাতেই ওর পাগলামি বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে।” তিনি আরো বললেন, “যে ভাবেই হউক শক্তিকে নানাভাবেই প্রকাশ করা যায় এবং প্রত্যেকটি treatment শক্তিরই প্রকাশ। যেই পদ্ধতিই হউক, যেই ভাবেই যাক, চিন্তাশক্তিরই পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। শুধু বুঝে বুঝে কাজ করে যাওয়া—ক্ষেত্র বুঝে বীজদান।”

ঊনিশ

গ্রীষ্মের ছুটি আরম্ভ হয়েছে। ঠাকুরের স্কুল বন্ধ। এক ভক্ত* ঠাকুরকে কয়েকদিনের জন্য এখানে নিয়ে এলো। একদিন আমরা† সাত-আট জন মিলে ঠাকুরকে বললাম, "এখানে বহু পৌরাণিক মূর্ত্তি আছে, ঐ সব দেখে আসবেন চলুন।" তিনি সাধারণতঃ কোন মন্দির ইত্যাদিতে যেতেন না। যদি কেহ নিয়ে যেতো, তবে আপত্তি করতেন না। তিনি প্রত্যেক মূর্ত্তির মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে চলতেন। তিনি সাধারণতঃ আমাদের মূর্ত্তি-পূজা আড়ম্বর ইত্যাদিতে মনোনিবেশ করতে উপদেশ দিতেন না এবং যদি কেউ করতে চাইতো, তিনি তাহাতে আপত্তিও করতেন না; তবে মর্ম্মার্থ বলে দিতেন ও পৌত্তলিকতার সম্পর্কে বুঝিয়ে দিতেন। পৌত্তলিকতা self যে art, তা তিনি বুঝিয়ে দিতেন; artএর পূজা তিনি সব সময় সমর্থন করতেন। নিজে ব্যক্তিগতভাবে ঐগুলো আরাধ্য হিসাবে গ্রহণ করতে ও পূজা করতে তিনি উপদেশ দিতেন না, এবং কেউ করলে তাহার মূল তত্ত্বটি বুঝিয়ে দিতেন, কিসের জন্য করে তার মূল তত্ত্বটা বুঝিয়ে দিতেন। আমরা ভেতরে ভেতরে চিন্তা করলাম তাঁকে এক মন্দিরে নিয়ে যাবো। এই প্রথম এখানে আসা হয়েছে। আমরা ভেতরে ভেতরে ঐ চিন্তা ক'রে তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। তখন এই সহরের

---

* নলিনী চৌধুরী।

† সত্যভূষণ রায়, রামানন্দ রায়, রবি ঘোষ, ভূপেন রায়, শান্তিদাস মজুমদার, দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী (২), বারীন ঘোষ, অজিত ভট্টাচার্য্য।

কোথায় কি আছে ভালমত তাঁর জানা নেই। আমরা ঘুরতে ঘুরতে কালীমন্দিরে গিয়ে পৌঁছলাম। নানাজায়গা দেখাবার কথা বলে তাঁকে আমরা নিয়ে এসেছি। আমরা সোজা ভেতরে চলে গেলাম। আমরা নীচে সব পাদুকা রাখলাম, সাথে সাথে ঠাকুরও পাদুকা রেখে দিলেন। লোকের ভিড়। ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, "এত ভিড় কেন ?" আমরা বললাম, "দেখবার জন্য এত লোক আসে।" ইচ্ছে করেই এ সম্বন্ধে তখন আর বিশেষ কিছু বলিনি। তাঁকে আগে ছেড়ে দিয়েছি, আমরা পেছনে পেছনে আছি। তিনি লোকের ভিড়ের সাথে সাথে একেবারে মন্দিরের ভেতরে পৌঁছলেন। যাওয়ার সময় যেখানে যেখানে যা যা চেয়েছে, তা তা দিয়েই তিনি ঢুকলেন। সেখানে গিয়ে ঢুকে দেখলেন কালীমূর্ত্তি। তিনি ফিরে ফিরে দেখছেন আমরা আছি কিনা। আমরা কিন্তু সব লক্ষ্য করতে আরম্ভ করেছি। তিনি মূর্ত্তির কাছে গিয়ে মূর্ত্তিটিকে হাত দিয়ে ধরে দেখছেন, তাঁর কাপড় টেনে দেখছেন, হাত ধরে দেখছেন। এত ভিড়ের মধ্যে তিনি পড়েছেন যে তিনি আর কাউকে ডাকতেও পারছেন না। তিনি স্বাভাবিকভাবে মূর্ত্তিটিকে দেখতে আরম্ভ করেছেন, এমন সময় একজন পাণ্ডা ঠাকুরকে পেছন থেকে খুব গালাগালি করছে, "বংশ নির্ব্বংশ হবে, তোমার সর্ব্বনাশ হবে, তুমি মা'র জিহ্বা ধরেছ ? মা'র গায়ে হাত দিয়েছ ?" আরো সব বলে যা-তা ভাবে গালাগালি করতে আরম্ভ করেছে, ঠাকুর ওর গালিগালাজ সব শুনছেন আবার এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছেন। তাঁর কাজ তিনি আপনমনে করে যাচ্ছেন, এদিকে গালাগালির মাত্রা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। পেছন থেকে এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক ঠাকুরকে বলছেন, "আপনাকে গালি দিচ্ছে।" ঠাকুর বললেন, "আমাকে !" মাড়োয়ারী ভদ্রলোক বললেন, "দেখুন না।" ঠাকুর চেয়ে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকে বলছেন ?" পাণ্ডা বললো, "হ্যাঁ মশায়, আপনাকে। আপনি মা'র জিহ্বা ধরেছেন, মা'র

৭

গায়ে হাত দিয়েছেন।” ঠাকুর বললেন, “হঠাৎ আমার উপরে এ বর্ষণ কেন?” পাণ্ডা বললো, “কি করেছেন খেয়াল নেই?” ইতিমধ্যে আমরাও একটু এগিয়ে এসেছি। ঠাকুর বললেন, “আমি তো দেখেছি মাত্র, আমি তো এগুলো নিচ্ছি না। এত গালি দেবার কি আছে?” পাণ্ডা বললো, “জানেন স্বয়ং মা? তাঁর জিহ্বায় হাত দিয়েছেন!” ঠাকুর বললেন, “মা কোথায়? এখানে জিহ্বা সোনার, আর মূর্ত্তি ‘পাত্থর হ্যায়’। আর মূর্ত্তিটা ঠিক মাটির না পাথরের এটাকে খুঁচিয়ে লক্ষ্য করছি, আর জিহ্বাটা আলাদা কেন দেখছিলাম। মনের সন্দেহ ঘুচাবার জন্য যদি কিছু করি, তবে আপনার কি? আমি তো আসার সময় পয়সা দিয়েছি। এই ভদ্রলোকটি যে ফুল বেলপাতা ছিটালো তাতে তো আমি অসুবিধা মনে করিনি। আপনি তাকে তো গালি দেননি। তার চেয়ে তো আমি অল্প খুঁচিয়েছি, সে তো কতকগুলো বিল্বপত্র ও ফুল ছিটিয়েছে, এর চেয়ে চোট অনেক বেশী লেগেছে। তাদের গালি দিয়েছেন? আমি তো হালকার উপর স্পর্শ করেছি।” পাণ্ডা বললো, “তারা তো পূজো কোরছে।” ঠাকুর বললেন, “তবে আমি কি ঠাট্টা করছি? তামাসা করছি? আমি আমারটা দেখছি, করছি, তারা তাদেরটা করছে।” পাণ্ডা বললো, “মা’র কি জিহ্বা ধরতে হয়? এ যে পীঠস্থান।” ঠাকুর উত্তর দিলেন, “সেইজন্যই তো পাঠ করতে এসেছি।” পাণ্ডা বললো, “আপনি ফুল বেলপাতা দেননি কেন?” ঠাকুর বললেন, “জানা থাকলে নিয়ে আসতুম।” পাণ্ডা বললো, “আপনি জানেন না, এটা কালীমন্দির?” ঠাকুর বললেন, “এখন বুঝলাম। আপনার যা চেহারা দেখছি তাতে তো সাংঘাতিক মনে হচ্ছে।” পাণ্ডা বললো, “জানেন, আপনার বংশ নির্ব্বংশ হবে? হিন্দুঘরের ছেলে আপনি,—আপনি জানেন না মন্দিরের নিয়মকানুন? আপনার বাপ-মার শিক্ষা কেমন?” ঠাকুর

বললেন, "শিক্ষা ঠিকই আছে। আপনার কাছে অস্বাভাবিক লাগাটাই যে স্বাভাবিক, এই চেহারায়ই তা ফাঁস করছে।" পাণ্ডা তারপরও বাপ-মা নিয়ে কথা বলছিলো। ঠাকুর তখন আমাদের বললেন, "ওকে একটি চড়া কথা বলা দরকার নতুবা দমন হবে না।" এই বলেই পাণ্ডাকে বললেন, "পাণ্ডু, মুখ সামলে কথা বল।" পাণ্ডা বললো, "কেন মুখ সামলে কথা বলবো? আপনার মত এমন কেউ করেনি, জানেন? এ স্বয়ং মা, হাজার হাজার বছর যাবৎ পূজো হয়ে আসছে।" ঠাকুর বললেন, "আপনার মত অসংযতপূর্ণ কথাও কেউ বলেনি। যার মাত্রা নেই, মাতৃত্ববোধ নেই, ব্যবসাবোধে যে বোধ রয়েছে, আর লম্বা লম্বা কথা আছে। মাকে মুখে মা বলছেন, কিন্তু সাজিয়ে রূপ দেখিয়ে পয়সা রোজগার করছেন। ঢুকতে পয়সা, ছুঁতে পয়সা, চরণামৃতে পয়সা, আর কিসে কিসে আছে তাতো জানি না—যতটুকু পেলাম ততটুকু বললাম। এই শাড়ী পরিয়ে পয়সা রোজগারের ফন্দি, এখানে আবার মা ফুটাচ্ছেন, মাতৃত্বের তো কোন লেশই নেই। তাই বলছি বেশী বকবক করবেন না।" পাণ্ডা বললো, "জানেন, আপনি নির্ব্বংশ হয়ে যাবেন?" ঠাকুর বললেন, "আমি নির্ব্বংশ হই বা না হই, তাতে আপনার কি? আমি আরো খোঁচাবো, নির্ব্বংশ হলে আমার হবে। তাতে আপনার কি? আপনি কথা বলবেন না। অধিকার যখন সকলেরই রয়েছে, আমি দেখবো তন্ন তন্ন ক'রে। যারা সাজিয়ে পয়সা নেয়, তাদের বৃত্তি যে কতটুকু হীন, তার পরিচয় দিচ্ছেন আপনিই। একমাত্র শুনেছি, 'কুচনী' পাড়ায় এই জাতীয় সাজিয়ে সাজিয়ে পয়সা নেয়—ঢুকতে পয়সা, নৃত্য দেখতে পয়সা, তবলা বাজাতে পয়সা। ক্রমশঃ ক্রমশঃ এই জাতীয় অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য ক'রে তুলেছেন, সুতরাং কতটুকুনু বৃত্তি তা চিন্তা ক'রে বলুন।" তখন ঐ মাড়োয়ারী ভদ্রলোক ঐখানেই ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে বললেন, "মা'র নিকট এ জাতীয়

কথা কেউ বলতে পারে, আমি এই প্রথম দেখলাম।" অনেকেই শুনে অবাক্ হলো। আমরা ঠাকুরকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। বেরিয়ে আসার সময় আমরা তাঁর পরিচয় দিলাম এবং বললাম, "পৌরাণিক মূর্ত্তি দেখবার জন্য এই প্রথম তিনি এলেন, এদিক্কার সম্পর্কে তিনি মোটেই কিছু জানতেন না। আমরা তিনি কি করেন শুধু এটুকু দেখবার জন্যই তাঁকে নিয়ে এসেছিলাম। আমাদের কথার উপরে তিনি পৌরাণিক মূর্ত্তি হিসাবে এই মূর্ত্তিকে নাড়াচাড়া করেছেন।" ঠাকুর বাইরে এসে আমাদের খুব গাল দিতে লাগলেন, "তোমরা আমাকে কিছু বলনি, এভাবে ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি। আগে বললে আমি সব সামলে নিতাম। এইতো তোমাদের যা চেহারা দেখে এলাম। এই জাতীয় শিক্ষা-দীক্ষায় জনগণ আর বেশী কি পাবে? কদর্য্যপূর্ণ ভাব হতে কদর্য্যই নিয়ে যাচ্ছে। মাতৃত্ব আর কতটুকুনু নিচ্ছে? সেই দিক্ দিয়ে প্রায় nil। যারা আবেগপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তারা, নিজেদের ব্যক্তিগত চিন্তাতে যতটুকু, ততটুকু তৈরী হয়ে আসছে। শিক্ষার বেলায় আমি তো সেখানে কিছু পেলাম না। যে ব্যবহার গিয়ে পেলাম, এই যদি constant মাতৃসঙ্গের ব্যবহার হয়, তবে এ তো মায়ের তুমুর্ষে সন্তান।" তাই তিনি আমাদের বললেন, "দেখ, এই সমস্ত মূর্ত্তির কারণ ছিল। সমাজে, আবহাওয়াতে, দেশে, কালে সেই জাতীয় শিক্ষার বন্দোবস্ত আজকালের মত ছিল না। তাই এই সমস্ত মূর্ত্তির ভেতর দিয়ে সমাজকে শাসন করতেন, সমাজকে শাসন করা হতো। মূর্ত্তির সূক্ষ্মতা art সম্পর্কে শিখাতেন, সেই artএর সাথে সাথে বহু art জেগে উঠতো—এ শুধু গুণেরই পূজা। এই গুণেরই যাতে বিকাশ হয়, তার জন্যই এসব আনুষঙ্গিক। এটাকে সংস্কারের ভেতর রেখে দিয়ে ঐগুলোকে জীয়িয়ে রাখছে, যাতে সমাজের ভেতর প্রচলন থাকে তার জন্য পূজা, পার্ব্বণ ইত্যাদি দৈনন্দিন করার ব্যবস্থা। এক-একটা মূর্ত্তির কল্পনার ভেতর দিয়ে

সৃষ্টির রহস্যতাকে বিরাটের রহস্যতাকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। সেই ভাবে তন্ত্র, মন্ত্র, শাস্ত্র, গ্রন্থ. তৈরী হয়ে আসছে। উপকারিতা যথেষ্ট রয়েছে, উপকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ নেই। কিন্তু শাড়ী পরিয়ে 'ঢুল' দিয়ে এটাকে এখন dancerএ নিয়ে যে রোজগারের পথ করছে সেটাই আর এক জাতের রূপ দিচ্ছে কিনা, তাই অনুষ্ঠানের সব দিক্ দিয়েই অনুষ্ঠানের বৃদ্ধি পেতে থাকে। কি যশ, কি মান, কি অভিমান, কি অহঙ্কার, কি প্রতিষ্ঠা, কি অর্থ—সমস্ত দিক্ দিয়েই এটা বেড়ে যেতে থাকে। তখনই এসে দাঁড়ায় সম্মুখে অভিনয় এবং artificiality। সত্য হতে যখন চ্যুত হতে থাকে, তখন নিজে বেশ বুঝতে পারে, তা বুঝা সত্ত্বেও আবহাওয়ার balanceকে রক্ষা করবার জন্য নিজের যশকে বজায় রাখবার জন্য অনেক কিছু ছলের আশ্রয় নিতে হয়। যাহা বুঝে শুনেও সব-কিছু করতে হচ্ছে, সে সংস্কারে ঘা দিলে তখন হয় পরিহাসে পরিণত, না হয় শত্রুতায় পড়তে হবে। সংস্কারে বেশীর ভাগই এ জাতীয় influence করছে। তার জন্যই সংস্কারকে সম্পূর্ণরূপে বুঝে সরিয়ে দেওয়া ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, তবেই প্রকৃত রূপ সম্মুখে বেরিয়ে আসবে।" এখানকার জের আমাদের উপর দিয়ে কিছু নিলেন, আমরা চুপ করে শুনলাম।

কুড়ি

আমরা* বহুলোক বসে† আছি। ঠাকুর আলাপ করছেন, "দেখ, আমরা যে-সব কাজকর্ম্ম করছি, প্রত্যেকটিরই একটি action হয়ে তার reaction হচ্ছে। আজ বাইরের ব্যাপার হতে যে খাদ্য সংগ্রহ ক'রে চর্ব্বণে গেলার অবস্থায় উদরস্থ করছি, সাধনা সে পর্য্যন্তই। চর্ব্বণে লালামিশ্রিত হয়ে সুচিন্তায় ও চক্ষে দেখে একটা ভাজার কড়কড়িতে যে তৃপ্তি সুঘ্রাণ ও এ সমস্ত খাদ্যের সহযোগিতারূপে এবং সে অনুযায়ী glandএর রসের সংমিশ্রণে এবং জিহ্বার স্বাদে সমস্ত অবস্থা সংমিশ্রিত হয়ে যে উদরস্থ হল, সেখানে ফেলে দিয়ে তারপর সেখানকার সহযোগিতায় যার যার জায়গায় গিয়ে যার যার পরিচয় দিতে আরম্ভ করলো— এই ভাবে শরীরের বৃদ্ধি সাধনার দিক্ দিয়ে মন-সংযমের দিক্ দিয়ে, কিংবা ধ্যান, ধারণা, জপ, তপ যা-কিছু ঠিক এমনি ক'রে ক'রে যাওয়া হচ্ছে; আসন, মনঃসংযম, ধ্যান, ধারণা এমনিভাবে করে যাচ্ছে এবং মনের একাগ্রতাকে আয়ত্ত করার জন্যে দেখা যাচ্ছে প্রয়োজনের তাগিদেই প্রত্যেকে প্রত্যেকের একটা রূপ

---

* ভুপেন রায়, শান্তিদাস মজুমদার, উপেন সেন, ভুপেন ঘোষ, দক্ষিণা মোহন ঠাকুর, সত্যেন রায়, বিরাজ দত্ত, নরেন মল্লিক, খগেন মল্লিক, শান্তি ব্যানার্জ্জি, অমৃত লাল ব্যানার্জ্জি, দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী(১), দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী(২), সুধীর সোম, সুরেন বসু, বারীন ঘোষ, অজিত ভট্টাচার্য্য আরো অনেকে।

† স্বামীবাগ, ঢাকা।

দিচ্ছে—সেই সমস্ত নিয়ে এই সমস্ত মনের কার্য্যকলাপ, সূক্ষ্মতা, একাগ্রতা। যখন আমি ঘুমন্ত এবং সমাধিস্থ অবস্থায় নিজেকে শায়িত ক'রে ফেলি, এই যে সাধন বস্তু ইত্যাদি যা-কিছু ঐ সমাধিতে যেন উদরস্থ হচ্ছে, মানে, এই সমস্ত জাগ্রত অবস্থায় যে সমস্ত কার্য্যকলাপ যা-কিছু ঠিক যেন ঐ সমস্ত চর্ব্বিত হয়ে চর্ব্বণ ক'রে ক'রে রসের সংমিশ্রণে মিশ্রিত হয়ে ঐ সমাধিস্থ অবস্থায় যেন উদরস্থ হলো, এবং তারই sharp পরিচয় দিচ্ছে স্বপ্নের ভেতর দিয়ে, স্বপ্নে যেমন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্য্যকরীর মত কাজ করে যাচ্ছে, আমি বাস্তবে যে সমস্ত কাজ করলাম। আমি উদরস্থ হয়ে রক্ত-সঞ্চালনের মত কাজ করে যাচ্ছি—কি vanishing, কি উড়ে যাওয়া, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমার মনের সাথে সাথে কার্য্যের উপকারিতা পাচ্ছি এবং মনের একাগ্রতার পরিচয় পাচ্ছি বহু রকমে, বহুভাবে সেখানেও নানারকম পরিচয় পাচ্ছি; সেখানেও ধ্যান, ধারণা, নানারকম আনুষঙ্গিক পেয়ে সেই অবস্থায় চর্ব্বিত অবস্থার মিশ্রণে যখন 'আমি' সমাধি হতে জেগে উঠলাম জাগরণরূপ সমাধিতে, সেখানে উদরস্থ হয়ে আবার দীপ্তিমানের মত উদয় হয়ে হয়ে যেমন আলোর বিকাশ করতে আরম্ভ করলো, তাই একবার নিচ্ছি আবার ছাড়ছি। খাওয়াতেও যেমন, মনের সংযমেও তেমন, সাধনাতেও তেমন, প্রকারান্তরে সব-কিছুতেই এক জাতীয় সাধনা চলছে, মনের সংযমে এক জাতীয় পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে; এই দ্রুতগামীর দ্রুততা এক জাতীয় রূপে রূপান্তরিত হয়ে উদরস্থ হয়ে হয়ে কতরকম পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে—শুক্র, রক্ত, ঘর্ম্ম ইত্যাদিতে সমস্ত কিছু পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে পরিবর্ত্তিতের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। খাদ্যের চেহারায়, রক্তের চেহারায় অনেক তফাৎ—সেও একটা রহস্য। ঠিক তেমনি রহস্য আজ বিরাটকে সম্পূর্ণরূপে জানা, তারই পথঘাট স্বপ্নবৎ উদরস্থ হয়ে সমাধিতে উদরস্থ হচ্ছে, স্বপ্নবতের স্বপ্নের ভেতর

দিয়ে যেমন উদরস্থ হয়ে কার্য্য করে যাচ্ছে, রক্ত ইত্যাদির ভেতর দিয়ে তেমনি স্বপ্নবৎ হয়ে করে যাচ্ছে। বিরাটকে জানা কিংবা মনকে যে ভাবে প্রসারিত করে দেওয়া জাগরণরূপে মানে বাইরের আবরণখানিতে, ঠিক স্বপ্নবৎ হতে সমাধিস্থ হতে ঠিক জাগরণবৎ রয়েছি সেই রূপের ভেতর—ক্রমশঃ কার্য্যকরী হতে থাকে আমার রূপের ভেতর দিয়ে, আমার কার্য্যের ভেতর দিয়ে; তাই এ সমাধিস্থ অবস্থা এবং তার পরবর্ত্তী অবস্থার প্রয়োজন রয়েছে সেই বিরাটকে বোঝবার জন্য। এই মনের সংযমতা, এই একাগ্রতা—সমাধিস্থ হয়ে যখন শায়িত হয়ে থাকি, তখন মনের একাগ্রতা চর্ব্বিত অবস্থায় উদরস্থ হয়ে মনের কার্য্যবিধিগুলো অণিমার অণুরূপে পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। বাইরে ঠিক যেমন উদরস্থ হয়ে বাইরে তার কার্য্যকরীতে পরিচয় দিচ্ছে ঠিক রক্তাকারে, তেমনি সেই বৃদ্ধিগুলোকে সেই জাতীয় অবস্থাকে, ঠিক যেমন জাগ্রত অবস্থাকে, তার শক্তির বিকাশে বহুভাবের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে; তাকে যখন সেই অবস্থা করে নেওয়া হবে তখন জাগ্রত রূপও স্বপ্নবৎ হবে। স্বাস্থ্যকর food পরিচয় দেবে তোমার সুস্থতার প্রকাশে,—প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট রয়েছে। তাই এই যে অজানার মাঝে রয়েছি, এটাও একটা ঘুমন্ত অবস্থা। অজানার প্রয়োজন রয়েছে জানার জন্য, অজানাটাও এক জাতীয় সমাধি অবস্থা। সুতরাং অজানাটা – প্রয়োজনের তাগিদে আগমন বিরাটে যাওয়ার পথে জ্‌নার পথে তার সঙ্গে লড়াই করার জন্য। জানার জন্য, সঙ্গত করার জন্য, নিজেকে গড়বার জন্যই অজানার প্রয়োজন। এই অজানারূপ যে নিদ্রিত অবস্থা, জানবার প্রয়াসে যে ব্যগ্রতা, যখন কার্য্যকলাপ সব-কিছু এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়, এ রকম একটা stomach জাতীয় কার্য্যকলাপ হয়ে ঠিক যার যার বিভিন্নরূপে রূপান্তরিত ক'রে রূপ দিয়ে যাচ্ছে। অজ্ঞানতা

সেখানে এসে দাঁড়ায়. বাসী পচা খোরাকেতে, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যে তা যেমন, সেটা হলো মাত্রার যতটুকু—অতি মাত্রায় যাওয়াটাই হচ্ছে অসংযমতার মধ্যেই পৌঁছা। সুতরাং এই জাতীয় সমাধিস্থ অবস্থা প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে maintained করা হচ্ছে ধাতস্থ করার জন্য, ধাতস্থে আনার জন্য। তাই স্থিতিমান ধীমানের পরিচয় দিচ্ছে তন্ময়তার মাঝে—তন্ময়তা এক জাতীয় সমাধিস্থ অবস্থা। মৃত্তিকা আর বীজ দুটোই যেন নিষ্প্রভ অবস্থা, কিন্তু দুইয়ের সম্মিলনে বৃক্ষের পরিচয় দিচ্ছে; এর মধ্যে এত কিছু রয়েছে যে তা মিলনের মধ্যেও যেন বিভিন্নতার পরিচয় দিচ্ছে। একই মৃত্তিকাতে বহুরকম বীজে বহুরকম উদ্ভিদ্ সৃষ্টি—সেখানেও বহুরকম শক্তির প্রকাশ করে যাচ্ছে। ঠিক এই সমাধিস্থ অবস্থা হচ্ছে কিংবা একটা অজানিত অবস্থায় একটা মৃত্তিকা-রূপ কার্য্য করে যাচ্ছে। তার মধ্যে যখন যা-কিছু এসে বীজ পড়ছে—ভাল, মন্দ, জপ, তপ, ধ্যান, ধারণা ইত্যাদি যাবতীয় যা-কিছু একই মৃত্তিকা হতে সব-কিছু বিকাশ করছে, যার যার রূপকে পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে,—এ হলো আক গাছ, এ হলো নিমগাছ, এ হলো খেজুর গাছ। এ শায়িত অবস্থা, সমাধিস্থ অবস্থা এই অজানা অবস্থায় নিজে ঘুরছে, বেড়াচ্ছে, নিজে বুঝতে পারছে, নিজে নিজে ঘুরছে। তোমাকে এমনি করে শায়িত করে ফেলেছে, তুমি স্বপ্নে নিজেকে দেখছো, এত বছরের এই যে বার্দ্ধক্যতা......* বার্দ্ধক্যতা তোমায় শিশুবৎ করে নিচ্ছে, তোমায় আবার পাঠশালায় নিচ্ছে, নির্দ্দিষ্ট জায়গা হতে অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে তোমাকে, তুমি বুঝছো না, নিজকে হারিয়ে ফেলছো, বুঝতে বুঝতে না বুঝার অবস্থাটা সামনে ফুটিয়ে তুলছে; এত speedএ চলছে work যে বার্দ্ধক্য অবস্থাতেও তোমাকে ঐ জাতীয় অবস্থায় নিয়ে ফেলছে।

---

* বাদ পড়েছে।

এই যে মনে পড়ার অবস্থাটা, এটা কিছুই নয়। তোমায় আবার শিশু করতে পারি; তুমি যে M. A. পাশ, তোমায় আবার পাঠশালায় পাঠাতে পারি। বুঝতে বুঝতেও এমন অবস্থার সৃষ্টি করছে যে, ভুলে গেছে যে আমি শিশু নই; জেগে মনে পড়ছে যে আমি বৃদ্ধ,—এ শক্তির দ্বারাই সম্ভব হচ্ছে। তুমি সেই শক্তিকে যদি এনে ধরে রাখতে পার, তবে তুমি আবার শিশু হতে পার, যে কোন অবস্থা হতে পার,—বিভূতি সেখানেই দাঁড়িয়ে যাবে; তার কারণ, পরিচয় দিচ্ছে প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কি স্বপ্নে কি জাগরণে বহু রূপের মধ্যে। তাই তোমরা নিজেরা কাজ করে যাবে, প্রাণপণ নিজেরা চেষ্টা করে যাবে; প্রয়োজনের তাগিদে যে ক্রিয়া তার বিকাশ আপনি আপনিই হয়ে যাবে, ভাববার তোমার প্রয়োজন নেই। শুধু এই ভাববে, এই খাবার তোমার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য, এই কাজ শুধু সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ঠিক বিকাশ যার যার কার্য্যের প্রয়োজনে প্রয়োজনে হয়ে যাবে—তুমি শুধু থাকবে স্মরণের পথে, স্মরণ ক'রে ক'রে এগিয়ে যাবে।"

একুশ

একদিন আমরা* বসে বসে ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করছিলাম। ঠাকুর ধীরে ধীরে আমাদের সব বুঝাচ্ছেন। এমন সময় কয়েকটি সম্প্রদায় হতে কয়েক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁরা ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করলেন। ঠাকুর তাঁদের বসবার জন্য বললেন। তাঁরা দু'একটি প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। ঠাকুর বললেন, "প্রশ্ন জবাব দেওয়ার আগে কতকগুলো বিষয় জানানো দরকার, কারণ এরকম অনেকের সঙ্গে আলাপ করেছি, তারা প্রকৃত মর্ম্মার্থ না বুঝে ভ্রান্তি স্থাপন ক'রে আঘাত পেয়ে চলে গেছে। তাই মনঃক্ষুণ্ণ হওয়ার আগেই আমার বক্তব্য শোনা দরকার। যুক্তির ব্যাপারে যেন আন্তরিকতা নষ্ট না হয়। কোন ত্রুটি আমার দৃষ্টিতে আস্‌লে না বলে থাকতে পারি না—এটা আমার ধাত, এটা শুধু আক্কেল দেওয়ার জন্য যে বলা তা নয়। যুক্তির কাঁটাতে আমি কাউকে ছাড়ি না, নিজেকেও ছাড়ি না, তবে আমি জানবার প্রয়াসী। কার কি মতবাদ তাও জানবার চেষ্টা করি, কোন পন্থীতে কে এগিয়ে যাচ্ছে তাও জানতে চেষ্টা করি। ভদ্রতা অভদ্রতা সব-কিছুই আবহাওয়ায় বুঝে শুনে ক'রে যাচ্ছি, তাই স্পর্শহীন অবস্থাতেই সবটাতেই আছি। প্রয়োজনে স্পর্শে এনে আবার ছুড়ে ফেলে দি,

---

* রবি ঘোষ, ভুপেন রায়, নৃপেন রায়, পান্নালাল বোস, বারীন ঘোষ, শান্তি দাস মজুমদার, অজিত ভট্টাচার্য্য আরো অনেকে।

স্থান :—স্বামীবাগ, ঢাকা।

তা না হলে পেনায় ঘেরিয়ে ধরতে পারে, পেনাগুলো হচ্ছে সংস্কার জাতীয়। সংস্কারে ঘেরিয়ে ধরলে যেমন সংস্কারের ভেতরই মন হাবুডুবু খেতে থাকে, আবার হাবুডুবুই এগিয়ে যাওয়ার সহায়তা করছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—এই এক জাতীয় স্বীকার্য্য। খুব অস্বস্তিকর ব্যাপার কিনা, নাকে মুখে জল গিয়ে একটু সোয়াস্তির জন্য চেষ্টা করছে; যদিও চেষ্টার উদ্ভব এ হতে— সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যতটা হাবুডুবু না খেয়ে এগিয়ে যাওয়া যায়, তারাই হলো সব চেয়ে বুদ্ধিমান। সুতরাং এ হতে বুঝে শুনে বঞ্চিত হওয়ার তো কোন মানে নেই। তাই পাঁক হতে যাতে ফাঁকে থাকা যায়, তারই যে প্রচেষ্টা। পাঁক তখন নিজের ফাঁকেই ঘুরতে থাকে, তারপর সব পাঁকই যে ফাঁক হবে। যদি ওরকম একটা ফাঁদ তৈরী করা যায়, তখন পাঁকে আর কাউকে কিছু করতে পারবে না। এক জাতীয় মাছ আছে যে পাঁকেই থাকে, ওটাকেই সে সহজ ক'রে নিয়েছে, তাকে সে কিছু করতে পারে না; তার gland and parts এমনভাবে আটকে রেখেছে যে ওর পাঁকের গতিতে ওকে নড়াতে পারেনি। যেমন কর্দ্দমেতে একজাতীয় মাছ থাকে, ফাঁদের কার্য্য করে তারা slipperyতে, তাই এক ছিটা কর্দ্দমও তাকে স্পর্শ করতে পারে না। শুনেছি সাগরে এক জাতীয় মাছ আছে, যত টুকরাই করা যাক্ না কেন, সর্ব্ব অবস্থায় তার lifeকে maintain করছে, শত টুকরাতেও প্রত্যেকটিতে তার নিজস্ব পরিচয় দিচ্ছে পূর্ণ ভাবে। ঠিক শক্তিমান ব্যক্তি এভাবেই বাস্তবে সর্ব্ব অবস্থার সাথে জড়িত হয়েও নিজেকে ঐ অবস্থায় রাখে,—আলোচ্য বিষয় হলো সেখানে। মতের মিল হউক বা না হউক, আদত বস্তু হতে আমরা নড়চড় করবো না। রাস্তায় যাওয়ার পথে যত প্রকার সাহায্য পাওয়া যায়, সে সাহায্য সংগ্রহ করে যাবো নিজের সুবিধার্থে।" নাম-জপ সম্বন্ধে আলাপ হচ্ছিলো। তিনি প্রথমতঃ

বললেন, "Name is the name of sound of relief—শান্তির প্রতীকহিসাবে নামরূপ ধ্বনিকে মুক্তির অবস্থায় তন্ময়তার মধ্যে তন্ময়ে রেখে দেওয়া হয়েছে তার মর্ম্মার্থ বুঝে। নাম সর্ব্বত্র বিরাজমান। বস্তুর অস্তিত্ব ধ্বনিতে অবস্থিত ও শব্দ গুণে গুণবিশিষ্ট। বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, সর্ব্ব অবস্থার অবস্থাকে তন্ময়তার মাঝে তন্ময় রেখে বিকশিত করছে নিজেকে বহুরূপে নিজের রূপটিই যে প্রকাশ নামরূপকে আশ্রয় ক'রে আশ্রিতরূপে থেকে, তাই 'নামৈব কেবলম্'। সেখানেই নামের মহত্ত্বতে প্রকাশে ঐ নামে যে মহত্ত্বের defination দেওয়া রয়েছে, তার সম্পর্কে নানাবর্ণনা যে রয়েছে, ঐ নামযুক্ত শব্দ কেউ ব্যবহার করলে তখনই ঐ অর্থ-বোধটা মনে এনে চিন্তা ক'রে ক'রে এই সাংসারিক আবিলতা, ঝামেলা ইত্যাদি হতে যেন ঐ নাম-জপে একটা উপশমের কার্য্যকরী করে যাচ্ছে। সব-কিছুকে লাঘব ক'রে ক'রে ঐ জাতীয় চিন্তা মনে এনে নিজেই নিজেকে self satisfied করছে by name, by imaginary qualities of name। আমরা প্রকারান্তরে কি পাচ্ছি? বুঝটুকুনু নিয়ে নিজের মনের ভেতরে আলোড়ন ক'রে নিজের তৈরীতেই নিজের সৃষ্টি ক'রে ক'রে তৃপ্ততার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং প্রাথমিক অবস্থায় বা সংস্কারপূর্ণ অবস্থায় যাদের ঘেরিয়ে ধরেছে, তাদের জন্য এই medicine যথেষ্ট প্রয়োজন। তারপর যখন হজমশক্তি যথেষ্ট বেড়ে যাবে তখন হজমের আর ত্রুটি থাকবে না—সব-কিছুই খেয়ে হজম করা যাবে। আগেই পোলাও মাংস না দিয়ে, তাই মন্দ কি? একটু গড়ে উঠলেই সব দিক্ ঠিক। এখন গড়নের জন্যই নিজেদের গড়তে হবে, ঠিক কাঁদা মাটিতে মূর্ত্তিতে পরিণত করার আগটুকু পর্য্যন্ত যতটুকু পরিশ্রম, সুতরাং সাধনা সেখানে। তাই দিনরাত জপ, স্মরণ সেখানেই সাথে সাথে থাকবে। তারপর যখন স্মরণের ভেতর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, তখন নামের শব্দ আর থাকে না, তার গুণেই

চলে যাবে, সেটাই স্মৃতিতে থাকবে। যেমন গায়করা প্রথম অবস্থায় গাইতে গাইতে শেষ অবস্থায় গানের শব্দ আর থাকে না, তখন movementএর গতিতেই সুর, সেভাবে মাত্রা নিয়ে নিয়ে তবল্‌চীকে সাড়া দিয়ে যাচ্ছে, 'তুমি বুলাও, আমি যাচ্ছি'। ঠিক এও যে তাই সব জায়গায় সব সংস্কারকে বলে যাচ্ছে, জানিয়ে যাচ্ছে, নিজে সেই তালে তালে এগিয়ে যাচ্ছে। তবলহীন গান আলুনীর মত। মাত্রা উদ্ভব মাত্রা হতেই, তাই তালে তালে তাল দিয়ে যাচ্ছে নিজের তালকে মিশিয়ে। তাই সংস্কার তাল দিয়ে যাচ্ছে, সেই তালে সাধক এগিয়ে যাচ্ছে। প্রথম গান, তারপর তান, তারপর সুর--মিলন সেখানেই। তারপর তাও থাকে না, তাকিয়ে থাকার সাড়া শুধু।" কথা-গুলো সবাই শুনছে, আর আমরা বসে বসে লিখছি। সম্প্রদায় থেকে যারা এসেছেন তারা মনে হয় আনন্দই পাচ্ছেন। মাঝে মাঝে 'আহা, আহা' করে উঠছেন ভাবে পড়ে পড়ে। ঠাকুর আবার বলতে আরম্ভ করলেন, "এই অনুষ্ঠানগুলো সেই জাতীয়, সেই জাতীয় কার্য্য ক'রে যাচ্ছে,—সংস্কারও তাই। তাই যে যে পরিস্থিতিতে কার্য্য করছে, তার উপরে সে যেন কার্য্যটুকু ঠিক মত ব্যয় করে যেতে পারে, তাই হচ্ছে প্রকৃত কার্য্যের উপায়। পরিবর্ত্তনের দরকার আছে, মূল যদি থাকে স্বাস্থ্য রক্ষা, দেশ হতে অন্য দেশে গিয়ে মুক্ত বায়ু সেবনের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট থাকে। খনন করতে করতে জল তিনশত হাতেও পাওয়া যায়; যতই নদীর সম্মুখীন হবে, খননের মাত্রা কমেই যাবে। মরুভূমির দুষ্প্রাপ্যের মত অবস্থা হবে একদিন নিশ্চয়, আগ্নেয়গিরির ভয়ও তো থাকতে পারে, তাই পাইপটি ঐ proof ক'রে নিতে হবে, নতুবা গলে যাওয়ার ভয় আছে। পরিশ্রম ও অধিক পিপাসা যখন আছে, তৃষ্ণা যখন মেটাতেই হবে, তখন জাত-বেজাতের ভয় করে নিজের প্রাণকে বিনষ্টতার পথে এগিয়ে দেওয়ার কোন তো মানে নেই। গল্পে

শুনেছি—এক ব্রাহ্মণ, সে শূদ্রের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করতো না, আর যাতায়াত তো দূরের কথা। হঠাৎ মাঝের রাস্তায় তৃষ্ণার আবেগ হওয়াতে মাত্রা ক্রমশঃ ক্রমশঃ বেড়ে যাওয়াতে তখন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে 'জল জল' করছে। কয়েকজন নম জল নিয়ে উপস্থিত। এর মধ্যেও বলছে, 'কোন্ জাত?' বলছে, 'আমি নম'; তখন নমস্য করেই তৃষ্ণা মিটালো। বন্ধু যখন সেই সুতরাং তখনকার জন্য তো ব্রহ্মজ্ঞান হতে বাধ্য হয়েছে। তাই বস্তুতঃ তৃষ্ণা যদি এসে দাঁড়ায় তখন কোন কট্‌মট্ ও নট্‌খটি কোনটাতেই যে আট্‌কাতে পারে না, তৃষ্ণায়ই টেনে নিয়ে যাবে। ভরা পেটে সব খাবারই বিদ্বেষ লাগে, কিন্তু সেটা যে সাময়িক তা সে ভুলে যায়। কিন্তু এর মধ্যে বেশ সুন্দর জিনিষ রয়েছে, বিরাট তার নিজের রূপের কিছুটা প্রকাশ করছে 'ভরে' যাওয়ার ভেতর দিয়ে। আমি যখন ভরে থাকি, তখন সব হতে দূরে থাকি। যখন আমি চলে যাই, ভরার জন্য সবাইকে আনাই। এখন আমরা ভরবার জন্যই যাচ্ছি কিনা, তাই সব-কিছু আমাদের সাথের সাথী হয়ে যাচ্ছে। যেদিন পূর্ণেই যাবে, তখন সবই হবে। তাই এখন প্রশ্ন হলো, এ যে শূন্য হয়ে পূর্ণে যাচ্ছি; শূন্যই পূর্ণ, না পূর্ণই শূন্য? দু'ই এক, একেই দুই, তাই সাম্য। তাই আমরা রহস্যের মাঝে রহস্যকে নিয়ে আছি, সব-কিছুকেই নিয়ে আছি, নানাভাবে আলাপ-আলোচনা, প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তর সব-কিছুই চলছে।" তারা তৃপ্তি পেয়ে আবার আসবেন বলে চলে গেলেন। তারপর তিনি ভেতরে চলে গেলেন, আমরাও আমাদের লেখা গুটিয়ে সাথে সাথে গেলাম।

—

বাইশ

ঠাকুর সহরে* আছেন। অনেকে এসে দীক্ষা নিচ্ছে। সেদিন বহু লোক দীক্ষা নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। এর মধ্যে একটি মহিলা বসে বসে কাঁদছে। অনেক জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও কোন উত্তর দিচ্ছে না। ঠাকুরকে সে কথা জানানো হলো। তিনি বললেন, "ঠিক আছে। ওর মাসিক হয়েছে; তাই চিন্তা করছে ওর বুঝি দীক্ষা নেওয়া হলো না ; সে কথা ভেবেই ও কাঁদছে। ওকে বলো যে, তাতে কোন দোষ নেই। শিক্ষা-দীক্ষার বেলায় দিন-তারিখের প্রয়োজন হয় না, তবে পাঁজিতে আছে। জন্ম-মৃত্যু যেমন কোন শুভদিনক্ষণের অপেক্ষা করে না, তেমনি কোন অশুচি স্থানও মৃত্যুকে বেঁধে রাখতে পারে না। তাই শেষ নিশ্বাস যদি অশুচি জায়গায় পড়ে তবে কি নামহীন যাবে ? তাই নাম কখনও শুচি-অশুচিতে বাঁধতে পারে না, নাম সব সময়ই শুদ্ধ। সুতরাং যে অশুদ্ধতা মনে করছে, নাম নেওয়াতে তাতে বাঁধে না। তাই নাম জপ সর্ব্বত্র প্রযোজ্য।" এতে মহিলাটির মনের সংশয় দূর হয়ে গেল।

* * *

কয়েকদিন পরে আর একজন দীক্ষা নিতে এসেছে, সে বধির। সে দীক্ষা নেওয়ার জন্য বসেছে, কিন্তু ঠাকুরকে বলেনি যে সে বধির। ঠাকুর যা যা বলছেন, সব কথাতে ঠাকুরের মুখের দিকে তাকিয়ে

---

* স্বামীবাগ, ঢাকা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ :—যদুনাথ রায়, নৃপেন রায়, ভূপেন রায়, রবি ঘোষ, বারীন ঘোষ, শক্তিদাস মজুমদার, অজিত ভট্টাচার্য্য আরো অনেকে।

রয়েছে। কোন কথা বলে না। ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, "কথা বলছো না কেন?" লোকটা হাসছে, তারপর আঙ্গুল দিয়ে তার কর্ণ দেখিয়ে দিলো। ঠাকুর তখন মূলমন্ত্র তার কর্ণে দিলেন। সে জানালো যে, মূলমন্ত্রটুকুই সে শুনতে পেয়েছে। কিন্তু এরপর যা যা বলা হলো তার কোনটাই সে শুনতে পায় না—আগেরই মত অবস্থা। সে বলতে আরম্ভ করলো, "আমি মূলমন্ত্র তো শোনলাম, কিন্তু প্রভুর কথা যে আর শুনতে পারছি না।" ঠাকুর বললেন, "বেশ, এখন থেকে তুমি প্রভুর কথা বসে বসে শোন।" দেখা গেল ঠিক এরপর থেকেই ঠাকুর যা যা বলছেন সে তা তা শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু অন্যে যা বলছে তা একেবারেই শুনছে না। তখন ঠাকুর আমাদের ডাক দিয়ে বললেন, "একদিন কে যেন আমার এক শিষ্যকে বলেছিলো, 'তোদের ঠাকুর বশীকরণ না কি করে।' ইংরেজীতে 'হিপ্‌নোটাইজ' না কি বলেছিল।" আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছি। ঠাকুর আবার বললেন, "একে দেখলে তো এই কথাই বলবে। বধির আমার কথা শুনছে অথচ তোদের কথা একেবারে শুনছে না। ওকে আমি 'হিপ্‌নোটাইজ' ক'রে রেখেছি। এটাও একটা মন্দ কিরে? একটা সাময়িক প্রলেপের কার্য্য করে তো? অথচ সেই ব্যক্তি এসে যখন আমায় দেখলো, তখন সে বলে কি জানিস্?—'এই বাচ্চা নাকি আবার 'হিপ্‌নোটাইজ' করে।' ওর কথাটা আমি শুনে ফেলেছিলাম। আমি রগড়ে রগড়ে বললাম, 'এটা বাচ্চা না, এটা ছোট বুলেট্।' তারপর না ওরা সকলে হাসতে আরম্ভ করলো, আমিও হাসতে আরম্ভ করলাম। তারপর তারা বলতে আরম্ভ করলো কি, 'এই বাচ্চা কি ক'রে 'হিপনোটিজম্' জানবে? যাঃ, ওরা এসে মিছে কথা বলেছে। এ মনে হয় জন্মান্তরিক সাধু।' আমি ওদের দিকে চেয়ে শুধু কথা শুনছি। আমি ওদের বললাম, 'আপনারা জন্মান্তরিক মহাসাধু।' শুনে ওরা আবার হাসতে আরম্ভ করলো। আমি বললাম, 'আপনারা দেখেই

সাধু অসাধু চিনতে পেরেছেন কিনা, তাই আমি ঐ কথা বললাম।' তখন তারা বলে, 'আমরা শুনেছিলেম, তাই আমরা এসে দেখে গেলেম।' " এরপর ঠাকুর ঐ বধির লোকটিকে বললেন, "দেখতো, ও কি বলছে ?" বধির আগের মতই হা ক'রে তাকিয়ে রইলো। ঠাকুর একটু রগড় ক'রে ক'রে আমাদের বলতে লাগলেন, "দেবতা এখন বধির হয়ে আছে, তোদের ডাক মনে হয় শুনতে পাচ্ছে না। ডাকার মত ডাকতে পারলে বধিরও কথা শোনে। রামপ্রসাদ না কে ছিলেন গান গাইতেন, 'পাষাণেরও নাকি অশ্রু ঝরে।' আমার ডাক বধির শুনছে— এই ভগবানের রাজত্বে এই হবে, হয় বধিরের মধ্যে ভগবান চৈতন্য হয়ে বসে থাকে, চীৎকার জোরে না দিলে যে চীৎকার ভেদ করে পৌঁছে না, সেই ডাক আর তিনি শুনবেন না। তোরা যে চীৎকার করে বলছিস্, ওতো শুনতে পাচ্ছে না। এখন বধির দেবতাই হউক আর কেবলাই হউক, শোনার মত ক্ষমতা ঠিকই রয়েছে— নতুবা আমার কথা কি ক'রে শুনছে ? ডাক্তার নাকি ওকে বলেছে পরীক্ষা ক'রে যে, ও আর না কি ভাল হবে না। যে পর্য্যন্ত পেয়েছে সে পর্য্যন্ত ঠিকই বলেছে। আমি যে পর্য্যন্ত পাচ্ছি, গিয়ে দেখলাম ঠিক আছে— মাঝখানে কয়েক পর্দ্দার গোলমাল খালি। তোরা এখন প্রাণ ভরে যদি ডাকতে পারিস্, বধির সাড়া ঠিকই দেবে। তবে দেখ, একটা পথঘাট আছে তো ? সেই ইঙ্গিত যদি দেখিয়ে দি, তবে তো একেবারেই হয়ে যায়, যে পথঘাট এখন করছি আর তোদের দেখিয়ে দিচ্ছি। আমার আঙ্গুলটা একজন ধর্, ওর আঙ্গুলটা আর একজন ধর্, এভাবে একে একে ধরে ধরে দশবারোজন একত্র হয়ে দাঁড়া। এখন ওকে জানা, 'অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের কথা শুনুন।' এখন তোদের যার যা ইচ্ছে বলে যা, আমি বলে দিলে তো আর হবে না।" তারপর আমরা ইচ্ছামত বধিরের সাথে কথাবার্ত্তা বলতে আরম্ভ করলাম। সে সব কথার ঠিকমত উত্তর দিয়ে যাচ্ছে।

বধির মনে হয় এমন আনন্দ পাচ্ছে যে, সে সেরে গেছে ভাবতে আরম্ভ করলো। তখন আবার ঠাকুর বললেন, "দেখেছিস্ তো, যোগাযোগ থাকলে ঠিক সাড়া দেয়, তবে যোগাযোগ রাখতে হয়।" এইভাবে বেশ রগড় ক'রে ক'রে ঠাকুর আলাপ করে যাচ্ছেন ও বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তারপর বধির ক্রমশঃ ক্রমশঃ একটু শ্রবণের দিকে গিয়ে অনেকটা ভাল হয়ে গেছে।

তেইশ

একদিন ঠাকুরকে এক জমিদার* বাড়ীতে† নিয়ে গেলেন। জমিদার খুব নাস্তিক ছিলেন। তিনি না দেখে না বুঝে কারো কাছে মাথা নত করতেন না এবং সব-কিছুতেই বেশ একটু সন্দেহ প্রকাশ করতেন। তিনি বহু গ্রন্থাদি পড়াশুনা করেছেন। তার জীবনের 'হবি' হচ্ছে—বাগবাগিচা তৈরী করা, পৌরাণিক ঐতিহাসিক দুষ্প্রাপ্য বস্তু সংগ্রহ করা ও গ্রন্থাগার নির্ম্মাণ করা। তাঁর যাদুঘরটি ভারতের যে-কোন প্রসিদ্ধ যাদুঘরের মধ্যে অন্যতম। তিনি একজন প্রসিদ্ধ খ্যাতনামা উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব-বিশারদ, সুসাহিত্যক ও নাট্যকার ছিলেন। বহুদিন পূর্ব্বে তিনি ভারতের একজন নামী সন্ন্যাসীকে তার বাড়ীতে নিয়ে যান এবং তার সঙ্গে ধর্ম্মবিষয় আলাপ-আলোচনা করেন। কিন্তু সেই সন্ন্যাসীর আলাপনে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি এবং তাঁর আদর্শকেও তিনি প্রশংসা বা সমর্থন করতে পারেননি। এভাবে অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর সাথেই তাঁর আলাপ-আলোচনা হয়েছে। কিন্তু তিনি তার মনের মত উত্তর কারো থেকে পাননি, বরঞ্চ তার মতবাদকেই সবাই প্রশংসা করে গেছে। ঠাকুর সহরে

* নরেন চৌধুরী (বলধা-জমিদার)।

† 'Culture', 'বলধা হাউস', ঢাকা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ :—দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী(১), ইন্দ্রভূষণ সেন, বারীন ঘোষ, অজিত ভট্টাচার্য্য, যদু রায়, ভূপেন রায়, দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী(২), শান্তিদাস মজুমদার, মহম্মদ্ আলি।

আসার পর ঐ জমিদার শুনতে পেলেন যে একজন শক্তিসম্পন্ন বালক-ঠাকুর এসেছেন। তিনি আগ্রহান্বিত হয়ে ঠাকুরকে তাঁর বাড়ী নিয়ে গেলেন। ঠাকুরের সাথে তার প্রায় ঘণ্টা তিনেক আলাপ হলো। আলাপের ছলে তিনি ঠাকুরকে বেশ একটু পরীক্ষাও করতে লাগলেন, কিন্তু ঠাকুর স্বাভাবিকভাবে তার কথার উত্তর দিয়ে গেলেন। আলাপ হলো সৃষ্টিতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গিতে অধ্যাত্মবাদ নিয়ে। এরপর উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব ও তার যাদুঘরের সংগ্রহ সম্বন্ধে অনেক আলাপ হলো এবং তিনি ঠাকুরকে আরো জানালেন যে নিজের রচিত নাটক নিজের পরিচালনায় তিনি আপনবাটীতেই করে থাকেন এবং আত্মতৃপ্তির জন্য আনুষঙ্গিক অনেক কিছু করে থাকেন। কিন্তু সব-কিছুর মধ্যেই যেন তাঁর কিসের একটা অভাব রয়ে যায়, যা তিনি কোনদিনই খুঁজে পাননি। তাঁকে যে যা বলে সব-কিছুই তাঁর জানার মধ্যে পড়ে যায়। কাজেই কারুর ভাব বা মতবাদ তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। কেহই তাঁকে নূতন কিছু দিতে পারেনি। তিনি কারুর মধ্যে নূতনত্ব কিছু খুঁজে পাননি। তিনি লক্ষ লক্ষ টাকার বই পড়েছেন। তাঁর ধারণা যে গ্রন্থ-অধ্যয়নেই শুধু সব-কিছু হয় না; আর যদি গ্রন্থেই সব-কিছু থেকে থাকে, তবে তাঁর পাওয়ার আর কিছুই বাকি নেই। তিনি ঠাকুরকে বললেন যে, একটা অভাবের মাঝেই যেন তিনি সব সময় আছেন—সেটাকে কি করে মেটানো যায়? ঠাকুর তাঁকে সব-কিছু বুঝিয়ে দিলেন এবং তাঁর প্রকৃত চাওয়াকে তাঁর মধ্যে জাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর চাওয়াটাও যেন তিনি সাথে সাথেই পেয়ে গেলেন। ঠাকুর বললেন যে, কি ভাবে মনের কার্য্য হচ্ছে, কোথায় তার গতি, কোথায় তার উদ্ভব, কোন প্রয়োজনে তার আসা; যে তৃপ্তির মাঝে সে এতদিন তৃপ্তির জন্য ঘুরছে, সেই তৃপ্তিই যে self একটা concentrate করছে, তৃপ্তি-

চিন্তা ক'রে যে তৃপ্তি নিচ্ছে, এর উপর যে মন স্থাপন করছে, এও যে এক জাতীয় সাধনা—ইহা তিনি তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন। তাঁর কাজ প্রকারান্তরে যে হয়ে যাচ্ছে ঠাকুর তাও তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন। তিনি ঠাকুরকে বললেন যে একটা হতাশের ভাব যদিও তাঁর জীবনের উপর এসেছে, কিন্তু জীবনে বাস্তবের দিক্ দিয়ে তাঁর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। ঠাকুর বললেন, "আপনি যে, কোন demand নেই বলছেন, সেটাও আবার একটা demand। এই material body থেকে যখন এই কথা বলছেন, সঙ্গে সঙ্গে একটা demand থেকে যাচ্ছে; সুতরাং আপনি materialএর দিক্ দিয়ে বঞ্চিত হতে পারেন নেই।" এবং এই materialism is self spiritualism এবং একই যে জিনিষ তাহা ঠাকুর তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন। জমিদার একটু হতাশভাবে বললেন, "এদিক্কার সখের আর কোন কিছু তো আমার বাকি নেই। কিন্তু এরপর কি উপায় হবে? এরপর কি আছে?" ঠাকুর তাঁকে বোঝালেন, "এ যে বাকি নেই বলে যে রয়ে যাচ্ছে, এ যে বাকির মধ্যে রয়ে যাচ্ছে। এ বলে তো আপনি ক্ষান্ত হয়ে থাকছেন না? পরিশ্রান্ত হয়েই যাচ্ছেন। সুতরাং 'বাকি আছে অনেক' শুধু মামুলী কথাতে মামুলী গৎ আওড়িয়ে যাচ্ছেন। তবে এই গৎ আওড়াতে আওড়াতে গৎগুলো গিয়ে একটা মাত্রাতে দাঁড়াচ্ছে—এখন সম আর লয়ের দরকার। তাই 'disappointment' বলে যে কথাটা উঠাচ্ছেন, এটা মাত্রারই একটা মাত্রা বিশেষ; এরপরে ফাঁক, কারণ এরপর আপনার কি করতে হবে, কি অবস্থা, কোথায় যেতে হবে, এ যে একটা অবস্থায় আছেন—এটাই হলো একটা ফাঁক। তানপুরায় যখন সুর দেওয়া হয়, তখন আর এক হাতে গান আওড়ান হয়, গান আর মুখে থাকে না, এরপর হাতেই চলতে থাকে সুর আর movementয়েই তাল, মান, মাত্রা, সম, ফাঁক;

সেই ফাঁকেই এখন আছেন যে—সেই ফাঁকই হচ্ছে শূন্যময় অবস্থা। মনকে যদি শূন্যে স্থাপন করেন, universal আইন যখন শূন্যকে পূর্ণ করা, তখন পূর্ণ অনিবার্য্য। আপনিও প্রকারান্তরে পূর্ণেরই কাজ করে যাচ্ছেন, তার জন্যেই তো আপনার এ সমস্ত এত কিছু হয়েছে, ভাববার তো কিছু এখানে নেই। প্রকারান্তরে সাধনা তো চলছেই, আপনিই যে চলছেন, আপনিই যে করছেন—সে কথাটা শুধু বুঝিয়ে দেওয়া। যে জ্ঞানবুঝটুকু আপনাতে স্থিত রয়েছে, তাকে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে দেওয়া, দেখবেন ঠিক বেজে উঠবে।” এভাবে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি ঠাকুরের সঙ্গে অনেক আলাপ করলেন। তিনি ঠাকুরকে বললেন যে বাস্তব দক্ষতার দিক্ দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক অভিজ্ঞতা তিনি অর্জ্জন করেছেন। এই আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হতেই কয়েকটি মেয়ে বড় বড় পাখা নিয়ে সবাইকে বাতাস দিচ্ছিলো এবং একটি অবিবাহিতা যুবতী জমিদারের পাশে বসেছিলো। এসব ব্যবস্থা দেখে ঠাকুর একটু হেসে বললেন, “সাপের হাঁচি বেদে চিনে।” তখন জমিদার জিজ্ঞেস করলো, “এ কথা বললেন কেন?” ঠাকুর বললেন, “বলা হলো আপনি খুব intelligent, খুব বাজানেওয়ালা; কিন্তু আপনি যে আবার বেজে যাচ্ছেন তাতো আবার আপনার খেয়ালের দিকে গুলিয়ে যাচ্ছে।” তখন জমিদার বলছেন, “কেন, একথা বলছেন কেন?” ঠাকুর বললেন, “বললাম, আপনি যে আমায় আট্‌কাবার জন্য ফাঁদ পেতেছেন, সে ফাঁদে আমি পড়ি কিনা; তার উপর আবার X-ray যন্ত্র লাগিয়েছেন কিছু ওঠে কিনা। কিন্তু এদিকে যে আপনিই উঠে যাচ্ছেন, এখন আপনাকেই যে bandage করা দরকার হয়ে পড়েছে, plaster এখন আপনার উপর প্রয়োগ হওয়ার উপক্রম হয়েছে।” ঠাকুরের কথা শুনে জমিদার একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। তাঁকে দেখে মনে হলো, তিনি

যেন বেশ একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছেন; ঠাকুরের প্রত্যেকটি কথাতেই যেন আশ্চর্য্য হচ্ছেন। ঠাকুর তখন পরিষ্কারভাবে বললেন, "এই সমস্ত মেয়ে ইত্যাদি এখানে রেখে আপনি দেখতে চাইছেন কাঁটা কোনদিকে নড়ে। এদিকে যে আপনার কাঁটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে খেয়াল করছেন কি? সুতরাং এ সমস্ত খামখেয়ালী বাদ দিয়ে ছেলেমি বাদ দিয়ে এগিয়ে চলুন।" তখন জমিদার বললেন, "হ্যাঁ, আমি ভেতরে ভেতরে এরকম একটা ভাব পোষণ করেছি।" ঠাকুর আবার বলতে লাগলেন, "আপনার সমস্ত সৃষ্টিতত্ত্ব হিসাবে এই museum বলুন, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব বলুন, এই যে এদের নিয়ে যে মাতোয়ারা হয়ে আছেন, তার ভেতর দিয়েও একটা জিনিষের তৃপ্তিকে মিটিয়ে নিচ্ছেন, সেটা হচ্ছে 'কাম', এবং কামটাকে main centre ক'রে আপনি সমস্ত কিছু activities করছেন। তবে 'কাম' হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি। সেই ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ সর্ব্ব অবস্থায় সবার ভেতর দিয়ে চলছে, সে হলো এক জাতীয় 'কাম'। আপনার ভেতরও সে অবস্থা চলছে, তার মধ্যে বিশেষত্ব জায়গা বিশেষে বিশেষণ দিয়ে যাচ্ছে। তাই এই পূজারীর পূজা, আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান সবই রয়েছে, প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় শূন্যে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। সেইজন্যই আপনাকে শূন্যের উপর মনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বলা হচ্ছে। শূন্যই হবে ধ্যান, শূন্যই হবে জ্ঞান। শূন্যের উপর মনোনিবেশ করলে সমস্ত ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, বিচার, জ্ঞান, সমস্ত cell, সমস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যে cellগুলো রয়েছে, অণুগুলো রয়েছে, সবগুলো সব-কিছু শূন্যের দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে, তখন তারা মুক্তঅবস্থা পেয়ে মনের গতিতে, আর মনের গতি তো জানেনই সেকেণ্ডে universe ঘুরছে মনে হয়, সেই মনের গতির সাথে সাথে সমস্ত বৃত্তি, অণু ইত্যাদি সমভাবে ওর সমতা রক্ষা করে এগিয়ে চলবে সেই শূন্যমার্গের দিকেতে। তখন speed ক্রমশই বাড়তে থাকবে নিজেকে occupy করার

জন্য, নিজে occupy করার জন্য; সুতরাং occupy to the infinity। সেই সমস্ত ভিত্তি এবং অণু ইত্যাদির ভেতরে সেই শূন্যময়ের সমস্ত ক্ষমতা এমনিভাবে বিদ্যমান রয়েছে পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে পূর্ণ নিজে হয়ে; সুতরাং আপনার ধ্যান জ্ঞান পূর্ণতার মাঝেই পূর্ণ জ্ঞান। আপনিই যে পূর্ণ—সেই ধ্যানেতে আপনি গভীর তন্ময় হয়ে থাকুন। এই আপনার ধ্যান ও জ্ঞান।" এভাবে ঠাকুরের কথা শেষ হওয়ার পর জমিদার বললেন যে তিনি তার সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর পেয়ে গেছেন। জমিদার খুব সন্তুষ্ট মনে ঠাকুরের নিকট আত্মসমর্পণ করলেন।

চব্বিশ

একদিন আমরা* কয়েকজন স্নানের যোগ উপলক্ষে ঠাকুরকে নিয়ে নৌকাযোগে যাচ্ছি†। আমরা নদীর‡ উপর দিয়ে চলছি। নদীতে বেশ একটু একটু ঢেউও আছে। হঠাৎ একটা ঝড়ের মত হয়ে নদীর ঢেউ ভীষন বেড়ে গেল। নৌকায় জল উঠতে লাগলো। নৌকা জলে ভরে গিয়ে প্রায় ডুবুডুবু অবস্থা। আমাদের নৌকা জলে ভরে গিয়ে প্রায় জলের তলে যাওয়ার উপক্রম হওয়াতে আমরা আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। আমরা ঠাকুরকে বলতে লাগলাম, "ঠাকুর, যা করার কর।" তখন ঠাকুর বললেন, "কি আর হবে? চিন্তা করিস্ কেন?" ঐ অবস্থায়ও ঠাকুর আমাদের বোঝাচ্ছেন, "যে গতিতে ঢেউ আসছে ঝড় উঠছে, তার চেয়ে বেশী গতি যদি চালনা করতে পারি, তবে ঐ গতি শিশু হয়ে যাবে।" এই বলে তিনি হাতে একটু জল নিয়ে জল ছিটাচ্ছেন ও হাসছেন। Motor লাগালে যেমন 'লঞ্চ' যায়, নৌকাটিও তেমনি হুহু ক'রে দৌড়াতে আরম্ভ করেছে। নৌকা গিয়ে পাড়ে ভিড়লো। তখন ঠাকুর আমাদের বোঝাতে আরম্ভ করলেন, "যে speed দিয়েছিলাম, তা আক্রমণকারীর speed হতে অনেক বেশী ছিল, সুতরাং আক্রমণকারীর speed আর কিছু করতে পারলো না। সুতরাং এত পিছে রয়ে গেছে যে আক্রমণ

---

* ভূপেন রায়, রবি ঘোষ, মহম্মদ্ আলি, অজিত ভট্টাচার্য্য, বারীন (বরুণ) ঘোষ।

† লাঙ্গলবন্দ, ব্রহ্মপুত্রস্নান।

‡ মেঘনা নদী।

করার আগেই চলে এসেছি। আদির খেলা যেখানে যাচ্ছে সেখানেই আরম্ভ। সুতরাং আমি normal অবস্থায়ই চলে এসেছি। যখন যে অবস্থায় চলছি, তখনই সেটা normal। মূলাধার হতে সহস্রার পর্য্যন্ত যখন শাস্ত্রগত যাচ্ছে, সহস্রার হতে আর একটি সহস্রার পর্য্যন্ত ঐ আরম্ভতেই আছে। এই যে আমি বলছি, আমি করছি কিংবা আমার পেছনে আসছে, এটা সবাইর বেলায়ই প্রযোজ্য—সবার পেছনেই আসছে এবং সব চাইতে বেশী সুন্দর এখানে যারা 'আসছেন' বলছে......অহংভাব কি ক'রে সম্ভব? এও কি হয় কখনও? গল্প ও নানারকম কথোপকথন ঐ এক জাতীয় একাগ্রতার অবস্থা সৃষ্টি ক'রে সন্দিগ্ধতার অবস্থাকে সফলতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে, প্রকারান্তরে সবাই সব-কিছু হয়ে যাচ্ছে আবার আমরাও অবাক্ হচ্ছি 'কি ক'রে এরকম ভাবতে পারে।' যে ভাব সবার উপরে রয়েছে সত্য, সব ঠিকই আছে। অভাবটিকেই ভাব ক'রে ভাবে নিয়ে সেই ভাব প্রতারণার পরিচয় দিচ্ছে এবং সে অনুযায়ী আবহাওয়াটাও চালিত হচ্ছে, তাতে একটা বস্তুর বস্তুত্বের বিকশিতের অবস্থাকেও ভ্রান্তির আরোপ করছে। সুতরাং আজ অবস্থায় কথাগুলো যে বলছি বা বোঝাচ্ছি এবং প্রত্যক্ষতার মাঝ দিয়ে তোরা দেখছিস্, তবুও তোদের influenceটা আমার ভেতর আঁচড় মারছে। আঁচড় মেরে মেরে পিছ্‌লে গিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে এই এক জাতীয় স্বরূপকে, যে জাতীয় স্বরূপ বিরাটের আর একটি রূপবিশেষ সেই রূপটিকে।" তারপর আমরা চুপচাপ ক'রে ঐ সব স্নানাদি দেখলাম, এবং তিনি নৌকাতে বসে বসে সব দেখালেন। আমরা সব কিছু দেখে চলে গেলাম। তারপর ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা ঠাকুর, এই যে হাজার হাজার লোক স্নান উপলক্ষে একত্রিত হচ্ছে, এর উপকারিতা কি? কেন এরা আসছে? কোন্ চাওয়ার পেছনে এরা এগিয়ে আসছে? এতে কি হচ্ছে? আর একটা কিছু না হলেই বা আসবে

কেন? আমাদের এটা বুঝিয়ে দাও।" তিনি বললেন, "কারণ ও উপকারিতা এর পেছনে নিশ্চয়ই আছে। প্রথমতঃ একে একভাবে চিন্তা ক'রে নেওয়া যায়—গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র সমস্ত তীর্থের সম্মেলন আজকের দিনে তিথির তারিখে; সুতরাং এখানে স্নান করলে মুক্তি অনিবার্য্য। সেই যে গঙ্গাযমুনা নদী, সেখানে স্নান করলে 'মুক্ত'— এ যে মনের অবস্থাটা তৈরী ক'রে দেওয়ার জন্যই তখনকার অবস্থা মনের স্বাভাবিক অবস্থা থেকে কতটুকু পার্থক্য থাকে, তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই এই অবস্থা। মুক্তির অবস্থা বলে যখন স্নান কর, তখন তোমাদের মনের অবস্থা কোন স্তরে পৌঁছে এবং সেই স্তরকে 'স্থায়ী' সর্ব্ব অবস্থায় রাখবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন তীর্থ, পূজা-পার্ব্বণ; ওটাকে যেন বরফে ভিজিয়ে রাখার মত তোমাদের মনকে সেই স্তরে রাখবার জন্য। এই সমস্ত কার্য্যকলাপগুলো স্মরণীয়ের জন্যেতে এবং সেইজন্যই বাহ্যিক অনুষ্ঠানে মনকে যদি 'স্থায়ী' ক'রে নেওয়া যায়, তার জন্যই এই অনুষ্ঠানগুলো—এর মধ্যে আরো রয়েছে। ব্রহ্ম সর্ব্বত্র বিরাজমান —সবই যে ব্রহ্ম, সবই যে পূর্ণ। গঙ্গাযমুনায় স্নানে যদি পূর্ণে পৌঁছান যায় এবং সেই পূর্ণ যদি তার মধ্যে অবস্থিত হতে পারে, আমি স্নান করলে যদি মুক্তি-অবস্থায় বিচরণ করতে পারি এবং সেই পূর্ণ যে সর্ব্ব অণুপরমাণুতে বিদ্যমান, তার একটা নির্দ্ধারণস্বরূপ এই সমস্ত ভাবগতিক, এবং নামাকরণ দিয়ে পূর্ণের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে প্রকারান্তরে। মহানরা এই ভাবে জনগণের চিন্তার সহযোগিতা ও প্রসারতার জন্যই এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা তাঁরা ক'রে গেছেন।" তিনি আরো বললেন, "অনুষ্ঠানকে অনুসরণ করে অণুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য—তার জন্যই অনুষ্ঠান। এই ভাবের বিধি-ব্যবস্থা এবং জপ, তপ, যাগ, যজ্ঞ ইত্যাদি শুধু মনের সাম্যতা, জ্ঞানের প্রসারতা, সত্যের প্রতিষ্ঠা; মন তার যে শক্তিতে ক্রমশঃ দূরে চলে যায়, যাতে দূরে অপসারিত না হয়ে বিকশিত অবস্থা সবই তাতে পরিস্ফুটিত হয়

সেই অবস্থায় বিকশিতের মধ্যে। দূরেই যাক্ আর কাছেই থাক্, সেই পরিস্ফুটিত অবস্থাই বিকশিতের মধ্যে আনার জন্য সাধনপদ্ধতি। পূর্ণিমার পূর্ণ চন্দ্রতে এক পূজা, অমাবস্যাতে এক পূজা, সূর্য্যদেবতার পূজা, প্রকারান্তরে বিশ্বরূপেরই পূজা হচ্ছে বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন দিনে তারিখে; যার যে অবস্থা করে নিয়েছে শাস্ত্রবিদ্‌রা, প্রকারান্তরে দেখা যাচ্ছে তিনশত পঁয়ষট্টিদিনের দিন, ক্ষণ, তারিখ কোনটাই বাকি নেই এই পূজার তালিকাতে। এই বিশ্বরূপের যে নানাভাবের পূজা হয়ে যাচ্ছে এবং তাকেই বর্ণনা করছে; আমরা কিন্তু প্রকারান্তরে একেরই পূজা করছি, একই যখন বহু, বহুই যখন এক—যেমন তুমি তোমাদের মধ্যে একজন। তার মাথা আছে, পা আছে, চক্ষু আছে—তুমি যে 'বরুণ ঘোষ'। তুমি কিন্তু 'বরুণ ঘোষ' একটি নাম। তোমার ভেতর কার্য্যকলাপ করছে বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্নতার প্রয়োজনে—কার জন্যে কার পূজা করছে? বরুণ ঘোষের তো? তবে ব্রহ্মেরও ঠিক তাই অবস্থা, বিরাটেরও ঠিক একই অবস্থা। যত পূজা-পার্ব্বণ যা-কিছু দেখছো, একেরই পূজা হচ্ছে এবং সেই যে এক, বিভিন্ন অঙ্গের পরিচয় দিচ্ছে বিভিন্নতার ভেতর দিয়ে, এবং প্রত্যেকটি আবার পূর্ণ বলে পূজা করছি। তত্ত্ববিদ্‌রা জানিয়ে দিচ্ছেন, প্রত্যেকটি আবার পূর্ণ। তোমার শরীরের যে সত্ত্বা, যে-কোন অঙ্গের যে-কোন স্পর্শে তুমি 'বি, ঘোষ' এক-একটি লোমকূপে পর্য্যন্ত, তোমার যে-কোন অঙ্গস্পর্শে যেখানে সাড়া দিচ্ছে 'বি, ঘোষে'র। তুমি যদি সর্ব্বত্র—তোমার দেহের সর্ব্বাঙ্গে তোমার পরিচয় দিয়ে যেতে পার তুমি নিজেকে প্রতি মুহূর্ত্তে; 'নৈরাশ্যতা হীনতা' বলে সময় সময় বলছো, তা সত্ত্বেও যখন তোমার উপলব্ধির মাত্রা অঙ্গের সর্ব্বত্র সর্ব্বজায়গায় বিরাজমান—অঙ্গের যে-কোন স্পর্শই প্রাণের পরিচয় দিচ্ছে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এই বিরাট সৃষ্টি বর্ণনা করছেন, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সর্ব্বভাবে সর্ব্ব অবস্থায় বিরাজ করছে। তার যে-কোন

জায়গায় স্পর্শে তাকে স্পর্শ করা হয় বলেই তো পূর্ণ। আমি এবং তুমি—তা ছাড়াও তো নয়, পূর্ণ ছাড়াও নয়। তবে মাঝে মাঝে পূর্ণ একটু ঘুমন্ত থাকে কিনা, তাই বরুণ ঘোষ ঘুমিয়ে থাকে, তখন স্পর্শে একটু খেয়াল পূর্ণেই কমিয়ে রাখে। এখন কমিয়ে কমিয়ে নিয়ে না যায় সেদিকেই আমাদের লক্ষ্য, তাতেই তো জেগেও একটা ঘুমন্ত অবস্থা maintained হয়ে যাচ্ছে—যেমন নাক ডাকা, মুখ দিয়ে লালা পড়া, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর পরিধানের উপর খামখেয়ালী হয়ে থাকা—এই একটা চৈতন্যের মধ্যে অচৈতন্য অবস্থা থাকার মত, ইহাই চলছে এখন বর্ত্তমান অবস্থায় থাকার মত। কি রকম? 'নৈরাশ্যতা' নাক ডাকার মত, 'ভাল না লাগা' বিক্ষিপ্ততা, 'লালা' সন্দিগ্ধতা, পরিধানের বস্ত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা নগ্নকে প্রকাশ করা—ঠিক তোমাদের একটা নগ্নতার পরিচয় দিচ্ছে। লজ্জা যদি একটু এসে পড়ে তবে নাক ডাকাও থাকবে না, লালা পড়াও থাকবে না, তখন পূর্ণতাই আসবে যাহা এসে রয়েছে। আজ ঠিক তাই এই অবস্থাই চলছে প্রায়েরই ভেতরে। সংশোধন করতে তো আর বেশীক্ষণ লাগে না, শক্তি যখন রয়েছেই।"

পাঁচশ

আমরা* এক জায়গায় নিমন্ত্রিত ছিলাম। আগের দিন গিয়ে পরের দিন খেয়ে ঠাকুরের ওখানে চলছি। ঠাকুরের ওখানে+ যে কয়েকজন ছিল, সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছিলো। ফিরতে ফিরতে প্রায় গোটা তিনেক। গিয়ে দেখি ঠাকুরের নিকট তিনজন ভস্মমাখা বল্কলধারী সন্ন্যাসী বসে আছেন। আমরা তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে হাত-পা ধুয়ে ঠাকুরের নিকট গিয়ে বসলাম। ঠাকুর আমাদের সব বার্ত্তা জিজ্ঞেস করলেন, আমরা উত্তর দিলাম। কাগজকলম নিয়ে বসে আছি। ঠাকুর তাঁদের জিজ্ঞেস করছেন, "আপনারা কতদিন যাবৎ এভাবে বেরিয়েছেন?" সন্ন্যাসী বললেন, "খোঁজে বেরিয়েছি। যেদিন সাড়া পাবো, গৃহে ফিরবো।" ঠাকুর বললেন, "সাড়াওয়ালা আপনাদের এই জাতীয়তায় একটু সাড়া বেশী দেন নাকি? এরকম ভস্মমেখে নিজের চেহারাকে পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করে ফেলেছেন।" সন্ন্যাসী বললেন, "ভস্মে যার পরিণতি, তাকে ভস্ম দিয়েই আবৃত করে রেখেছি 'সংসার অসার' প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এভাবটা রাখবার জন্য।" ঠাকুর বললেন, "জানেন তো, অসারই আবার সারে পরিণত হয়। সুতরাং ওতে ঘাবড়াবার কি আছে?" সন্ন্যাসী বললেন, "মন

---

* সুভাষ চক্রবর্ত্তী, রবি ঘোষ, দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী (১), দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী (২), দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী (৩), বিপুল চক্রবর্ত্তী, বারীন ঘোষ, অজিত ভট্টাচার্য্য, শান্তিদাস মজুমদার আরো অনেকে।

+ স্বামীবাগ, ঢাকা।

যে বিক্ষিপ্ত, মন সংযম করতে হলে প্রলোভনকে বাদ দিতে হবে। আর মনকে নিবিষ্ট করার জন্য ত্যাগ স্বীকার না করলে ত্যাগী হওয়া যায় না এবং তার সন্ধানের দিকে মনও যাবে না।" ঠাকুর বললেন, "কথাগুলো মুখরোচক, কোন সন্দেহ নেই। স্রষ্টার সৃষ্টি যে বৃথা—যে জাতীয় কথোপকথন করলেন, সে জাতীয় ত্যাগ মানে, সৃষ্টিকে বর্জ্জন করা, কিংবা স্রষ্টার সৃষ্টিকেই বর্জ্জনের মধ্যে ফেলা কিংবা তাচ্ছিল্যতার মধ্যে ফেলা। আপনি যে এ সমস্ত কথোপকথন করছেন কোন্ শক্তি হতে, কোথা হতে, কোন্ শক্তি হতে ? ত্যাগ বলে যে গণ্য করছেন, সে জাতীয় পদার্থ হতেই তো। যে বৃত্তিকে আপনি ঘৃণা করছেন বা এড়িয়ে যাচ্ছেন বা এগিয়ে যাচ্ছেন, সব-কিছু করছেন, সব-কিছু বলছেন তার মধ্যেই তো মনোনিবেশ ক'রে। ত্যাগে তো আপনাকে ত্যাগ করলো না। ত্যাগ আর করলেন কোথায় ? ভাষার ব্যবহার করলে তো চলবে না। সত্যকে কি ক'রে অস্বীকার করবেন ? অসার যখন সার হয়, এ সমস্ত বৃত্তি—কুবৃত্তিই হোক্, মনের আবিলতা এবং ঝঞ্ঝাট যা-কিছু মনের কলুষিত উদ্ভব হউক না কেন, তাতে ভাববার কিছু তো নেই। সৃষ্টি যখন হয়েছে, সব-কিছু নিয়েই যখন সৃষ্টি, তার দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রয়োজনের জন্যে এই সমস্তের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই রয়েছে। আপনাকে যখন দেখছি, অঙ্গের নানা বিকৃতিতে যখন আপনি, সুতরাং ঐ সমস্ত বিকৃতির চিন্তাতেও যখন মন—প্রকৃত রূপের জন্যই তো। বাস্তব রূপ যখন বিভিন্ন তার অঙ্গের সমষ্টি বিশেষ, যখন মনের দিক্ দিয়েও চাই—যত অঙ্গের তারতম্যতাই হউক না কেন অনুভূতি যে এক। যত মনের 'মার্ প্যাঁচ' হউক না কেন, খেলা যে মনেরই। সুতরাং ঘাবড়াবার কিছু নেই, ব্যস্ততার কিছু নেই। তবে আপনার যে এ অবস্থাটা তাও তার মধ্যেই পড়ে, বলাতে আপত্তি নাই। দূরত্বতে যাওয়ার ইচ্ছাতে যত হালকাভাবে

যাওয়া যায় ততই বহু পথ এগিয়ে যাওয়া যায়। ঝামেলাপূর্ণ অবস্থা নিয়ে, ঝামেলাযুক্ত নিয়ে পথ তখন কণ্টকময়ের মত লাগবে। আজ এ অবস্থাটা আপনি যে সেজে এসেছেন, সেজন্য conscious; প্রত্যেকটি সাজার পেছনে তুলির 'মার প্যাঁচ্' বেশ রয়েছে, তাতেও আপনি বেশ conscious; এই বুদ্ধপূর্ণ কেশযুক্ত অবস্থার মত ক'রে নেওয়ার ব্যাপারেও আপনি বেশ conscious এবং সমস্ত পরিপাটিতে ভালভাবেই জেনে জেনে নিজেকে সাজিয়ে সেজে বেরিয়েছেন। ত্যাগ কোথায় হলো? এ যে প্রকারান্তরে ভোগই করে যাচ্ছেন, অভিনয় করছেন ত্যাগের, কিন্তু actingএর part তো নিয়েছেন। অভিনয় stageএ রাজা, প্রজা, উন্মাদ—সবই যে actingএ যাচ্ছে। আপনি তা হতে বঞ্চিত হলেন কোথায়? আজ অভিনয়ের অবস্থাতে অভিনয়ের ভাবকে আপনি অবগত করছেন নিজের অবস্থাতে সত্যতার রূপ দিয়ে। তাতে আপনি কি করছেন জানেন? সত্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের উপর একটা মিথ্যার আরোপ করছেন—তাঁদের পরিশ্রম এত বেশী করতে হয় সত্য রূপটিকে দেওয়ার জন্যে, সে সময় নষ্ট হওয়ার এক মাত্র দায়ী হচ্ছেন আপনারা। আপনারা যে সন্ধানে এগিয়ে যাচ্ছেন এগিয়ে যাওয়ার জন্য, আজ সে জায়গায় সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, তাই পথভ্রষ্টের মত হয়ে নিজে ভ্রষ্ট অবস্থায় আছেন, তা বুঝে এই ভ্রষ্টের দিকে বহুকে টেনে একই দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। আজ এই অবস্থা ছাড়তে পারছেন না, কারণ আবহাওয়া এমন অবস্থা সৃষ্টি করছে, বাধ্য হয়ে, অভিনয়কেই সত্যের চেহারা দেখাতে বাধ্য করছে এবং কার্য্যক্ষেত্রে যে সমস্ত ভুলভ্রান্তি আপনাদের দ্বারা হচ্ছে, প্রকারান্তরে সত্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির উপর এবং নিজেদের আগ্রহের উপর একটা অবিশ্বাস জন্মে পড়ে। আপনি আপনার কথোপকথনে নিজের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন, what you are। তাহা হতেই আমি কতকগুলো জানলাম, আপনি মনে হয় বুঝতে পারেননি যে আপনি কি

বলে গেলেন। আমার কথাতে আপনি বেশ ভেবে নিচ্ছেন, আপনাকে কেন এতগুলো কথা শোনানো হচ্ছে। আমি কিন্তু আপনাকে কিছুই শোনাইনি। আপনার কথাতেই কিন্তু আমাকে এই কথা বলিয়ে নিচ্ছেন।" সন্ন্যাসীরা কোন প্রতিবাদ করলেন না এবং তাঁরা সব স্বীকার করলেন। সন্ন্যাসী বললেন, "বস্তুতই মনের বিক্ষিপ্ততা রয়েছে আর সব-কিছুই রয়েছে। মুখে মুখে বলছি 'ত্যাগ ত্যাগ', কিন্তু যশে মানে যেন আমাদের আট্‌কে রেখেছে। সত্যি কথা, প্রতিবাদ করার কিছু নেই। আমরা এটুকু বুঝেছি, প্রতিবাদ করতে গেলে আরো স্বরূপের প্রকাশ হয়ে পড়বে। আমাদের কথায় পরিচয় পেয়ে আমাদের যা বললেন, তাতেই তো প্রায় বানচাল হয়ে গেছি। রেগে আবার এর পরে যদি প্রতিবাদ করতে যাই, তবে তারপর তো পাত্তাই থাকবে না। সুতরাং রাগও করেছি, অভিমানও হয়েছে, আবার সত্য জিনিষটার জন্য খুশীও হয়েছি। ভগবৎ-সন্ধানে যখন নেমেছি, তখন তাঁর কৃপায় বিধান একটা হবেই। আপনার সাথে সময় মত এসে এ বিষয় আলোচনা করবো।" ঠাকুর বললেন, "ভুল-শুদ্ধ নিয়েই হচ্ছে জীবজগৎ। এই পরিস্থিতিতে এই বিষয় আপনার স্বীকারোক্তির জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এইরকম স্বীকার ও মনের বল, প্রতি মুহূর্ত্তে নিজের দুর্ব্বলতাকে প্রকাশ করার সৎ সাহস ক'রে নিতে পারেন, তবে এ জীবনে অনেক success আসবে।" সন্ন্যাসীরা আন্তরিকতা জানিয়ে চলে গেলেন। যতটুকু পেরেছি আমরা লিখেছি। এরপর ঠাকুর বললেন, "এরা অনেকটা বুঝেছে মনে হয় নিজেদের সম্পর্কে, তাই ভাল লাগলো এদের নিজেদের স্বীকারোক্তির জন্য। কারণ সত্য স্বীকার করার মত সৎ সাহস কয়জনের আছে? আবহাওয়ায় অনেকের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পারে না, আর অনেকে তো করেই না। যশে মানে অহঙ্কারে সব একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে ছাড়ছে সবাইকে। আর উপায়ই বা কি? এমনই উদ্ভব করে রেখে দিয়েছে বানচাল যে

একবার বল্‌বে, সে বলেই গেল—দেশটা এভাবেই চলেছে। সত্য স্বীকারের জন্য সত্য যে বলবে তা আর বলার সময় নেই। পরিস্থিতির চাপে এ সকল বলতে বাধ্য হচ্ছে, সুতরাং এমন treatment থাকা দরকার এ জিনিষটাকে subside করে দিতে পারে। একটা জিনিষ যদি উদ্ভব হয়, তার মূলেই যদি নষ্ট করে দেওয়া যায়, তবে সমূলে বিনাশ হয়, কিন্তু nursingএ diseaseএর মূল উৎপাটিত হয় না। তাই 'সদা সত্য কথা কহিবে, ভাল হয়ে চলিবে, বাজে দিকে মন দিবে না'—এতে আর কি শোধরাবে? এর মূলকাঠিতে নাড়া দেবে, তবেই স্বাভাবিক মত বিনাশ হবে—চিকিৎসা সেখানেই দরকার এবং উপযুক্ত চিকিৎসকের সেখানেই প্রয়োজন।" আবার লোকের ভিড় হতে আরম্ভ করলো, তিনি স্ব-ইচ্ছায়ই আলোচনা সেদিন-কার মত বন্ধ করে দিলেন।

———

ছাব্বিশ

একদিন ঠাকুরের কাছে বসে* আছি। ঠাকুর নানাবিষয়ে আলাপ করছেন। এর মধ্যে ঠাকুর নিজেই বলছেন, "সত্য জিনিষটা স্বাভাবিক মতে যে কি ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং স্বাভাবিক মতে যে এসে উপস্থিত হয়, তা তোমাদের কিছু বাস্তবের পরিচয় দ্বারা বুঝিয়ে দিচ্ছি। যে সমস্ত মনের বৃত্তিগুলো চলছে, তাহা আবহাওয়ার দ্বারাই বেশীর ভাগ সাময়িক চলতি হয়ে আসছে। আবহাওয়ার কার্য্যকলাপগুলো ঠিক কিংবা বেঠিক, সেদিক দিয়ে কিছু বলা হচ্ছে না। কিন্তু যে প্রয়োজনের জন্য যে সমস্ত আইন বা শৃঙ্খলা বলে কার্য্য চালিয়ে নিচ্ছে তার influence অথবা রীতিনীতি মেনে বা তার ভাবগতিক নিয়ে প্রত্যেকের প্রত্যেকের প্রয়োজন সাময়িকভাবে মিটিয়ে নিচ্ছে; সাময়িক তৈরী আইন অনুযায়ী যে সমস্ত বিধানগুলো করা হয়েছে, প্রত্যেকে প্রত্যেকেই সেই এক জাতীয় বিধান অনুযায়ী ঐ এক জাতীয় principle যে maintain ক'রে চলছে। সাধারণতঃ ঐ সমস্ত principleএর

---

* স্বামীবাগ, ঢাকা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ:—যদু রায়, ইন্দ্রভূষণ সেন, দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী (১), জিতেন ঘোষ, রাস বিহারী ঘোষ, জীবন ব্যানার্জ্জি, অরুণ রাহা, খগেন ঘোষ, সুবোধ রায় চৌধুরী, কুসুম কুমার ব্যানার্জ্জি, মনোরঞ্জন গুহ, বিপিন বসু, ইন্দু চক্রবর্ত্তী, কমলা রায়, ষোড়শী বসু, বিভা রায়, সুবর্ণ চৌধুরী, হেমেন্দ্র রায় চৌধুরী. ধীরেন্দ্র রায় চৌধুরী, গোপাল ঘোষ, শান্তিদাস মজুমদার, বারীন ঘোষ, অজিত ভট্টাচার্য্য আরো অনেকে।

কার্য্যকলাপে স্বাভাবিক মতে একটা নির্ভরশীলতা এসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। নির্ভরতার মধ্যে সেই foundationএর ভেতর কিছু থাকে বা নাই, তাহা আমি বলছি না। সেই বৃত্তিতেই সাংসারিক জীবনের প্রতি কার্য্যকলাপের মধ্যে প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ঐ ভিত্তিতে এসে নাড়াচাড়া দিচ্ছে। আরাধ্যে যে মনোনিবেশ করছে, আরাধ্যকে যে টানছে, কল্পনাতে যার যার মনের ঠিক বৃত্তি অনুযায়ী এক-একটা চিন্তাযুক্ত ক'রে দেবতারূপে এনে দাঁড় করিয়েছে, তার মধ্যে মনোনিবেশ করেও নিজের মনকে অবস্থাতে আনতে পাচ্ছে না। কিন্তু যতটুকু মনোনিবেশ করছে, কাল্পনিক চিন্তাতে যতটুকু স্বাদ পাচ্ছে তার চেয়ে বেশী যদি কোন আঘাত পায়, তখনই ঐ দেবতার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে বলে মনে হচ্ছে, আবার কারো আঘাতে তাঁর উপর মনকে আবার টেনেও আনছে। কিন্তু সন্দিগ্ধতার মাঝে নিরুপায়ের অবস্থা মনে করে, 'উপায় নেই, কি করবো ? তাই একটা কিছু করা দরকার', তখনই মনকে ওর মধ্যে এনে একটা কিছু দেবতা অথবা মূর্ত্তি একটা চিন্তাধারার মধ্যে রূপকে এনে তার মধ্যে মনোনিবেশ করে। এই যে এক জাতীয় প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে sentiment মনের চাঞ্চল্যকর অবস্থার সৃষ্টি করে। কোনটার মধ্যেই যে আকর্ষণ ক'রে নিজেকে আকর্ষণ ক'রে নিজের মনকে বসাতে পারে না। বসাতে যাচ্ছে, কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা যায় তা থেকে ছুটে আসছে। এই সব সংস্কারের influenceএ এই জন্মান্তরিক চিন্তাতে যতটুকুনু পারছে আবার এগিয়ে চলছে ঠিক একটা springএর মত— সংস্কারটা যেন একটা spring-work ক'রে যাচ্ছে। যেই অবস্থার মধ্যে তারা বিরাজ করছে, সেই বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগতে যে কার কতটুকু আছে, সেই বিষয়ে সন্দেহ। আবার যদিও অবগতে থাকে, তবুও ঐ সংস্কার-জাতীয় বাণীতেই তার মতবাদকে

গড়িয়ে নিচ্ছে। কিন্তু সন্দিগ্ধতাপূর্ণ ভিত্তির অবস্থাতে সেই অস্বাভাবিকতাও জেনে যাচ্ছে, সংস্কারকেও জেনে যাচ্ছে। আবার কেউ কেউ এমন একটা মনের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে, সব দূরে ঠেলে ফেলে দিয়ে চুপ করে আছে। কথা হলো—দূরেই ফেলুক, আর নিকটেই টানুক, প্রকৃত সম্পর্কে যদি বুঝতে পারতো, তবে দূরে ফেললেও এক জাতীয় 'টানার' মধ্যেই থাকতো ; আর সম্পর্কিত বস্তু সম্পর্কে থাকবে সে বিষয়ে তো কোন সন্দেহই থাকে না, সেই প্রকৃত সম্পর্কের সন্ধান যদি প্রত্যেকে পেয়ে যেতো—তার স্বরূপের কোথায় আদি, কোথায় লয়, কোথায় তার বাস, কোথায় তার আলয়, কি ভাবে মনোনিবেশ করলে সব-কিছু সম্ভব ; তাই নিজের আলয়কে প্রথম জেনে নিতে হবে। নিজের বাসস্থান নিজের আলয়ের বিষয় যদি conscious থাকে, রাজপ্রসাদও তখন তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় ; সেই প্রাসাদের কোন প্রাচুর্য্যই তাকে আঁকড়ে রাখতে পারছে না যেহেতু সে সম্পর্কে সে conscious। তার কুঁড়ে ঘর অনেক সুন্দর, যেহেতু সে নিজস্ব সম্পর্কে যে conscious—সচেতন। তাই যে-কোন অবস্থার ভেতর তুমি নিজকে জড়ায়ে রাখ না কেন, কোন অবস্থাই তোমাকে স্পর্শ করতে পারছে না, কিন্তু সাময়িক একটু আনন্দ উপলব্ধি ক'রে যাচ্ছে। নিজের ছেঁড়া কম্বলে নিজের কুঁড়ে বাটীতে যে আনন্দ তোমার রয়েছে, তার কারণ, 'আমার' প্রকৃত স্বাধীনতা সেখানে বিদ্যমান রয়েছে। এই যে মুক্ত অবস্থা বন্দী অবস্থায় থাকে, তখনই মনের ভেতর সেই মুক্ত অবস্থার জন্য হাঁপাতে থাকে। যেমন একটি ছোট গাছকে খুব সুন্দর ঘরের ভেতর নিয়ে তাকে ভাল ক'রে যত্ন করতে আরম্ভ করলে, সুন্দর বাতি দিলে, পাখা দিয়ে বাতাস করতে আরম্ভ করলে, খুব কম্বলটম্বল জড়ায়ে আদর করতে আরম্ভ করলে, ঠিক তোমাকে যেমন তুমি নিজে করছ। সে গাছ কিছু কিছু

বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু একটা অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে বেড়ে উঠছে। সূর্য্যের আলো সে যদি নাও দেখে থাকে, কিন্তু প্রকৃত আলয়ের জন্য ঘুরছে, 'কোথায় আমার আলো'; কিন্তু এর আলোতে সে যে নিজেকে বিলাতে পারছে না বা ওর সম এর ভেতর দিয়ে এটাকে ক্ষমা করতে পারছে না। কিন্তু এই জাতীয় সংস্কারের মধ্যে দৈনন্দিন জীবন-যাপন করছে সত্য, প্রতি মুহূর্ত্তে ভাবে অভাবে নিজে মূর্চ্ছা যাচ্ছে। ছোট্ট একটা ফুটো ক'রে দেওয়া হলো একটা দেওয়ালের ভেতর দিকে, একটু rayর একটু রেশ ওর উপর এসে পড়তে আরম্ভ করলো; এত জাঁকজমক, এত আলো—সে ক্ষণিকের আনন্দ, ক্ষণিকের জ্বালা, নানা sentimentএ নিজের দ্বন্দ্বে ও প্রতিদ্বন্দ্বে নিজেই খুঁজতে আরম্ভ করল, আর যখন এই অবস্থার সাথে নিজেকে এড়ায়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, যার কিছুই তার ভাল লাগছে না, এমন একটা মনের অবস্থা তৈরী হতে আরম্ভ করল যে আর এদিকের কিছুই ভাল লাগছে না, কিছুই টেনে আনতে পারছে না, তখন দেখা যাচ্ছে, ঐ ছিদ্রের মধ্য দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে চলছে; তখন, সেটা এক সময় উপহাসে থাকলেও—'ছোট্ট আলো তুমি, আমি কত আলোতে রয়েছি'; কিন্তু এই আলোও তার নিকট মামাবাড়ীর 'আলয়' হয়ে গেল। কিন্তু প্রকৃত দরিদ্র কুটীর তার আজ তার সম্মুখীন হয়ে এলো। এটাই যে ছিল তার আলয়, তাই এই উপহাসে যে ছিল আলো, সে এর ভেতর দিয়ে প্রবেশ ক'রে পেল এই বিরাট আলো। সত্য বস্তু এমনি বস্তু সম্মুখীন যদি তাকে দিয়ে দেওয়া যায়, যতই তুমি একে এড়িয়ে চল, যত সংস্কারই তোমায় বেড়িয়ে রাখুক, সত্যতা তাতে এসে পড়বেই। যেমন—তোমার মামারা খুব ধনী, তার বাড়ীতেই তুমি রয়েছ, তার সমস্ত কিছুতেই তুমি রয়েছে, এই বাড়ীই তোমার বাড়ী বলে মনে ক'রে নিয়েছ; তুমি দরিদ্র, তোমার কুটীরও সেরূপ, কোনমত রূপে

দেওয়া একটি 'ছাপরা' রয়েছে, তোমার খুড়াজ্যেঠারা দারিদ্র্যের মধ্যেই বিরাজ করছে, তাই তুমি বাড়ীর পরিচয় দিতে নিজেকে লজ্জা বোধ করছ—মামাবাড়ীর পরিচয়ে নিজেকে গৌরবান্বিত করছ। মামাবাড়ী আর বাড়ী—ব্যবধান বেশী নয়, কয়েক মাইল মাত্র আর যাদের বাড়ী দু'দিনের রাস্তা রয়েছে,—অবস্থাগুলো কি রকম হয়? এমন এক-এক সময় সে সমস্ত আত্মীয়স্বজনের দ্বারা আঘাতপূর্ণ কথা, pinching, pinching বা জ্বালাযুক্ত ব্যথা প্রতি মুহূর্তে মনের মধ্যে আঘাত দিচ্ছে। আর তুমি এত ঘনিষ্ঠতমের মধ্যেও সেই ধাঁচে সেই সংস্কারে সেই বাড়ীকে নিজের বাড়ী বলে গড়ে উঠেছ, কিন্তু যখনই ঘা খাচ্ছ তখনই ভাবছ এ তো মামাবাড়ী। ঘা খেতে খেতে এমনই এক অবস্থায় দাঁড়িয়ে গেলে, তখন সেই দরিদ্র কুটীর তোমার মনের সম্মুখীন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তুমি যখন ছুটে পালাবার চেষ্টা করছ, তখন সেই কুটীরের দিকে চলছ। সেই কুটীরই যে তোমার অন্তর, সেখানে বাধা দেওয়ার কেউ নেই। সেই কুটীর যেন তোমার সত্য রূপের পরিচয় দিচ্ছে, 'সে যে আমার বাড়ী, আমার আলয়', হউক কুটীর ক্ষতি নেই। আর যার কুটীর রয়েছে দু'দিনের রাস্তা, তার হাঁটা পথেও সম্ভব নয়, তার রাগ ক'রে গিয়ে পাশের বাড়ীর পুকুরের পাড় ছাড়া উপায় নেই, তার কারণ হঠাৎ গিয়ে তার দাঁড়াবার জায়গা যে নেই। তাই তার সেই সংস্কারে বা ভীতিতে এমনি অবস্থায় বসে আছে নিজের রাগকে সহজ করতেও পারছে না, আবার কোন জায়গাতে লুকিয়ে থাকতেও পারছে না, তবে নিজেই যে বিপদে পড়বে। তাই রাগ অভিমানকেও যে বজায় রাখতে হবে, তাই দেখা রাস্তার পাশে, পুকুরের ঘাটে বসে রয়েছে, যাতে গিয়ে তাকে শেষে তোয়াজ ক'রে নিয়ে আসে। এই ব্যবধানে একটু তার স্বাধীনতাকে চ্যুত করতে বাধ্য হলো তার প্রকৃত কুটীর তাড়াতাড়ি

না পাওয়ার জন্য। ঠিক আমরাও সেই বৃত্তির মধ্যেই বেশীর ভাগ বিরাজ করছি। সংস্কারকে মামাবাড়ী মনে ক'রে তার মধ্যেই মানুষ হচ্ছি, বড় হচ্ছি, তাকেই আপন ক'রে নিচ্ছি,—আলয় যদি কাছে পাই তবে সব মিটে যায়। তাদের এই সংস্কাররূপ মাতুলালয়কে তাদের তোয়াজ তাদের বৃত্তির দিক্ দিয়ে চেয়ে চেয়ে অনেক কিছু অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক'রে যাওয়া হচ্ছে তাদের তৃপ্তির জন্য। যে তৃপ্তি পেলো তারা, সেই তৃপ্তিতে একটু আনন্দ পেলাম। এইভাবে যেন প্রাসাদিক আলয়ের মধ্যে প্রাসাদিকের মধ্যে থেকে মনকে সাজা দিচ্ছি প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে। কিন্তু আবার সাময়িক আতিশয্যের ঐশ্বর্য্যে নিজেকে নিজে ভুলিয়ে রাখছি। চিন্তা করলে 'ঝুলনা'ও এর চেয়ে অনেক শান্তি। এই টেবিলের একটি দোয়াতকে ঐ টেবিলে রাখলেই বাড়ীর একজনে 'ফোঁস'—সমস্ত বস্তু আমার নিকটে থেকেও শত আপন করা সত্ত্বেও 'ফোঁসে' জানিয়ে দিচ্ছে, 'এ যে মাতুলালয়, কুটীরই তোমার প্রকৃত আলো।' তখন সেই কুটীরই সাড়া দিচ্ছে, এ যে আমার আলয় নয়। এই সংস্কার আর এ সমস্ত তেত্রিশকোটি দেবতা এ যে মামামামী সম্পর্ক জাতীয়। কোনটা ফোঁস হয়, কোনটা মামীর influenceএ বেঁকে দাঁড়ায়—মাতৃপক্ষে এ যে বড় এক অশান্তি বিশেষ। আবার উপায়ও নেই যে, তাই সব-কিছু সহ্য ক'রে মাতৃটানে; মাতৃটানের টানে ভুলে গিয়ে তাদের আপন ক'রে যখন জড়িয়ে ধরি, আঘাতটাও ঠিক সেই অনুযায়ী পেয়ে আসি। তখনই আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে, আমাদের মধ্যে জেগে উঠছে, 'আমার মা নেই, বাবা নেই।' বাবা যদি কারো থাকেও, দারিদ্র্যের মধ্যে দারিদ্র্য তাকে ঘেরিয়ে ধরছে। আজ দারিদ্র্যরূপ সংস্কারেতে জোর ক'রে মনের স্বাধীনতাকে দাসত্বরূপে এনে আমার প্রাণের টানে রঙ্গীন চশমায় ভুলে ঝাঁপিয়ে পড়ি আমার ব'লে। তখন আমার 'আপনি' আপন consciousকে বুঝিয়ে দিচ্ছে, এও যে

তোমার না, তোমার যারা তারা পড়ে আছে সেই কুটীরেতে, তোমার কুটীরেতে। তুমি নিজে মানুষ হও—সেই হুঁশে যখন আসবে, তখন সব বুঝতে পারবে কে তোমার, তুমি কার। তাই এই সংস্কারেও এমনি ক'রে জর্জ্জরিত ক'রে নিজের প্রকৃত রূপকে দাসত্বরূপে এনে ভুলিয়ে দিচ্ছে। 'দাস'ই বুঝি আমার জীবনের চরম কর্ত্তব্যতার মধ্যে রয়েছে আবার 'দাসে' ওতো মুক্তি রয়েছে, স্বাধীনতাও রয়েছে। সে যখন একা মনে চিন্তা করে, তখনই সে নিজেকে ভাবে 'দাস'। দাসত্ব-বৃত্তি তো আমার বৃত্তি নয়। আজ আবহাওয়ার influenceএ আবহাওয়ার চাপে তাদের গতিবিধিতে আজ বৃত্তি তো এভাবে চলে আসছে, সংস্কার আজ এমনি ক'রে যে গতির মধ্যে নাড়াচাড়া দিচ্ছে সাময়িক চাপে পড়ে একটু আনন্দের রেশ পেয়ে ; আবার সেই আনন্দই যেন সর্পাকারে দংশনমূলক চেহারাতে আমাকে দংশন করার জন্য যখন এগিয়ে আসে, তখন আমার ভেতরে যে সাড়া দিচ্ছে, সেই সাড়ায় জানিয়ে দিচ্ছে সেই সাড়ার জন্য, সেই স্বরূপ সেই সত্য, এও যে তোমার নয়। তাই সেই সমাজেতে দেবতার কাল্পনিক চিন্তাতে, যার ইচ্ছাতে, যার যার sentiment, যার যার যত খুশি ইচ্ছামত দেবদেবীকে বর্ণনা ক'রে নিজের একটা বিশ্রামের স্থান ক'রে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। ছারপোকা এমনি রয়েছে, ছারপোকা-মশার উপদ্রবে যেমন ব্যতিব্যস্ত ক'রে ছেড়ে দেয়, উপায় না দেখে যেমন সারারাত হাঁটাহাঁটি করে, নিজেকে আপদ্ হতে মুক্ত করার জন্য দিনের বেলাকে রাত্র ভেবে নিয়েছে ; অবস্থার চাপে ক্ষণে 'ঠ্যাং' হয় মাথা, মাথা হয় 'ঠ্যাং', এই যে ভাবাভাবির মধ্যে যে ভাব তুলে দেওয়া সংস্কাররূপ চাপেতেই উপদ্রব হিসাবে পরিত্যক্ত চেহারায় পরিণত করিয়ে তুলছে। আবার অজ্ঞানতায় শান্তি খোঁজার উদ্দেশ্যে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে তারই মধ্যে গড়াগড়ি দিচ্ছে। উপদ্রব তাকে ছাড়বে কেন? তখন দেবদেবীরা ইচ্ছামত দোষারোপ

দিয়ে চোর বানিয়ে দিচ্ছে দেবতারূপ মামার কাছে। মামা তখন বকা আর লাঠি নিয়ে তাড়িয়ে দেওয়ার উপক্রম করছে। তখন ভাবলাম দেবদেবী উভয়েই চটে গেছে—উপায় আমার কি হবে? নিজের ভেতর নিজেই আঘাত পেয়ে চোখের জলে ভিজিয়ে শুধু এই ভেবে যাচ্ছি, "হায়রে! সত্যের জায়গা নেই, আপনত্বের মূল্য নেই, সরল এবং সহজের দাম নেই, ভ্রান্তির ঠুলি চোখে পরে দেবতারূপ মামা, সেও ভুল বোঝে! আমায় তো ডেকে জিজ্ঞেস করতে পারতো—সেই অবসর তার নেই। তখনই প্রকৃত আলয়ের পেছনে— আলয় হয় তখন রাস্তা, আলয় তখন হাটবাজার, বন্ধু তখন তারা এসে দাঁড়ায়; তারা যে আমায় কিছু বলবে না, বিপদে তারাই এখন মনের খোরাক দিচ্ছে, কিন্তু এও যে আলয় নয়—'আলেয়া' মাত্র। এই সংস্কারের চাপে পড়ে সংস্কার এমনি ক'রে বেড়িয়ে ধরছে, যে-কোন দিকে যাই, সব-কিছুতেই পাই আঘাত।" ভ্রান্তিটা কি রকম? স্বামী-স্ত্রী ঘুমিয়ে আছে, স্ত্রী খুব গরমের জন্য নীচে ঘুমোচ্ছে। কোন ফাঁকে একটি পাহাড়িয়া সর্প এসে বিছানার মধ্যে সেইস্থান occupy ক'রে লম্বালম্বি শুয়ে আছে। অসহ্য গরম। স্বামী তাকে জড়িয়ে শুয়ে আছে, গা খুব ঠাণ্ডা কিনা বেশ আরাম পাচ্ছে automatically। স্বাভাবিক অবস্থায় যা হওয়া দরকার—ঠ্যাং বাড়িয়ে দিচ্ছে, বেশ আঁকড়ে ধরছে, একটু জড়িয়ে ধরছে, সে তো তার স্ত্রীকেই ভেবে যাচ্ছে। হঠাৎ ফোঁস ফোঁস আওয়াজে তার ঘুম ভেঙ্গে গেছে, তাড়াতাড়ি উঠে বাতি জ্বালিয়ে দেখে—দেখবার মত বা দাঁড়িয়ে থাকার উপায় নেই, প্রায় faint হয়ে যাওয়ার উপক্রম। তাড়াতাড়ি স্ত্রী উঠে—তারও সেই অবস্থা। তারপর কোনমত জলটল দিয়ে সুস্থ করা হলো, উভয়েই সুস্থ হলো। স্বামী বলল, "আমি কি ভেবেছি সর্প, আমি ভেবেছি 'তুমি'।"

এই জাতীয় ভ্রান্তি—কাকে ধরতে কাকে ধ'রে সাময়িক কোন

আনন্দ যে পাচ্ছি, কোন আনন্দে যে নাচছি, স্বরূপকে যদি একবার পেতাম—স্ত্রী না সর্প। কিন্তু একটু একটু জাগাতে সাড়া পাওয়া যায়, সর্পের ফোঁসফোঁসানি ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। তাই ভয় হয় কোন চালনায় চালিত হচ্ছি, কি ধরতে কি ধরে আছি, আবার প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে দ্বন্দ্বের সাথে লড়াই করছি। কিন্তু একটা জিনিষ উপলব্ধি সবাই করছে—সত্য বস্তুকে চাওয়া। সেই বস্তুর সন্ধান যখন পাওয়া যাবে, কোন সংস্কার তাতে আট্‌কে রাখতে পারবে না, স্বাভাবিক মতে সেদিকে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ভাল জিনিষ পেলে খারাপ জিনিষকে চায় না এবং কেউ তাকে চায় না। তাই সঙ্গ এবং জ্ঞানকে নিজের ভেতর জাগিয়ে তোলা, প্রকৃত সত্যকে সন্ধান করা, নিজেকে নিজে জানা, প্রতিটি নিজের কার্য্যকলাপের মধ্যে নিজেকে বিচার করা,—কেন করছি? কিসের জন্য করছি? কোন্ প্রয়োজন আমার? একি সংস্কারে, ভয়ে, না ভীতিতে? না সবাই করছে বলে করছি? উপায় নেই বলে করছি? প্রত্যেকটি জিনিষের তত্ত্বকে বুঝতে চেষ্টা করবে, তবেই সে বস্তু সম্পর্কে জানতে পারবে। সত্য যে তোমাতেই রয়েছে, তখন শত ঘাতে ঘাতে আঘাত পেয়ে তোমার সত্যই জেগে থাকবে, তুমি কোন আলয়ে রয়েছ—সেই প্রকৃত আলয়ের সন্ধান ক'রে দেবে, তোমার প্রকৃত আলো জেগে উঠবে—সেই আলয়ই হবে তোমার প্রকৃত আলো; সেই আলোই তোমার আলোর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সেই আলোই তোমার প্রকৃত আলো, তাহা তখন বুঝতে পারবে—সাধনা সেখানেই গিয়ে দাঁড়াবে, সেই সাধনাই তোমরা ক'রে যাবে। কোন অভিশাপে কোন অবস্থায় কোন অবস্থার জন্য নিজেকে টলাবে না—ভয় তোমাদের নেই; মনের কার্য্যে মনের প্রসারতাতে কোন কার্য্যে নিজেকে জানতে ত্রুটি করবে না, মনকে রাখবে নিরপেক্ষতার দিকে, নিজেকে কখনও আগে বিলিয়ে দেবে না। বিলিয়ে

দেও নিজেকে বিচারের মধ্যে এবং বিচার ক'রে ক'রে বিচার্য্যেতে এনে বিচার ক'রে যাও, রূপ এসে তখন ধরা দেবে, হউক কঠিন ক্ষতি নেই, কঠিনই তোমার সাধনা—সহজ তখনই হবে, তাই এগিয়ে যাবে, এগিয়ে চলবে। কোন বন্ধু কোন বান্ধবের সাময়িক আচরণে নিজেকে বিচলিত করবার সুযোগ দেবে না, নিজের বৃত্তিতেও নিজে টলবে না—শাস্ত্র তখন আসবে, এসে দাঁড়াবে। যখন তোমার জ্ঞানের কাঁটা ঠিক থাকবে, সব এসে সেখানে ধরা পড়বে। এর আগে কর্দ্দম-মাটিকে যেমন ছেনে মূর্ত্তিতে পরিণত করে, তেমনি ক'রে তাকে ছেনে নিজেকে তৈরী কর। সত্য, মিথ্যা, কে আছেন, কে নেই, কি আছে, কি নেই, কি চাওয়া, কি পাওয়া—তোমার প্রকৃতই হচ্ছে এক চাওয়া, সে চাওয়াই হচ্ছে তোমার পাওয়া। তোমাকে তুমি যদি তোমারই প্রেমে ফেলে ভালবেসে যুক্তির কাঁটায় কাঁটায় নিয়ে নিজের প্রেমে নিজে মুগ্ধ হতে পার, নিজের কার্য্যে নিজে তৃপ্তি পেতে পার, নিজের বৃত্তির চালনায় নিজে যদি শান্তি পেতে পার, তোমার প্রেমে তুমিই মুগ্ধ, তখন তুমিই তোমাকে জানবে—সাধনা সেখানেই গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। তোমাদের তো অনেক কিছুই মাঝে মাঝে বলি, তোমরা আমার কথাগুলোকে একটু ভেতরে নিয়ে হজম করতে চেষ্টা কর। আমার আলাপকে বৃথা নষ্ট হতে দিও না, ভাষাতে ঠিক সব-কিছু প্রকাশ করতে সমর্থ হচ্ছি না, তাই বার বার ক'রে একই কথা পুনঃপুনঃ বলি। তত্ত্ব সম্পর্কে বেশী কিছু বলার নেই, তত্ত্ব এক জায়গায়ই দাঁড়াচ্ছে। নিজের তত্ত্বকে প্রকাশ কর, নিজেকেই জান—এই বিশ্লেষণ ক'রে ক'রে শুধু বুঝিয়ে দেওয়া। তাই যতটুকু উপলব্ধি করছি ততটুকুনুই তোমাদের জানাচ্ছি। দুনিয়ার সব-কিছু দেখবে শুনবে, বুঝতে চেষ্টা করবে; কোন প্রকার এমন কিছু বলবে না, এবং কাউকে কোন আঘাত দেবে না নিজে না বুঝে না জেনে। বুঝবার চেষ্টা করবে, জানবার চেষ্টা করবে—তোমার শিক্ষার মাধুর্য্য সেখানেই গিয়ে দাঁড়াবে।

জানবার প্রয়াসে বুঝবার প্রয়াসে জানবার জন্য যতই এগিয়ে যাবে, দেখবে সে জাতীয় সাহায্য ঠিক পেয়ে যাবে। মান, অভিমান, তর্ক, নিন্দা সেখানে প্রয়োগ করবে না, শান্ত মস্তিষ্কে সব-কিছু জিজ্ঞেস ক'রে ক'রে জেনে নেবে। প্রকাশ করবার জন্য নিজের কৃতিত্ব দেখাতে যাবে না, নিজের বাহবাকে নিজের বহ্বাড়ম্বরে সেখানে সাময়িক বাহবা যদিও পেতে পার 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা' এর মত যে, কিন্তু 'বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে'। প্রথম পূজ্য হও তুমি, তোমার কার্য্যে তুমি যদি তুষ্ট হও, বিশ্ব এমনিই তুষ্ট হবে, সবাইকে তোমার খুশী করতে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। শত বেদনার মাঝে দুঃখকে পুঞ্জীভূত রেখে সব-কিছু তার মনের স্বরূপকে ঢেকে বাইরের প্রত্যেককে এমনি করে যেমন খুশী করার উদ্দেশ্যে, যেমন নানা অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে সেই ভূষণের সামঞ্জস্য রেখে নিজেকে বিকৃত করছে আর একজনের খুশির নিকটে খুশী করার উদ্দেশ্যে। আর অন্তরে জ্বলছে বেদনার জ্বালা, ঠিক সত্য যেন ভয়ে লুক্কায়িত রয়ে যাচ্ছে। স্বরূপ তার রূপেতে নেই—অলঙ্কারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তুলির টানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে নিজেকে আকর্ষণ করাবার উদ্দেশ্যে আকর্ষিত হয় তার বাইরের আবরণের দ্বারা। যে বাহবা নিয়ে সাফল্য লাভ করছে শত অপরাধের মাঝে অপরাধী সেজে, বৃত্তিকে বিকৃত রূপে বিক্রি করে যাচ্ছে,—সত্য রয়েছে যেন বহু দূরে। সে নিজেকে নিজে উপলব্ধি ক'রে তাকে যেমন তার কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে—নটী এই উপমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। তুষ্টিতে অসন্তোষই যেন বিরাজ করছে, তাই 'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট' ঠিক ঐ জাতীয় অবস্থা নিজে তুষ্ট না হয়ে কখনও করবে না। তখন মনের ভেতর যেন দৈন্যের অবস্থায় দারিদ্র্যকেই পোষণ করবে—গরীব সেই, দরিদ্র সেই, ধনহীন মানে জ্ঞানহীন; তাই নিজের বৃত্তির পরিচালনাতে যখন নিজেই তুষ্ট হবে, তখন জগৎ তুষ্ট আপনিই হবে।" ঠাকুর এখানেই

সেদিনকার মত শেষ করলেন। তারপর উঠে যাওয়ার সময় একটু হেসে হেসে তিনি বললেন, "তবে এও হতে পারে, যদি অবস্থার অবস্থার সাথে মিশিয়ে থাকার মত অবস্থা ক'রে নিতে পারে। অলঙ্কার তখনই সাজে, ধনী যদি প্রেমের বাঁধনে বাঁধা থাকে। ভিখারীও লক্ষ টাকা নাড়ে, ভিখারী ও ধনী যদি একই ধ্বনিতে গাঁথা থাকে—ধনীর ধনের অধিকারের অধিকার তখনই আসবে। লক্ষ টাকার বাণী তাতে শোভা পাবে, যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে পড়ে। তাই শূন্যতেও 'গিঠ্‌' মারা যেতে পারে, নিজেকে যদি পূর্ণ ভেবে নিয়ে যেতে পারে, মানে—ভিখারীর confidenceএ ধনী move করে—এ ধারণা যদি ধনীর পোষণে থেকে থাকে, ভিখারীর কথাতেও ধনীর ধ্বনিই থাকে।"

—

সাতাশ

একদিন আমরা* কয়েকজন ঠাকুরের নিকট বসে† আছি। লোকজনের খুব সমাগম হচ্ছে। আমরা বেশীর ভাগ সময়ই লোকের ভিড়-নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত। আমরা কিছুদিন যাবৎ চিন্তা করছি এবং নিজেরা নিজেরা আলাপ করছি, 'বহুদিন থেকে তো ঠাকুরের আদেশ ও উপদেশগুলো লিখে যাচ্ছি, সবগুলোকে একত্র ক'রে ঠাকুরের জীবনী লিখতে চেষ্টা করা যাক্।' অনেকেই ঠাকুরের জীবনী লিখতে সুরু করেছে। এক-একজন এক-একটি জীবনী লিখে নিয়ে এসেছে। ঠাকুর বললেন, "ওসব এখন রেখে যাও, সময়মত নিয়ে যেও।" স্বাভাবিকভাবে যে জীবনী লেখা হয়, ঐ জীবনী-প্রসঙ্গে তিনি নিজের জীবনকে লিখতে দিতে রাজী নন। প্রত্যেক জীবনীরই দিন ক্ষণ তারিখ দিয়ে দিয়ে ওগুলোর মর্য্যাদা দিয়ে গেছেন। এখন মহাপুরুষই মহাপুরুষ, না ঐ দিন-ক্ষণ-তিথিই মহাপুরুষ—সেটাই চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকারান্তরে সেই সমস্ত মহানের জীবনীতে ঐ দিন-ক্ষণ-তিথিরই গুরুত্ব বাড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তাঁর এখানে প্রশ্ন হলো, 'এই আবহমান গতির সব দিন, সব ঘণ্টা, সব সেকেণ্ডই যে important, প্রতি মুহূর্ত্তই যে important, সেই সেই মুহূর্ত্তে

---

* যদুনাথ রায়, অশ্বিনী চাটার্জ্জি, বারীন ঘোষ, দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী (২), সুভাষ চক্রবর্ত্তী, পরেশ রায়, অমূল্য বসু, শান্তি দাস মজুমদার, অজিত ভট্টাচার্য্য আরো অনেকে।

† স্বামীবাগ, ঢাকা।

যার যার জন্ম, সবারই যে importance রয়েছে ; সুতরাং বিশেষ ক'রে বিশেষে importance দিয়ে আর হওয়ার ভাবকে নানাভাবে পরিণত ক'রে তাঁর জীবনকে একটা আগমনের আগমনীর ভাবের মত আবির্ভাব বলে যে বলা, ওটা এক জাতীয় 'হালকা' প্রশংসা।' তিনি নিজের বেলা এ জাতীয় প্রশংসা নিতে রাজী নন। তাই আমরা কয়েকজনে মিলে ভেবে চিন্তে কয়েকটি লেখা নিয়ে তাঁর কাছে দিলাম। তিনি নিয়ে পড়তে লাগলেন :—

"বাংলা তেরশ' ছাব্বিশ সালের বাত্যা-বিধ্বস্ত পূর্ব্ব বাংলার বুকে আবার শরতের আবির্ভাব হয়েছে। সর্ব্বস্বান্ত ক্লিষ্ট নরনারীর মনে নূতন আশার আলোক উঁকিঝুঁকি মারছে, আবার চলে যাচ্ছে বহু দূরে, মন আবার নৈরাশ্যে ভরে উঠছে, আবার আশার উদ্ভব হচ্ছে ; এই ভাঙ্গাগড়ার আবর্ত্তনের মাঝে আবির্ভূত হলেন জ্যোতির্ম্ময় মহামানব জ্যোতির বর্ত্তিকারূপে বিশ্বমানবের জীবজগতের আলোর 'আলো'কে আলোকিত করে তোলার জন্য।"

ঠাকুর এ পর্য্যন্ত পড়েই বললেন, "আর যারা এখানে জন্ম নিচ্ছেন তাঁরা কি অন্ধকারের জন্য নাকি ? আর এ জাতীয় ব্যাখ্যা আমার পেছনে লাগাবার দরকার নেই। এ ব্যবস্থা সবার উপর প্রযোজ্য। বাংলা তেরশ' ছাব্বিশ সালের বাত্যা-বিধ্বস্তের পরের সনে জন্ম—ঐ তারিখে, ঐ দিনে, ঐ তিথিতে জীবজন্তু, মশা-মাকড়, কীট, কীটাণুকীট—বহুর জন্ম হয়েছে। হালখাতার খরচায় সবারই এক পড়তায় লেখা,—কোনটা তেজপাতা, কোনটা কালিজিরা, কোনটা চিনি, কোনটা চিরতা ; capital একটিই, প্রয়োজনের তাগিদে কেবল ক্রয়। বস্তু এক—নাম কেবল প্রভেদ, প্রকারান্তরে দেখছি সবই এক। সুতরাং জ্ঞানবান ব্যক্তি—জীবজগতে প্রত্যেকেই জ্ঞানবান ব্যক্তি—একে অন্যের সাহায্যে শিক্ষা, আদান-প্রদানে শিক্ষা, খাওয়া-দাওয়া চলা-ফেরায় শিক্ষা, প্রকারান্তরে জ্ঞানের শিক্ষা, spiri-

tual শিক্ষা দান সবাই ক'রে যাচ্ছে, এটা তো kind of spiritualism—spiritualist সবাই, activities প্রকারান্তরে সবাই করে যাচ্ছে। 'গুরু' শব্দ গম্ভীর এবং গতিদাতা, সবার উপর প্রযোজ্য, গতি সবাই সবারই ক'রে যাচ্ছে। সুতরাং বিশেষভাবে বিশেষণ লাগিয়ে সৌন্দর্য্যপূর্ণ করার কোন প্রয়োজনীয়তা এখানে আসে না। আমরা সৌন্দর্য্যের পূজারী—এ বিরাটই সৌন্দর্য্য, art এখানেই, সৌন্দর্য্য এখানেই, মাধুর্য্য এখানেই। বলতে পার, 'আমাকে প্রকাশ করা বিরাটকেই প্রকাশ করা—তারই নামের প্রকাশ করছি।' যুগ-যুগান্তর অনন্তকাল যাহা হয়ে এসেছে, হচ্ছে এবং হবে—বর্ণনা আসবে সেই ভাবে; আবার তুমিও যে তার মধ্যে বর্ণনার গণ্য, তোমাতে আমাতে পার্থক্য কোথায়। তুমি জানাকে জানছ, আমিও জানছি, তবে স্কুলে একই লম্বা ঘর—কেবল এগিয়ে যাওয়া। সুতরাং major portion concentrated হয়ে হয়ে এক-একটি রূপের বিকাশ করছে। তুমিও প্রকারান্তরে এক জাতীয় ক'রে যাচ্ছ যখন, সেখানে আর এই ভাবে বিন্যাস না করাই সমীচীন মনে করি—আরো মনে করি, কারণ একটা ব্যক্তিগতভাবে importance দিলে আর একজনের মনে এমন একটি বিফলতা আসবে, সে বিফলতা নিজের মনের দুর্ব্বলতাকে ঘিরে অনেক দূরে নিয়ে যাবে। প্রত্যেকের মনেই এমন একটা অভাব এসে দাঁড়াচ্ছে এবং নিজেকে পাপী মনে করছে, এ সমস্তের কারণই হচ্ছে নিজের প্রতিভাকে ব্যক্তিগতভাবে ও'সমস্ত দিয়ে বের ক'রে দিয়েছে, সেই সমস্ত প্রতিভাশালীর গুণ শুনে আনুষঙ্গিক গুণসম্পন্ন তারা নিজেদের শক্তিতে নিজেরা জড়িয়ে পিছিয়ে যাওয়ার রাস্তা তৈরী করছে, এবং যেখানে মনঃক্ষুণ্ণ নৈরাশ্য বিফলতাকেই এগিয়ে দিচ্ছে। আগ্রহ করবার জন্য যতটা না হয়, নিরুৎসাহের অবস্থাটাই বেশী করছে, কারণ নাড়াচাড়া ক'রে বেশীর ভাগ তাই দেখা যাচ্ছে, হতে পারে অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি আছেন সেই

সম্বন্ধে কথা বলা হচ্ছে না। আমার সঙ্গে 'নিরুৎসাহ,' 'হবে না,' 'হচ্ছে না' বেশীর ভাগ এই জাতীয় ব্যক্তিদের দেখা হয়েছে। তাদের বেলায় 'হনুমানের পর্ব্বত-আনয়ন'—পর্ব্বত-আনয়নে তাকে এমন দামই দিলো, আর একজন তো টেবিলখানা উঠাতে পারছে না, তখনই তার ভেতরে এমন একটা নৈরাশ্যের ভাব আসলো, 'ভগবানের কৃপাও হবে না, আমারও আর কিছু হবে না'; তাতে নিজের না হওয়াতে এমন একটা অবস্থা এসে গেল, শেষবেলায় দেখা গেল নিজের হাতটাও ওঠাতে কষ্ট হচ্ছে। সুতরাং বিরাট এই সৃষ্টির জীবজগতের যখন প্রত্যেকটি individualityর মধ্যে বিরাট রয়েছে, প্রত্যেকের প্রত্যেকের সেই বিরাটত্বকে প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অনুভূত জিনিষগুলোকে অনুভব ক'রে প্রত্যেক কে বুঝিয়ে দেওয়া তার নিজস্ব সাড়াকে, সাড়ার জন্য আগ্রহ করিয়ে দেওয়া—সাধনা সেখানেই সফল হবে, অন্যত্র প্রসাধনস্বরূপ। কিন্তু আসল রূপটির সন্ধান কোথায়—সে যে প্রসাধনের চাপে পড়ে যাচ্ছে, তার উপর নির্ভর ক'রে বিবাহ করা যায় না, সৌন্দর্য্যের সেখানে বর্ণনা করা যায় না। বিয়ে হচ্ছে বহন করা—যাকে আমি বহন করবো তার সম্পর্কে সম্পূর্ণ রূপটিকে জেনে জানিয়ে তারপর জেনে—তবেই তো সেখানে সম্পর্কিতকে সম্পর্করূপে স্থাপন করা হবে।" তারপর আমরা এ সমস্ত শুনে কাগজপত্র নিয়ে পুনরায় বসলাম আর একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছি এখন কি করবো।

* * *

"এর আগে তোমাদের মধ্যে একজন* বলেছিলে যে একটি সুন্দর বই লিখবে। লেখার আগে নিজের কাছে নিজের তৃপ্তি করে নেও। আজ তোমার লেখার অবস্থা এসেছে সবাইকে তৃপ্ত করার জন্য। নিজে হয়ে যাচ্ছ যোগানদারের মত, সেই যোগানদার না হয়ে গিয়ে

* বারীন ঘোষ।

ওস্তাদ হও, তখন দেখবে সহজভাব সহজ কার্য্যকলাপ— অভিধানকেও বলবে, ঐ দিকে থাক। এখন তুমি অভিধানকে নিয়ে করছো মারামারি, কারণ ভাষার ছড়াছড়িতে তুমি যাচ্ছ কিনা, ভ্রান্তি হবে তখন—একি গাছের ফুল না কাগজের ফুল? তুমি কাগজের ফুল তৈরী ক'রে ফুল বলে ছেড়ো না। তুমি তো জান যে এ প্রকৃত ফুল নয়, ভুলের মাঝে গড়াগড়ি করছো। তুমি সেই বীজ বপন কর, তার nursery কর, সত্তঃ ফুলকে বাজারে ছাড়—নিজের তৃপ্তি সেখানেই থাকবে, স্বাভাবিক মতে সবাই তৃপ্তি পাবে। আর ওকে তুমি যতই স্বাভাবিক করতে যাও না কেন, আর যতই ওকে scent দিয়ে টবে দেখাচ্ছো না কেন, তুমি নিজের সন্দিগ্ধে নিজের দ্বন্দ্বে ভেতরে ভেতরে জ্বলছো তার কারণ এ যে কাগজ দিয়ে তৈরী করছো তাতো তুমি জান। অন্যকে সাময়িক সত্য বলে দেখালে তাতে তোমার শান্তি কিসে? ধরা যে পড়বেই, তাই শান্তি খোঁজ নিজের মধ্যে। তখন শান্তিমূলক বাণী আপনি আপনি ঝরে পড়বে শিউলি ফুলের মত, তোমার ঝাঁকা দিতে হবে না, যখন ফুটবে তখন আপনিই পড়বে, তোমার টানতে হবে না। তুমি সেই রোপন কর, তার nurse কর, তার সাধনা কর, প্রাকৃতিক নিয়মে আপনিই সব-কিছু হবে তখন। তাই তোমাদের জিজ্ঞাস্য যা-কিছু, যতটুকু এখন পারলাম বলে দিলাম। পরে এ বিষয় আরো কিছু details আলাপ দরকার, এত অল্প সময়ে হয় না। আর এক সময় এসো তোমায় আরো কিছু বলবো।" ঠাকুর কথা শেষ ক'রে উঠে ভেতরে চলে গেলেন।

আঠাশ

ঠাকুর তখন সহরে* আছেন। লোকজনের ভিড় রোজই হচ্ছে। আমাদের মধ্যে অনেকেই নেই। কার্য্যব্যস্ততার জন্য তারা তাঁর সঙ্গলাভের সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত। শুধু আমরা† কয়েকজন তাঁর সাথে আছি। এর মধ্যে বহু রকম রোগী এসেছে, সেগুলো সম্পর্কে কত আর লিখবো। কয়েকটা ঘটনা শুধু লিখেছি। একটি ছেলে‡ সেও উন্মাদ, নগ্ন-অবস্থায় এসেছে। তার বাবা§ তাকে নিয়ে বসে আছে। এর মধ্যে আর একজন, স্বপ্নে মন্ত্র পেয়েছে; বহু জায়গা ঘুরে এসেছে কেউ তা বলে দিতে পারেনি; তাই ঠাকুরের নাম শুনে এসেছে। ঠাকুর তাকে বললেন, "বেশ তো, কাল আসবে।" তারপর ঠাকুর ঐ ছেলেটিকে সামনে আনতে বললেন। তারা ওকে সামনে নিয়ে এলো। ঠাকুর বললেন, "তোমরা একটু বাইরে দাঁড়াও।" সবাই বেরিয়ে গেল। ছেলেটির বাবা ও ভাই এবং আমরা কয়েকজন রয়ে গেলাম। ঠাকুর আমাদের মধ্যে তিনচারজনকে ডেকে বললেন, "তোরা ও ঘরে গিয়ে কাপড় ছেড়ে নগ্ন-অবস্থায় বসে থাক। তোরা পাগলের সাথে সাথে চীৎকার করবি, পাগল যা যা করবে ঠিক তা তা করবি। তারপর জল পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তোরা তো

* স্বামীবাগ, ঢাকা।

† শান্তিদাস মজুমদার, অমরেন্দ্র দাশ, অজিত ভট্টাচার্য্য, অনিল ঘোষ, দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী, কালিদাস ব্যানার্জ্জি।

‡ রাখাল দে।

§ হরমোহন দে।

ভাল আছিস্‌ই, তোরা জল খেয়ে কাপড় পরে এসে পড়বি।" আমরা আদেশমত সে ঘরে গিয়ে বসে আছি। সব জানালা বন্ধ, একটি আলো কেবল ঘরে আছে, দরজাটা একটু ভেজানো। তারপর আমরা তো সেভাবেই রইলাম। এরপর ঠাকুর সেই পাগল ছেলেটি, তার বাবা ও ভাইকে সাথে নিয়ে এলেন। দরজটা ভেজিয়ে ঠাকুর অন্যত্র একটু বসলেন। পাগলও চীৎকার করছে, সাথে সাথে আমরাও চীৎকার করছি। দুই চীৎকারে বেশ জমে গেছে। আমরা নিজেরাই হাসছি নিজেদের রূপ দেখে—আমাদের হাসিও উন্মত্ততার মধ্যে মিশে গেছে। কতক্ষণ পরে ঠাকুর জল পাঠিয়ে দিলেন। আমরা জল খেলাম, জল খেয়ে আমরা ভাল হয়ে গেলাম, কাপড় পরলাম। পাগলটিও আমাদের দেখাদেখি বলে উঠলো, "আমার কাপড়টা?" ঠাকুর আগেই ওর জন্য কাপড় প্রস্তুত রেখেছিলেন। কাপড়টা ওকে দিয়ে দিলাম, ও কাপড়টা দেওয়া মাত্রই পরে ফেললো। তারপর ওর সাথে গল্প করলাম—কে বলবে যে ও উন্মাদ ছিল। ব্যাপারটা আমাদের কাছেই একটু অদ্ভুত মনে হলো। তারপর আমরা ভদ্রভাবে চারজন বের হলাম। আমরা গিয়ে প্রণাম করলাম, সেও প্রণাম করলো। ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কি? বাড়ী কোথায়?" সে সব কথারই স্বাভাবিকভাবে উত্তর দিলো। তারপর ওর বাবা ও ভাই কান্নাকাটি ক'রে পায়ে পড়লো। ঠাকুর বললেন, "এ কিছুই তো নয়, মস্তিষ্কের বিকৃতির কারণ উদ্ভব করতে পারলেই তা হয়।" তারপর তারা দীক্ষিত হলো এবং চলে গেল। ঠাকুর আমাদের সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন।

ঊনত্রিশ

ঠাকুর সারাদিন পরিশ্রম ক'রে বিশ্রাম করছেন*, এমন সময় একটি লোক এসে উপস্থিত হলেন। লোকটি বসে অপেক্ষা করছেন। তারপর ঠাকুর উঠলেন ও লোকটির সাথে দেখা করলেন। ইতিমধ্যে আরো অনেক লোক এসে অপেক্ষা করছিলো। সবাই ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করলো। ক্রমশঃ ক্রমশঃ লোকের ভিড় বাড়তে আরম্ভ করলো। ঐ ভদ্রলোককে ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন তাঁর কোন বক্তব্য আছে কি না। লোকটি বললেন, "সাধন ও আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি সম্পর্কে আপনার সাথে দু'চারটি কথা আছে।" ঠাকুর বললেন, "বেশ, কি বলুন।" ভদ্রলোকটি বললেন, "আমি শুনে এসেছি আপনি কাউকে মানছেন না, সবাইকে উড়িয়ে দিচ্ছেন। সবাই কি ভ্রান্ত? আর আপনার মতই একমাত্র ঠিক?" ঠাকুর বললেন, "বেশ তো, আলাপে যদি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন যে আমার মত ভ্রান্ত, তবে তো এত কথার প্রয়োজন হয় না। আমি তো সেটাই চাই।" ভদ্রলোক বললেন, "আমি প্রায় আঠারো উনিশ বছর যাবৎ সাধনা করছি। পুঁথি-গ্রন্থাদি যে পাঠ করি নাই তা নয়, যথেষ্ট পড়াশুনা করেছি, আপনার মতবাদও শুনেছি, কিন্তু আমার একটা ব্যক্তিগত অনুভূতি

---

* স্বামীবাগ, ঢাকা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ:—কালিদাস ব্যানার্জ্জি, সুভাষ চক্রবর্ত্তী, বিপুল চক্রবর্ত্তী, ভূপেন রায়, নৃপেন রায়, দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী (৩), বারীন ঘোষ, অজিত ভট্টাচার্য্য, শান্তিদাস মজুমদার আরো অনেকে।

আছে, সেটা তো আর অস্বীকার করতে পারবো না যে আমি দেখিনি বা এটা একটা ভ্রান্তি।" ঠাকুর বললেন, "সাধনার দ্বারা সবই সম্ভব। আপনার যখন নূতন অনুভূতি একটা কিছু হয়েছে, তখন তার বিশেষত্ব একটা কিছু আছেই।" তখন সাধক-ভদ্রলোক এমন চটে গেলেন যে ঠাকুরকে বললেন, "আপনি খুব বড় বড় কথা বলছেন।" ঠাকুর বললেন, "বড় কথা কি আর আমি বলি, যে জিনিষটা বড় তাকেই তো বড় বলছি। আমি নিজে কি আর এ কথা বলছি যে বড়, শুধু শুধু কেন আমাকে দোষারোপ করছেন? বড়কেই তো বড় বলছি। আপনি বেশ কাঁটাকাঁটা আমারই মত কথা বলছেন—বেশ আনন্দও লাগছে। আমিও আপনাকে বসে বসে খোঁচাবো, আপনিও আমাকে খোঁচা দিবেন—দেখি খোঁচায় খোঁচায় কিছু বের হয় কি না। এর আগে আর একটি কথা বলছি এই যে জাতীয় কথা বলছি, এরকম হালকা ভাবের জন্য কিন্তু আপনিই দায়ী ; কারণ 'স্ত্রীর ভাই' বলে যাকে তাকে বকা দিলে কিন্তু সাংঘাতিক চটে যায়, আবার সম্পর্কে আস্‌লে সম্বোধনে থেকে তখন সেটা খুব মিঠা লাগে। আপনাতে আমাতে সেই জাতীয় কোন সম্পর্ক নেই যে মিঠা লাগবে। আমি এখন চটাং চটাং কথা বলবো, আর তা না হলে একান্ত যদি মিতালিতে না আনতে পারেন, অভিনয়ে গিয়ে যতটা পারেন মিতালির চেষ্টা করুন—সে সম্পর্কটাও সাময়িক চালিয়ে নেওয়া যায়। কোন্‌টায় থাকবেন চিন্তা করুন।" সাধক-ভদ্রলোক বললেন, "আপনি আমার অনুভূতির কোন দামই দিচ্ছেন না, আমি আঠারো বৎসর বহু শাস্ত্র-অধ্যয়ন করেছি, বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সাথে মিশেছি, তাদের সাথে শাস্ত্রগত ও অনুভূতি সম্পর্কে আলাপ ক'রে আমি বেশ তৃপ্তি লাভ করেছি। আপনি এ সম্বন্ধে অনুভূতিতে আসেননি বলে মনে হচ্ছে। আপনার পথ অন্য রকম।" ঠাকুর বললেন, "কথাগুলো বেঠিক নয় একেবারে, আপনি যখন শাস্ত্র পড়েছেন বলছেন, কি

পড়েছেন না পড়েছেন তা আপনিই জানেন, তবে পরিচয় যা পেলাম—এখন কাকে রাখি আর কাকে ফেলি ? আমার লাইন তো অন্য লাইন —সব বে-লাইনদের ধরবার জন্য ; এর জন্যই আপনার সাথে বনছে না, খপ্পরে বুঝি পড়ে গেছেন তাই জ্বালা উঠেছে। তাড়া দিচ্ছি, আস্তে আস্তে অনেক বের হবে। প্রশংসা যাঁরা করেছেন আপনার, তাঁরা তো আরো কোন অবস্থায় আছেন, আপনার প্রশংসা যে করেছেন তাতেই বেশ বোঝা যাচ্ছে। আপনার নূতন একটা অনুভূতির মধ্যে যদিও আমি আসিনি, তবে এটুকুনু হয়েছে আপনারটা আমার মধ্যে এসেছে, তাতেই যথেষ্ট।" সাধক-ভদ্রলোকটি সাংঘাতিক চটতে আরম্ভ করলেন। আমরা বসে বসে শুনছি আর হাসছি। ঠাকুরও মুচকি হাসছেন, আর সাধক কেবল চটেই যাচ্ছেন। তিনি একটু উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন, "আঠারো বৎসরের সাধনাই কি মিথ্যা ? এ কক্ষনও হতে পারে না, এ আপনার ভ্রান্তি, আপনি আমায় উড়িয়েই দিচ্ছেন। জানেন, আমি দৈনিক দুই লক্ষের উপর জপ করি, নিরামিষাশী, মিছে কথা বলি না, আপনার কাছে এর কোন দাম নেই ? আপনার বিষয় শুনে যা'ও একটা ধারণা ছিল এখানে এসে তাও গেছে। আমি সোজাসুজি কথা বলি, পরোক্ষে বলে কিছু অভ্যাস নেই।" ঠাকুর চুপ ক'রে সব শুনছিলেন, এরপর তিনি বললেন, "অনেক কথা তো বললেন। আমি কিছু না বলতেই আপনি যে সব ছাড়লেন তাতে এই পরিচয় দিলেন, নিজের ফাঁকিতে নিজেই জ্বলছেন। আমি তো বলিনি যে আপনি মিথ্যে কথা বলছেন, ছল করছেন বা ফাঁকি দিয়েছেন। আমি বলেছি আপনারটা ধরা পড়েছে। সন্দেহে যে আপনি আছেন সেই সন্দেহের ভাষণই জানাচ্ছেন, তা স্বাভাবিক। একটুতেই যখন এ পর্য্যন্ত, বললে তো আর কিছু থাকবেই না, চামরাখানা পর্য্যন্ত খুলে দিবেন দেখছি। আর আমি কিছু বলি বা না বলি, আপনাকে সাধু কই বা না কই, আপনি যখন পেয়ে গেছেন,

আমার কথা শোনবার জন্য এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এ বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ না বলার মত যে—চটবে তো স্বাভাবিকই, আপনি আর কি ছাই। আমায় বসে বসে আর গালি দিলে কি হবে? যা বোঝার ঠিকই বুঝেছি, আপনি লাঠি দিয়ে বাড়ি দিলেও আপনাকে আমি এক বুঝই বুঝবো, আপনাকে যা বুঝেছি, আমি সে বুঝই বুঝে থাকবো। সুতরাং আপনার উপর খুসী হয়েই বা কি হবে, রাগ করেই বা কি হবে? ঢেউ তো পাছে খেলছে—আপনার ব্যঙ্গ, রাগ, ঝাপটা সেই মতই চলছে। তাতে আমার কি হলো? আমার বুঝ থেকে জোর ক'রে সরাতে চাচ্ছেন কেন?" "আপনি কি বলতে চান আমার এই যে এতদিনের অনুভূতি দর্শন এ সব কি ভ্রান্তি?" ঠাকুর বললেন, "যদি অনুভূতিতে আসতো তবে আপনার কথাবার্ত্তা সেই ভ্রান্তিহীনের মত হতো। একজনকে ছোটবেলায় চোখে টিপ দিয়ে দু'খানা 'বাবা' দেখিয়ে দিয়েছিলাম। যাকে দেখিয়েছি সে আঙ্গুল দিয়ে বলেকি, 'আমার দুটো বাবা একরকম।' আর সব্বাই হাসাহাসি। যে বলছে সে ঠিকই দেখছে, চোখে যে খোঁচা লেগে চোখের pressureএ যে দেখছে, অবস্থাটি যে বিকৃত সে সেটা ভুলে গেছে; বস্তুতঃ কিন্তু বাবা একটিই। তাই আপনার আবার কোন্‌খানে খোঁচা লেগে কোন্ খানে কি আট্‌কে আছে, কি হয়ে আটক হয়ে গেছে, কি চোখের সামনে দেখছেন, কোথাকার লাইট কোথায় দেখছেন, উত্তরের লাইট দক্ষিণে দেখছেন কিনা কে জানে। পাশের ঘরের বাতি আপনার ঘরে জ্বলছে, কিন্তু আপনার ঘরে বাতি আছে কি নেই তা জানেন না, আপনি ঐ আনন্দেই নৃত্য করছেন। আর একবার ছোটবেলায় বাচ্চাদের খেলা দেখছি। একজনকে বললাম, 'তুই নিজে নিজে ঘোর্‌ তো, দেখবি কত কিছু।' অনেকক্ষণ ঘুরতে ঘুরতে পায়ে পায়ে লেগে ছেলেটা পড়ে গেছে। তারপর সে দেখে কি, চার ভিটার চার ঘর লাট্টুর মত অদ্ভুতভাবে ঘুরতে আরম্ভ করেছে, আর চীৎকার

করছে, 'ঘরবাড়ী ঘুরছে, উঠান বাঁকা হয়ে উঠছে।' গয়াতে যেমন গয়াসুর উঁচু হয়ে উঠেছিলো, বিষ্ণু যেমন তাঁর পাদপদ্মের স্পর্শে দাবিয়ে রেখেছিলেন গল্পে আছে, সেরকম তার উঠানটা একেবারে খাড়া হয়ে গিয়েছিলো। সে চীৎকার—'উঠান বাঁকা হয়ে গেছে, উঠান বাঁকা হয়ে গেছে।' তখন আমরা বললাম, 'গয়াসুর মনে হয় তল দিয়ে এসেছে।' তাড়াতাড়ি ভয়ে ছেলেটি মুতে দিয়েছে। আমি বললাম, 'আরে সর্ব্বনাশ, করলি কি? গয়াসুরের গায়ে শেষবেলায় মুতে দিলি?' তখন হা করে তাকিয়ে আছে। তাড়াতাড়ি এক বাল্‌তি জল এনে মাথা ধুইয়ে ফেলা হলো। গয়াসুর যখন গলা দিয়ে উঠে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, তখন একটু শান্তি পেলো। ব্যাপারটা হচ্ছে এখন, এখন কোন অসুরের প্রকোপ আপনার ভেতর দিয়ে— তাই বিষ্ণুর পাদপদ্ম না পড়া পর্য্যন্ত তো সেটা থামবে না, তাই একটা বড়ির দরকার। জ্ঞানানন্দ হতে কয়েকটা জ্ঞানের বড়ি খেয়ে আসবেন, তবে বুঝা যাবে কি অবস্থা আপনার মধ্যে চলেছে। আপনিও বাঁকা আমিও বাঁকা, সুতরাং বন্ধুত্বের ভেতর দিয়ে মিলবেই। আপনি বুঝবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করেই এসেছেন; আর বুঝলেও বুঝ নিবেন না, এই ঠিক করেছেন; আর বুঝলেও ভেতরে নিয়ে কাজ করবেন না তাহা স্থির করেছেন। এরকম অনেক পদার্থের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, যত বোঝাতে গেছি নিজের ভুল বুঝতেও পেরেছে তবুও সেই চিরপ্রথা সংস্কার এমনি আঁকড়ে ধরেছে যে কিছুতেই আর ছাড়তে পারছে না। সেটা যে আপনার মধ্যেও কিছু কার্য্যকরী হচ্ছে না তা নয়, বেশ ভালভাবেই হচ্ছে। এই নিরামিষ খেয়ে যে সাত্ত্বিকতার পরিচয় দিলেন, উপকারের দিক্ দিয়ে কতটুকু এগিয়ে গেছেন ব'লে আপনার মনে হয়। এখন তো আর চটাচটির মধ্যে কেউ নেই। শুধু দু'জনেই চটাচটির কথা বলছি। কেউ কাউকে অপমান করছে না, চটার সম্ভাষণ করছে।" তখন

সাধক-ভদ্রলোক বললেন, "আমার মনসংযম হয়েছে।" ঠাকুর বললেন, "কৈ? আপনার রাগ রয়েছে, অভিমান রয়েছে, ছেলেপিলে হচ্ছে—দরজা তো দেখি সবই খোলা। বৈরাগ্যতা কি কেবল মুখে মুখেই নাকি? নিরামিষাশী জীব অনেকেই আছে, কিন্তু কামের খোরাক দেখলে দৌড় ঠিকই আছে। পরিবর্ত্তন আর কি হচ্ছে?" তারপর সে সাধক অনেক মহাপুরুষের কথা আলাপ করলেন, কে কি হয়ে গেছেন, না গেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। ঠাকুর বললেন, "যাঁরা হয়ে গেছেন বা চলে গেছেন, তাঁদের এখানে টেনে এনে তো লাভ নেই। আর তাঁদের পরিচয়ের প্রতীক যদি আপনিই হয়ে থাকেন, তবে তাঁরা যে আবার কতবড় ওস্তাদ! আপনার পরিচয়েই কিন্তু তাঁরা ফেঁসে যাচ্ছেন।" হঠাৎ ভদ্রলোক একটু তটস্থ হয়ে উঠলেন, "না, আমি আর তাঁদের কতটুকু পরিচয় দিতে পারি?" ঠাকুর বললেন, "ও! আপনার ভক্তি বুঝি মোহের ফাঁকেফাঁকে উঁকিঝুঁকি দেয়? আপনি যে একেবারে cosmopolitan—যে মুহূর্ত্তে ঐ মহান্‌দের উপর চোট পড়েছে,—গল্পে আছে বায়স যে ময়ূর সেজে ছিল, চাপে পড়ে যেমন তার স্বরূপ প্রকাশ হলো, এও দেখছি ঠিক তাই; নিজের উপর বিশ্বাস তো বেশী নেই, তাই অবিশ্বাসের পরিচয় যে আমি পেয়েছি সেটা বেশ বুঝতে পারছেন। যখন বুঝলেন আপনার বুঝের উপর নির্ভর ক'রে ঐ মহান্‌দের ধাক্কা দিলাম, তখন 'পের্‌পের্‌' ক'রে আপনার রূপ বেরিয়ে গেল, ভাবলেন, 'এমনিই তো অপরাধী, তারপর আমার অপরাধে তাঁদের উপর একটা অবিশ্বাস জন্মিয়ে দিচ্ছি' এবং সেই মহাপাপের চিন্তা ক'রে একটু ভীত হয়ে নিজের আরোপিত রূপটি ভুলে গিয়ে আসল রূপটি বেরিয়ে গেল; আরোপ ক'রে তো আমার কাছে অনেকক্ষণ ছিলেন, একটু বাতি জ্বেলেই দেখলাম, কিছু না—'দড়িটা'। এখন দেখলেন বোড়ের একটু চাল মাত্র। একটু চালেতেই ফাঁস হয়ে গেলেন। এখন আবার তাড়াতাড়ি

দৌড়াতে থাকেন আপনার চেহারাতে, 'হায়রে! ব্যাপারটা কি করলাম।' " তখন সাধক-ভদ্রলোক ধানাই পানাই করছেন, ঠিক জবাব দিতে পারছেন না। তখন-তখন ঠাকুর তাঁকে ধরলেন, "সত্য কথা বলতে এত দেরী হয় না। দেরী তো করতে হবে, কোনটা বসাতে কি বলে কি পরিচয় হয়ে যায় সেই ভাবনাতেই—এ্যাঁ-এ্যাঁ-এ্যাঁ। তারপর দেখলাম কষ্ট পাচ্ছেন, তাই তাড়াতাড়ি একটা relief করার জন্য আপনাকে পুনঃ প্রশ্ন করতে লাগলাম। এখন আবার রাগ করুন, আছেই সম্বল দু'তিনখানা—চটে যাওয়া, রাগ করা, আর আপনি কিছু এই লাইনে বোঝেন না।" তখন তিনি ঠাকুরকে বললেন, "আপনাকে আমি সে রকম ভাবে তো কিছু বলিনি?" ঠাকুর বললেন, "আবার compromiseএ কেন? জ্ঞানের বেলায় বন্ধুত্ব নেই, কোন compromise নেই, তাতে আপনাকে আমি ছাড়বো না, আর আমাকে আপনি ছাড়বেন না। আতিথ্য করবো, যখন আবার আতিথ্যের সময় আসবে। কথাগুলো কাটখোট্টা বুঝলাম এবং শুনতে বেশ শ্রুতিকটু। বাইরের অনেকেই বলবে লোকটা কি রকম কথা বলছে, চটাং চটাং কথা বলছে, ভদ্রতা রেখে কথা বলছে না, পরিহাসপূর্ণ কথা বলছে—এই সব চিন্তা করেই বুঝি মুখরোচক কথা বলতে আরম্ভ করবো ভেবেছেন? মুখরোচক কথা যদি হতো, সেই জাতীয় রুচিপূর্ণ কথাই হতো—এ যে রুচিহীনের কথা বলছেন। আমি জোর করে রুচিতে কি ক'রে আনি? আপনার হয়েছে সর্দ্দির ব্যারাম, আমি যত সুগন্ধিই আপনাকে খাওয়াই না কেন, আমার জিনিষের উপর রাগ করছেন, 'কোন গন্ধবাস নেই, ভাল লাগছে না' শেষবেলায় হিং রসুন পর্য্যন্ত এনে দিলাম, সেও ঠিক বার্লির স্বাদ। তখনই তো চিন্তা করলাম, এ পদার্থটি কি? আর দেখলাম যে নাসিকায় ব্যারাম, তাই ঔষধ প্রয়োগ না করলে কি করে সম্ভব? কোন জ্ঞানের কোন জিনিষের মধ্যে নেই, কোন চিন্তাযুক্ত

জিনিষের . মধ্যে নেই, কিছুর মধ্যে নেই। পুরাকালে অনেকে ঘর তৈরী করতো জানালাহীন—বোঝেনই তো অবস্থা কি দরজা বন্ধ করলে। কেন করতো ?—'আখাটার খাটা' বেশী তো, গিন্নীদের ঐভাবে পাহারা দিয়ে রাখতো ; সুতরাং তারাও চালাক সেইভাবেই হয়েছে, বেশীর ভাগ পর্দ্দার মধ্যে গোলমাল করতে আরম্ভ করলো। আপনি যেভাবে বেড়া দিয়েছেন আপনাকে, মনে করেছেন আপনার ভেতরের গিন্নীকে আট্‌কে রেখেছেন, এদিকে গিন্নী যে আর একদিকে দৌড়াচ্ছে, সেটা ভুলে যাচ্ছেন ; পর্দ্দায় কি করবে, পর্দ্দার উপর যে একটা 'মই' ফেলতে পারে সেটা ভেবেছেন কি ? সুতরাং ভাবতে শিখুন, অত সহজ নয়। গাছ উঠার সাথে সাথে যদি ছাগলে খেয়ে ফেলে, গাছ বাড়া বড় কঠিন—আদৌ বাড়বে কিনা সন্দেহ, এ যে উঠন্ত অবস্থায়ই গ্রাস হয়ে যাচ্ছে। কে গ্রাস করছে বুঝতে পারছেন তো—'সংস্কার'। সে নিজেই four footed domestic animal হয়ে একেবারে শেষ করার ব্যবস্থা করেছে। ওকে বেঁধে রাখুন, তবেই সব ঠিক হবে আস্তে আস্তে নতুবা রেহাই নেই। আমার উপর চটলেই বা কি, আর না চটলেই বা কি, আর অমুকে কি বললো, তমুকে কি বললে, কে প্রশংসা করলো না করলো, তাতে আপনার কি হলো ? কত মানুষ যে আমাকে বকাবকি করছে, কত লোকে যে আমাকে ভগবানও বলছে ;—'ভগবান' বলছে, আচ্ছা শোনলাম ; কেহ 'চোর' বললো, আচ্ছা শোনলাম ; যে ভগবান বলছে তাকেও বেশী বুদ্ধির স্থান দেই না, যে চোর বলছে, তাকেও বেশী স্থান দেই না ; তার কারণ হচ্ছে দুটোই আন্দাজের উপর মন্তব্য ক'রে যাচ্ছে, ওদের brainএর functionটা তো বোঝা যাচ্ছে। এ রকম হঠাৎ হঠাৎ না বুঝে মন্তব্য করার কোনটাকেই দাম দেওয়া উচিত নয়। আগে সব বুঝুক, তারপর শেষে একটা কিছু মন্তব্য করুক, এ যে উড়ো খবরের উপর 'ভগবান' বা 'চোর'। বসে বসে ভোটে একজনকে

position দেওয়া হচ্ছে, ঐগুলো সব ভিত্তিহীনের উপর।" সাধক-ভদ্রলোক বসে চোখের জল ফেলছেন। ঠাকুর আবার বলছেন, "আপনি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কত কিছু যে দেখালেন, এই যে fickle fickle ভাবগুলো হচ্ছে নিজের উপর confidence না থাকার জন্য তো। কোন principleএর উপর আপনি নেই, একটা principleএ stick করুন, আপনার principleএ আপনি stick করুন। কিন্তু সেটা stick করতে পারছেন না, কারণ মাঝে মাঝে একটু জ্ঞানের রেশ পেলেই আপনার কার্য্যকলাপগুলো আপনার confidenceএর মধ্যে নাড়া দিয়ে উঠে। আপনার কার্য্যকলাপের উপর সন্দিগ্ধতা তখন দাঁড়িয়ে যাবে, 'ঠিক করছি কিনা' ঠিক দেখছি কিনা'—এ সবের উপর একটা confusion হয়ে পড়ে, এভাবে অনেক গলদ আপনার মধ্যে ঢুকে গেছে। তাতেই main গাছের চারিদিকে কত আগাছা হয়ে গেছে, আগাছাগুলো সাড়া পেয়ে main গাছের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, এখন main গাছ প্রায় যা, দশার অবস্থা। আগাছার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়ে গেছে, সেই প্রকোপকে দূর করতে হবে নতুবা আগাছাময় হয়ে পড়বে। সে জঙ্গলে ঢুকবে সমস্ত বিষধর সর্প, তখন কিন্তু আপনার চেহারা সাংঘাতিক হয়ে উঠবে, এখন পর্য্যন্ত 'বাবাজী'তে যাননি, কিন্তু কেউ যদি কোন ফাঁকে 'বাবাজী' বলে বসে তবে কিন্তু বিষধরের চেহারায় পরিণত হয়ে পড়বেন, তারপর কণ্ঠে কণ্ঠি না দিয়ে নিজেই কিন্তু বিষকণ্ঠ হয়ে বসবেন, ভয় কিন্তু সেখানে; তার আবার balance রাখতে গিয়ে আগাছা হতে শিকড় বের হয়ে আরো আগাছা বের হতে থাকবে, তাই আবার একটু হুঁশ করে দিচ্ছি আপনার এ অবস্থার জন্য। আর আমার কথাতে যদি ত্রুটি বোঝেন, আমার সাথে আলাপ করুন। আমার সাথে আলাপ ক'রে আমাকে বুঝিয়ে দিন।" তখন তিনি খুব দুঃখ করতে করতে বললেন, "মন বড় চঞ্চল, মন বড়

তুর্ব্বল, কিছুতেই স্থির করতে পারছি না, এতদিনের সাধনাই যেমন বিফলে যাচ্ছে। এতক্ষণ তর্ক করেছি নিজের দাম্ভিকতার জন্য। বস্তুতঃপক্ষে কথাগুলো ঠিকই, এখন আমাকে কি করতে হবে বলে দিন।" ঠাকুর বললেন, "আপনার বলার আগেই তো বুঝতে পেরেছি, তাই রাগারাগির দাম দেইনি। বহুদিনের সংস্কারপূর্ণ মন তো, তাই যশে মানে একটু চাম্‌টি লেগে রয়েছে। আমি ঠিক একটুখানি carbolic soapএর মত লাগিয়ে দিচ্ছি চাম্‌টিটা উঠিয়ে একটু মলম দেওয়ার জন্য, তাই একটু জ্বালা তো হবেই। সেই জ্বালাপূর্ণ কথা আপনি ছাড়ছেন, তা তো জানাই আছে।" সাধক-ভদ্রলোক তখন ঠাকুরের নিকট ক্ষমা চাইছেন, "আপনাকে অনেক আজে বাজে কথা বলেছি।" ঠাকুর বললেন, "ক্ষমা চাওয়ার আগেই ক্ষমা করেছি। বেশ কাল আসবেন, দেখবো, অন্যান্য আলাপ করবো।" পরদিন এসে সাধক-ভদ্রলোক ঠাকুরের কাছ থেকে তাঁর গতির পথ নিয়ে গেলেন।

ত্রিশ

দেওয়ালির পরদিন। কাল থেকে ঠাকুরের জন্মোৎসব চলছে*। খুব ধুমধাম। বহু লোকের সমাগম হচ্ছে। বেলা তিনটে থেকেই আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। আমরা কয়েকজন শুধু লিখে যাচ্ছি। ঠাকুর নানারকম উপদেশ দিচ্ছেন ও বোঝাচ্ছেন। একাগ্রতা সম্পর্কে, 'হওয়ার জন্য যে জন্ম এবং হতে যে বাধ্য' সে-সম্পর্কে বোঝাচ্ছেন, আর 'ভাগ্য, কপাল—এগুলো শুধু নামাকরণ মাত্র, সাময়িক আত্মতৃপ্তির জন্য। একটা জিনিষ ভাল কি মন্দ—তখনই 'সৌভাগ্য' ও 'দুর্ভাগ্য' নাম দিয়ে নিজে সেই অবস্থা হতে স্বস্তি পাওয়ার জন্য ওসব কথোপকথন। একজন শোকাচ্ছন্ন, প্রায় উন্মাদ, তার বেলায় কোন উপদেশই খাটছে না।' তিনি বললেন, "এই ক্ষেত্রে এদের উপরে ঐ জাতীয় বাণী এসে তখন কার্য্যকরী হয়, যখন বিধাতার উপর ন্যস্ত ক'রে এই উক্তি প্রকাশ করে, 'তিনি যা করছেন ভালর জন্যই করছেন, কোন পাপ করেছি তার ফলাফল চলছে।' নানারকম মনের আলোড়ন দ্বারা কিছু সংস্কার কিছু বিচার মিশ্রিত ঐ সমস্ত শোকাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের

---

* স্বামীবাগ, ঢাকা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ :—যদুনাথ রায়, শ্যাম বিনোদ ঘোষ, ইন্দ্র সেন, দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী (২), রবি ঘোষ, বিপুল চক্রবর্ত্তী, সতীশ দে, বঙ্কিম দে, নগেন ঘোষ, প্রাণশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, কালিদাস ব্যানার্জ্জি, শ্রীপতি বোস, গোপাল ঘোষ, অনিল ঘোষ, সুনীল ঘোষ, মণ্টু রায়, মহম্মদ্ আলি, প্রিয় প্রসাদ গুপ্ত, মনোরঞ্জন সেন, বিশ্বেশ্বর দাশ, বারীন ঘোষ, শান্তিদাস মজুমদার আরো অনেকে।

মধ্যে তখনকার জন্য ঐ জাতীয় অবস্থাই তাদের কার্য্যকরী করে যাচ্ছে। বস্তুতঃপক্ষে প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী যা হয়ে এসেছে, হচ্ছে এবং হবে—এক নীতির মধ্য দিয়েই চলছে। প্রত্যেকটি কার্য্য, প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রত্যেকটির প্রয়োজনীয়তার কার্য্য করে যাচ্ছে, সুতরাং 'ভাগ্য' 'অভাগ্য' এ সমস্ত শুধু নামাকরণ মাত্র নিজেদের বোঝবার জন্য। জ্ঞানে যখন প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন সব-কিছু সমস্যারই সমাধান হবে।" তিনি আমাদের এই বিষয়ে বোঝাচ্ছিলেন। হঠাৎ আবার এ প্রসঙ্গ থেমে গেল। থামার সঙ্গে সঙ্গে আবার আর এক প্রসঙ্গে চলে গেলেন। হঠাৎ এমন সময় বলে উঠলেন, "জল জল"—জোরে জোরে শব্দ করে উঠলেন। তখন গ্লাসে জল আনা হয়েছে। ঠাকুর বললেন, "গ্লাস নয় বালতি নিয়ে এসো।" বালতি নিয়ে নিকটে উপস্থিত। তিনি নিজেই জল ছিটাচ্ছেন। আমরা সব অবাক্ হয়ে দেখছি, 'কি ব্যাপার!' তারপর হঠাৎ শূন্যেই হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন, যেন কাউকে ধরতে যাচ্ছেন। তারপর বললেন, "যাক্, বেঁচে গেছে।" তারপর আমরা খুব আগ্রহসহকারে জিজ্ঞেস করলেম, "কি ব্যাপার? কি হয়েছে?" ঠাকুর বললেন, "এমন কিছু নয়, আবার কিছুও। এক জায়গায়* আগুন লেগেছে, উপর থেকে আগুনের ঝাঁপ পড়ছে, বহু লোক মারা যাচ্ছে। আমার এক ভক্ত আমায় বিপদে পড়ে ডাকছে। যখন দেখলাম ওর গায় আগুন লাগার উপক্রম, হঠাৎ receiver-যন্ত্রে সাড়া দিয়ে উঠেছে, তাই সাড়া পেয়ে message পাঠিয়ে ওকে safe করে দেওয়া হলো। তবে কিছুটা তাপ তো লেগেছেই।" সবার মধ্যে ব্যাপারটা জানাজানি হয়েছে—'কার? কার?' তারপর তিনি নাম† বলে দিলেন, তাকে

---

* কলিকাতা, হালসীবাগান-অগ্নিকাণ্ড।

† মহানন্দ রায়।

আমরা ভাই হিসাবে আগেও জানতাম। আমাদের সেই সহরে হৈ চৈ পড়ে গেল, রা'ও পড়ে গেল।

ত্ব'দিন পরে সে এসে উপস্থিত। তার কথা সে বলার আগে সবাই বলছে। সে অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করছে, "তোমরা কি করে জানলে?" আমরা বললাম, "জানানোর মালিক জানিয়েছেন।" সে সবাইকে বলতে আরম্ভ করেছে, "ঐ আগুনের ভেতর থেকে ঘাড় ধরে কে যেন আমায় উঠিয়ে রাস্তায় ফেলে দিলো।" আমরা ঠাকুরকে যে অবস্থায় দেখেছি, একই উক্তি ওর মুখে। তারপর ঠাকুরের সাথে এসে দেখা করলো। ঠাকুর বললেন, "কি, ভাল আছিস্ তো?" সে কাঁদতে কাঁদতে পায়ে পড়েছে, সে আবেগপূর্ণ কথা অনেক বললো। ঠাকুর তাকে আশ্বাস দিয়ে বসালেন। ঠাকুর সেই উৎসবের ব্যাপার তখন সব বললেন।....."দেখ, কি করে এগুলো আসে এবং কি ক'রে বোঝা যায়। আমাতে তোমাতে যে distanceটুকু রয়েছে, এই distanceটুকু—আমি যেমন তোমাকে জানাচ্ছি, 'হে শান্তি দাস, তুমি সরে বসো, straight হয়ে বসো'—সাথে সাথে যেন 'তা'র' activities করে যাচ্ছে, আবার নিকটে এলে যেন 'তাকে' ধরে আলগা ক'রে নেওয়া হয় কিংবা 'তাকে' দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। সবই কিন্তু শক্তির খেলা—নিকটতমই হউক আর দূরত্বই হউক, শক্তির নিকট ব্যবধান বেশী মনে হয় না। ওর ডাক—তোমাতে আমাতে যে distanceটুকু, এই distanceটুকু maintained হচ্ছে আমাতে ও ভক্ততে—forceful ডাক আর powerful receiver যদি থাকে সাড়া দেবেই, ঠিক momentএ সেই অনুযায়ী তার message পাঠিয়ে হউক বা অন্য কোন প্রকারেই হউক, যার যে ভাবে প্রতিকার করা দরকার তার প্রতিকার করে যাচ্ছে এবং হস্তের সঞ্চালনের সাথে সাথে একটা complete form হয়ে—যেমন জল হতে বরফ হয়, ঠাণ্ডা যখন তার মধ্যেই অবস্থিত হয় তখনই বরফ

হয়; একটা মাত্রা আছে বরফ হওয়ার যে মাত্রা, সেই শক্তির একটা মাত্রা ক্রমশঃ ক্রমশঃ সঞ্চালনের সাথে সাথে এগিয়ে যায়, সময়ানুযায়ী এমন একটা form হয়—ঠিক হস্তেরই মত কার্য্যকলাপগুলো তথায় প্রকারান্তরে করে যাচ্ছে। ঐ যে প্রসারণের অবস্থা, ঐ অবস্থাটা শক্তিতে সাধারণতঃ effective হয় ঐ জাতীয়তে—যেমন একটা magnet, একটা জিনিষকে magnetic actionএ টেনে নেওয়া যায়, ঠিক একজন powerful man ঐ জাতীয় power apply ক'রে মনোনিবেশের সাথে সাথে যে-কোন বস্তুকে টেনে নিয়ে আসতে পারে। আগুনে পড়ার ব্যাপারটাও ঠিক ঐ ব্যাপারই। ওকে টেনে নিয়ে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, —যেমন সর্প দূরবর্ত্তী জিনিষকে আকর্ষণ ক'রে তার গ্রাসের বন্দোবস্ত করে, তার চেয়েও আর এক জাতীয় সূক্ষ্ম জীব আছে, দূর হতে দৃষ্টিরূপ আকর্ষণেতে এদের গ্রাসের বন্দোবস্ত করে—তাকে বলে 'দৃষ্টি-ভোগী'; দৃষ্টির সাথে সাথে শরীর হতে রক্ত টেনে পান করছে। 'ত্রাটক-যোগ' সাধারণতঃ সর্পের ভেতর দিয়েই পরিস্ফুট হয়। জিহ্বা তালুতে স্পর্শ ক'রে এই আবহাওয়া হতে এক জাতীয় রস টেনে নেয়, যা তার glandএর secretionএ mixed হয়ে একটা food হয়ে তার শরীরের পরিপুষ্টির কার্য্য করে যাচ্ছে। ঐ 'ত্রাটক-যোগ'ই ঐ আবহাওয়াতে আকর্ষণের কার্য্যের সহায়তা করছে। স্বভাবজাত জীব চিন্তার সাথে সাথে যেমন glandএর secretion কিংবা একটা sexual think ক'রে নিজের ভেতরে ভেতরে সঙ্গম-অবস্থার সৃষ্টি ক'রে ভেতরেই স্খলিত অবস্থা সৃষ্টি করে, সবই চলছে এক জাতীয় আকর্ষণিক অবস্থা। এই চিন্তাযুক্ত অবস্থাতে কি কান্না, কি আনন্দ, কি হাসি, কি ভয়—সবই যুক্ত-আকর্ষণে আকর্ষিত হয়ে ব্যক্তিগত parts অথবা অংশের উপরে কার্য্যকরী হয়ে ভিন্ন ভিন্ন glandএর ওপর action হয়ে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির বিকাশ করছে অথবা রূপ

দিচ্ছে—'যোগ' এখানেই. যোগাযোগ হচ্ছে 'যোগ'।" এর মধ্যে বহু লোকের ভিড় হয়েছে, আর এত মালা ঠাকুরের গলায় পড়ছে যে আলাপ তিনি ঠিকমত করতে পারছেন না। সবার সাথে একটু একটু আলাপ ও আশীর্ব্বাদ দিতে দিতে অনেক সময় কেটে গেল। তিনি এ বিষয়ে আরো বলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু পরিবেশের জন্য আর পেরে ওঠেননি। তারপর খাওয়া-দাওয়ার ব্যস্ততায় সেদিনের মত যেতে গেলাম।

একত্রিশ

সেদিন খুব গরম পড়েছে। আমরা* সবাই গরমে ছট্‌ফট্ করছি। ঠাকুর বললেন, "আমার ছোটবেলার একটা গল্প বলছি শোন্ :—

গ্রামে আছি। যে বাড়ীতে আছি সেখানে একটি মন্দির আছে, নিত্য বিগ্রহের পূজো হয়। পূজারী ব্রাহ্মণ প্রায় দেড় মাইল দূর হতে এসে পূজো করে যান এবং সন্ধ্যাবেলা এসে বিগ্রহগুলো শয়ন করিয়ে যান। আমি তাঁকে বললাম, 'আপনার ত্'বেলা ক'রে আসতে হয়, আমিই না হয় সন্ধ্যাবেলা বিগ্রহ শয়ন করাবো ; আমাকে একটু দেখিয়ে দিয়ে যান।' পূজারী ব্রাহ্মণ একটু রেহাই পেলেন। তিনি আমাকে দেখিয়ে দিলেন, কোন বিগ্রহ কি ভাবে শোয়াতে হবে। বিগ্রহের ভেতর লক্ষ্মী, গোবিন্দ আর শালগ্রামশিলা। বড় কাঠের সিংহাসনে তাঁদের শোয়ান হয়। প্রথমে লক্ষ্মীগোবিন্দের শয়ন পদ্ধতি দেখিয়ে দিলেন। তারপর শালগ্রামের আসনের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'এঁকে এখানে শোয়াবে।' সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর-ঘরের দরজা খুলে লক্ষ্মী, গোবিন্দ ও শালগ্রামের ছোট্ট আসন দেখলাম। তারপর মশা তাড়িয়ে মশারি খাটিয়ে শয়ন করালাম। শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসি শয়নের পর বাজাতে হয়, তা করলাম। আগাগোড়া যা'ই করলাম—সেই দরজা খোলা হতে যার যার জায়গায় তাকে তাকে

---

* উপস্থিত ব্যক্তিগণ :—রবি ঘোষ, গোপাল ঘোষ, অহীন্দ্র ঘোষ, অনিল ঘোষ, শান্তি দাস মজুমদার, অজিত ভট্টাচার্য্য, বারীন ঘোষ আরো অনেকে।

রেখে দেওয়া পর্য্যন্ত ; নামাকরণে শুধু ভেদ—কোনটার নাম দরজা, কোনটার নাম কোশাকোশী, কোনটার নাম শালগ্রামের আসন ; কি শঙ্খ, কি ঘণ্টা, কি কাঁসি—প্রকারান্তরে এক জাতীয়ের মতই তো। শুধু যার যার ভিন্ন জায়গায় তাকে তাকে রাখা হলো। লক্ষ্মী, গোবিন্দ আর ঘণ্টা দাম-বিশেষে কাউকে রাখলাম মশারির মধ্যে, কাউকে রাখলাম বাইরে, যেমন—তামার পয়সা আর তামার পাত্র, একটা বাক্সে আর একটা পালঙ্কের নীচে, প্রয়োজনভেদে যার যার জায়গায় তাকে রেখে দেওয়া হচ্ছে। তাই আমি যখন শয়ন করালাম, মনে মনে এই ভাবলাম, কি রাজত্বরে বাবা! নাড়াচাড়াকালীন তো একই লাগলো, শুধু কল্পনা করে এক-একটির দাম ধার্য্য করে গেছে—এর দাম এত, ওর দাম অত। Aluminium প্রথম যার কাছে ছিলো, তার মুকুটের শোভনীয় হিসাবেই ছিলো ; তখন ওটা অমূল্যের মধ্যেই ছিলো, এখন নর্দ্দমায়ও গড়াগড়ি করতে দেখা যায়। আজ যে ধাতুর মূর্ত্তিকে শয়ন করালাম, তাঁর মর্য্যাদা মুকুটের শোভনীয় হিসাবে যে পূজো করা হচ্ছে,—বস্তুকে যখন চিন্তা করা যায়, তখন ধাতু ছাড়া আর কিছু মেলে না। তবে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গিমাতে এই ধাতুর উপর যে রূপ-বিন্যাস করছে, সত্যিকারের দিক্ দিয়ে যদি একে খোঁজা যায়, metalএ গিয়েই দাঁড়ায়। তবে গবেষণা ক'রে যদি একে এর ভেতর দিয়ে এর তত্ত্ব বের ক'রে যাওয়া যায়, এর মধ্যেও যে infiniteএর পরিচয় পাওয়া যাবে—শুধু লক্ষ্মীগোবিন্দ কেন, এ যে সর্ব্ব জায়গায় সর্ব্ব কিছুতেই। সেই চিন্তাধারা হলো আর এক জিনিষ, যাহা প্রত্যক্ষ করতে করতে বহু দূরে চলে যাওয়া যায়। একটা বস্তুর অস্তিত্ব পেলে আর একটা বস্তুর অস্তিত্ব যে স্বাভাবিক থাকবে, সেটা স্বাভাবিকভাবে প্রমাণে আসে বর্ত্তমান রূপটিকে দেখে। আমি যখন আছি, পিতা থাকবেনই, তাঁর বাবাও থাকবেনই, এরকম 'বাবা' to the infinity—আমিই

তার প্রমাণ। ধাতুতে ধাতুর সৃষ্টি, ধাতুতেই জীব-সৃষ্টি, সুতরাং কি শঙ্খ, কি লক্ষ্মী, কি গোবিন্দ, কি ঘণ্টা—আমার নিকটে সবই সমতুল্য অবস্থায় ছিল। এসব আবহাওয়াই করিয়ে নিচ্ছে যাত্রীকের পোষাকের মত। ছোট বয়সে নেমন্তন্ন খেতে যাবো, মা সাজিয়ে দিলেন—নেমন্তন্নের জন্য যে সাজা, এটুকু তো বুঝতে পারলাম। এখানেও ঠিক সেই অবস্থাই, শুধু পোষাকটুকু maintain করা। বস্তুকে জান ক্ষতি নেই, বস্তুর পরিচয় জান ক্ষতি নেই, যেহেতু সেই বস্তুকে এই নাম দিল, এই মূল্য দিল তাদের শ্রদ্ধা রাখার জন্য, আবহাওয়াতে গুছিয়ে চলার জন্য—এই সমস্ত অবস্থাগুলোও পোষাকের সামিল, না করলে 'অভদ্র' বলবে; নোংরা জামা গায়ে দেওয়ার মত কে কি বলবে সেই ভীতিতে নিজকে গুছিয়ে নেওয়া যেমন, এও ঠিক সেই জাতীয়ই করা হয়েছিলো। ঘণ্টাকে মশারির মধ্যে ঢোকাতে পারছি না, শঙ্খে আরশোলা ঢুকে রয়েছে, ওকে রক্ষা করতে পারছি না; বড় সিংহাসনটি যার মধ্যে সব-কিছু রয়েছে, সেটা মাকড়সার জালে আঁকড়ে রেখেছে, ওটাকে আর একটা বড় মশারির দ্বারা রাখছি না; আর ভাণ্ডবাসন তো বহু পড়েই আছে, মন্দিরের তো প্রশ্নই আসে না—কাকে রেখে কাকে ছাড়ি। বেশ তো মজার ব্যাপার! যেহেতু শিলাতে ঐ লক্ষ্মীগোবিন্দে বিরাটের রূপটিকে কল্পনা ক'রে নেওয়া হয়েছে, বস্তুতেই যে বিরাট, মিশ্রিত অবস্থারই যে পরিচয়, বাদ দেওয়ার কারো কিছু নেই। সংমিশ্রণেই রূপের বিকাশ, আবার সেটাকেই কল্পনায় নিয়ে বিশেষ বিশেষ পাত্রে বিশেষের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে একটা অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের মত; যদি নিজের মনকে সেই অনুযায়ী পর্য্যবেক্ষণে লাগান যায়, তবেই সমস্ত বস্তুর তত্ত্বগুলো অবগতে আনা যায়—সেই বীক্ষণেই সমষ্টি এসে ধরা দেবে। তাঁরা যে পদ্ধতি অনুসরণ করেন, যে পদ্ধতি অনুযায়ী চলছেন, সেই পদ্ধতির মর্য্যাদা তাঁরাই ক্ষুণ্ণ করছেন।

শিলাতে মশা-বোধ, 'ধারা'তে ঠাণ্ডা করানো বোধ, পূজোতে নৈবেদ্যে দৃষ্টিভোগ, প্রকারান্তরে আমরা ভূতের অনুভূতিতে আছি, তাঁরই রূপটি তার উপরে খাটাচ্ছি, যে বোধে আমরা আছি সে বোধে তাঁদেরও টেনে আনছি; যখন নিজেরা সে বোধ হতেও নিজেদের হারিয়ে ফেলি, তখন তাঁদের দেওয়া হয়েছে 'দৃষ্টি-ভোগ' self satisfactionএর জন্য। তিনি যদি দৃষ্টি-ভোগে খুশী, তবে মনে মনে ভোগ দিলে খুশী হবেন না কেন? আমি মনে মনে তুনিয়ার ফল দিয়ে দিলাম, তুনিয়ার মিষ্টি দিয়ে দিলাম, তুনিয়ার জল দিয়ে দিলাম; যে মাংসাশী ঠাকুর, তাঁকে তুনিয়ার সমস্ত জীব দিয়ে দিলাম; যে নিরামিষাশী, তাঁকে তুনিয়ার সমস্ত উদ্ভিদ্ দান করলাম,—'ইদং সোপকরণম্ বিশ্বভোজ্যম্ তুভ্যং নমঃ।' 'দৃষ্টি-ভোগ'টা সম্বন্ধে যখন তারা conscious, কল্পনা করেই হউক বা গল্প শুনেই হউক, কে কোথা হতে যে কি পেয়েছে, একথা তারা নিজেরাই জানে না মনে হয়। শোষণ-প্রথা নিয়মানুযায়ীতেই যে গাঁথা। বর্ষার পুকুরের জল নিদাঘের রাগে আর থাকে না—এটা তো আর 'দৃষ্টি-ভোগ' নয়?—হাতে ধরে নেওয়ার মতই যে। নৈবেদ্যের নিবেদন নিজেদের করা ছাড়া একদিনও দেখিনি, কেবল আরশোলা আর টিক্‌টিকি, পিঁপড়ে আর নেংটি ইতুর কিছু ভাগ নিয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনা মনে পড়লো;—একবার এক বাটীতে মিষ্টান্ন-ভোগ দিয়েছে নারায়ণকে। সাধারণতঃ ভোগ দিয়ে দরজা বন্ধ করে রেখে যাওয়া নিয়ম। মন্দিরের পেছনে এক বাঁদর এসে জায়গা নিয়েছে। সে তল্লাটে বাঁদর নেই, কোথা থেকে যেন একটা বাঁদর এসেছে। সে ঠিক সময়মত জানলা দিয়ে ঢুকে মিষ্টান্নের অর্দ্ধেক বাটি খালি ক'রে চলে যেতো। এমন কি মাঝে মাঝে খুব সকালে বড় সিংহাসনের পেছনেও চুপ করে রয়ে যেতো। পরে জানা গেল, সে কোন এক মন্দিরের পাণ্ডার পোষা ছিলো এবং মন্দিরের প্রসাদ

খেয়েই মানুষ। পাণ্ডা মরে যাওয়াতে ওর প্রসাদ খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল, তারপর অভাবে যা হয় তাই করতে আরম্ভ করলো। সে এখন মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে ঘুরে আছে। ঐ পাণ্ডা এটাকে দিয়ে অনেক রোজগার করতো, সুতরাং এটাকে সেভাবেই training দিয়েছিলো। পাণ্ডা শিলাকে জাগ্রত বলে পরিচয় দিতো শালগ্রামের ভোগ বাঁদরকে খাইয়ে। সেই মন্দিরে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার কার্য্য বাঁদরই করতো। এখন সেখানে সরিকের পালা কিনা, তাই তার জন্য তালা বন্ধ। সেরূপ এ মন্দিরেও এই শিলাতে সেই প্রাণ-প্রতিষ্ঠার কার্য্য করছে, আর দেবতা তো অন্তর্ধানেই, সুতরাং ওর বেলায় সেদিক্ দিয়ে আর কোন অসুবিধে হয়নি—অভ্যস্ত তো, তাই। এদিকে বাড়ীসুদ্ধ হৈহুল্লোড়। সেরের দুধ এখন মণে এসে দাঁড়িয়েছে, কারণ মনের সাড়া পেয়েছে কিনা, তাই। ঐদিক্ দিয়ে অন্তর্ধানের ধ্যানের মাত্রা বাড়াবার জন্য ব্যগ্রতা আরম্ভ হলো, তার কারণ পরিপুষ্ট হতে লাগলো কিনা, জানলার ফাঁক দিয়ে প্রবিষ্ট হতে কষ্ট হতে আরম্ভ করলো। এদিকে লোকে লোকারণ্য, বাদ্যভাণ্ডের ছড়াছড়ি। সবার মুখে এক কথা, 'তিনি এসেছেন।' এদিকে বাঁদর মনে মনে ভাবছেন, 'শালগ্রামটাকে বাদ দিয়ে আমি যদি বসে পড়ি, অনেকটা এগিয়ে যেতে পারি।' তাই শালগ্রামকে হিংসে করতে আরম্ভ করলো, 'আমি যাই বলেই-না এত সব হচ্ছে,'—ওর প্রাধান্যটা শালগ্রাম কেন নেবে, সে কম কিসে। গল্পে শুনেছি,—'হাঁসে সোনার ডিম দেয়, একটা ক'রে প্রতিদিন দিতো, তাতে মালিকের অসুবিধা হচ্ছে। তাই একেবারেই বাড়ি দিয়ে মালিক সারা বছরেরটা বের করতে চাইলো—তারপর যেমনি লাঠি, তেমনি গত।' শেষ বেলায় আপসোসই সার হলো। বাঁদরেরও ঠিক সেই অবস্থা, রাগ ক'রে শালগ্রাম ছুঁড়ে ফেলে দিল, 'আমার প্রতাপে এত কিছু, আর ওটা বসে বসে বাহবা নেবে।' তাই সে-আসন তিনিই দখল

করলেন। এদিকে গামলায় গামলায় মিষ্টান্ন, বহু সাধকের সেখানে আবির্ভাব। এর মধ্যে বহু স্বপ্নও অনেকে দেখে ফেলেছে, সে যাক্ আলাদা কথা। তারপর ভোগ যখন দেওয়া হলো তখন সবারই আসনের দিকে দৃষ্টি পড়লো—দেখে সবাই অবাক্, সবাই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। আশ্চর্য্য কিন্তু বাঁদর হিসাবে নয়, এ যে 'মহাবাঁদর'। 'তিনিই স্বয়ং এরূপ নিয়ে খাচ্ছেন,' এদিকে তো সব লম্বা হয়ে গেল—স্বয়ং রূপ দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু শালগ্রাম যে নেই। আসার পথে এক ব্যক্তি ওটাকে কুড়িয়ে পেয়েছে। সে ওটাকে পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে আসছে, সেও সেখানেই আসছিলো, 'কি যেন অপরাধ হয়ে গেল।' তারপর সেটাকে নিয়ে উপস্থিত। সবাই দেখাদেখি করছে, চিনে ফেলেছে, আর বুঝতে তেমন বেশী কিছু বাকি রইলো না, 'ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, আর সে এসে বসেছে।' তারপর তাকে ধরবার চেষ্টা, অনেক কষ্টে ধরলো। গলায় একটা ছোট্ট মাতুলির মত ছিলো, সেটাকে খুলে পরিচয়-পত্র পেলো, তারপর সেই সেই ভাবে গিয়ে সব অবগত হলো। আর যারা এর মধ্যে দশায় পড়ে গিয়েছিলো, তারা 'তোবা তোবা' করে উঠলো। 'ছিলাম ভাল, কেন এ আকাম করতে গেলাম'—বাঁদর মনে মনে ভাবছে। ধরাতে অনুশোচনা, ধরা পড়াতে অনুশোচনা, অনুশোচনাই স্থায়ী হয়ে রইলো—শেষবেলায় আশীর্ব্বাদ এটাই পেল।

প্রসঙ্গক্ষেত্রে ছোটবেলার আর একটি মজার ঘটনা বলছি।—মাঘ মাস। এই সময় একমাস নারায়ণকে পায়স দেওয়া হয়। সেই সাথে মাঝে মাঝে গ্রামের আশেপাশের অন্যান্য বাড়ী হতেও নারায়ণের ভোগের জন্য দুধ দিয়ে যায়। পায়স সবারটাই একত্র রান্না করা হয়। আমি একদিন রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছি। আমার মা, ছোট মাসীমা রান্নাঘরে মিষ্টান্নের হাঁড়ি নামিয়ে বাটি সাজাচ্ছেন। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি গোটা দশেকের উপর

বাটি হবে। একজনে ঢালছেন আর একজনে বাটি সামনে এগিয়ে দিচ্ছেন। এর মধ্যে দু'জনের ভেতর কথোপকথন চলছে, 'না, না, এটা পালের বাড়ীর বাটি, ওরা তিনসের দুধ দিয়েছে।'—সেই অনুযায়ী পায়স ঢেলে দেওয়া হলো। 'ওটা 'দে'র বাড়ীর বাটি, আড়াই পো দুধ দিয়েছে'—দুই হাতা পড়ে গেল। সরকার বাড়ীর বাটিতে বেশী ঢেলে ফেলেছে ঘোষের বাড়ীর বাটি মনে ক'রে, তখন তাড়াতাড়ি পায়স ঘোষের বাড়ীর বাটিতে দিতে আরম্ভ করলো, কারণ দুধ যা দিয়েছে তার চেয়ে বেশী ঐ বাটিতে ঢেলে ফেলেছিলো। সুতরাং দুই বোনে বেশ 'হাঁকিতাকি' চলছে। পাত্র বুঝে তাদের নামে ভোগ দেওয়া হলো। আমি তখন একটু হেসে হেসে মা-মাসীকে বললাম, 'নারায়ণকে কি আবার প্রসাদ খাওয়াবে না কি?' তাঁরা বললেন, 'একথা বলছিস কেন?' আমি বললাম, 'বলবোই বা না কেন? যা দেখলাম কাণ্ডকীর্ত্তি, না বলার কি আছে?' তাঁরা বললেন, 'কি দেখেছিস?' আমি বললাম, 'বলছি, ভোগ হলো নারায়ণের, সে তো কোথা গেল তার কোন দিশই নেই। দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে দেখলাম, 'পালায় নমঃ, ঘোষায় নমঃ, দে'য়ায় নমঃ, সরকারায় নমঃ,' নমোর নমোটা কি 'নারায়ণায় নমঃ' হবে নাকি? প্রসাদে কি আবার 'নমঃ নারায়ণায়' হবে নাকি? নিবেদন তো একবার নররূপেই হয়ে গেল; পরে শালগ্রামকে আনা হবে কি উচ্ছিষ্ট নেওয়ার জন্য? ছিঃ ছিঃ ছিঃ।' মা-মাসী বললেন, 'যাঃ, ওরকম বুঝি আমরা ভেবেছি, ওটা তো কথোপকথন।' আমি বললাম, 'মন্ত্রও তো তাই, ওকি আর 'কথন' ছাড়া?' এরপরই পূজারী ব্রাহ্মণ শালগ্রাম নিয়ে এসে উপস্থিত। তিনি হলেন আবার নারায়ণের অতিথি। পায়স ভোগ দেওয়ার পর একজন ব্রাহ্মণকে খাওয়ান হয়, তাদের নিয়মে নাকি আছে। আমি দাঁড়িয়েই দেখছি পূজারী ব্রাহ্মণ কি করেন। তিনি ফুল ছিটাচ্ছেন। অনেকগুলো বাটি তো—

কোনটাতে ফুল পড়ছে, কোনটাতে পড়ছে না—তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিটাচ্ছেন কিনা। ত্বনিয়ায় যাঁকে বললে চটবেন না, তাঁর নাম দিয়ে বলতে ভরসা পেলাম, তার কারণ নিন্দাস্তুতি যাঁর কাছে সমতুল্য, সাধারণ তো তিনি নন। তাই পূজারী ব্রাহ্মণকে বললাম, 'দেখুন, একটা কাজ করুন। নিবেদনে কারো বাটিতে ফুল পড়েছে, কারো বাটিতে পড়েনি। কার আবার কি হয়ে পড়ে তো ঠিক নেই, তার চেয়ে শালগ্রামকে প্রত্যেক বাটিতে বাটিতে স্পর্শ করিয়ে 'নারায়ণায় নমঃ, নারায়ণায় নমঃ' করলে অনেকটা এগিয়ে যাবে, আপনারও স্থবিধে হয়ে গেল। সেদিক্ দিয়ে আমি কথাটি বলছি।' ব্রাহ্মণ হাসলেন। আমি বললাম, 'আপনাকে তো বলিনি চটতেও পারবেন না, আমার সাথে তাঁর সাথে বোঝাবুঝি হবে, স্থতরাং আপনার চিন্তা করতে হবে না। মজা তো এখানেই—একজনকে ব'লে সারতে পারবো, আর কাউকে বলতে পারবো না। এই বাস্তবে কাউকে তৃপ্তিগত বকাও যায় না, ভালবাসাও যায় না, সবাই যে ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে রয়েছে; আর ভালবাসা দেখাবার জন্য, ভালবাসা নেবার জন্য—এ যেন একটা দাসত্ব-বৃত্তির মত চলা, কি ভাবে তুষ্ট করবো আর আমার উপর তুষ্ট করিয়ে নেবো, তার একটু ব্যতিক্রমে—দংশন। এই রাজত্বে তো বাস? তাই ইচ্ছামত মনের ঝাল দেবদেবীর উপর দিয়ে কিছুটা চালান যায়। আপনাকে যদি কিছু বলি আপনি চটে যাবেন। কত খুশী মেজাজে ওঁকে বলতে পেরেছি—ভালবেসেও তৃপ্তি আছে, আর বকেও তৃপ্তি আছে, পরবর্ত্তী চিন্তা আর কিছু করতে হয় না যে, কি বুঝলো আর কি ভাবলো। এখন ভয় দেখছি দাড়োয়ানেরই বেশী, রাজার চেয়ে মোসাহেবের দাপটই যে বেশী—ভয় করি তো সেখানে। তাই আপনাদের নিয়েই তো মুস্কিল—লাঠি ঠেংগা তো আপনারাই নেন, আর না বুঝে বদনাম, উপহাস, নাস্তিক ইত্যাদি বলে নিজের মনের ঝাল

মেটান। সেখানে হাসি ছাড়া আর কি থাকবে? আশ্চর্য্য তো সেখানেই।'

যাক যা বোলছিলাম, ঐ বিগ্রহ-শয়নের কথা। বড় সিংহাসনে লক্ষ্মীকে একপাশে রেখেছি, গোবিন্দকে আর একপাশে রেখেছি, মাঝখানে খালি আসনটিকে রেখেছি। একটা খট্‌কা মনের মধ্যে তবু পোষণ করলাম। তারপরদিন পূজারী ব্রাহ্মণ এলেন। আমিও সাথে সাথে গিয়ে উপস্থিত। তিনি উত্থানের জন্য মশারি উঠালেন, পেছনে আমি দাঁড়ানো। বিছানার দিকে তাকিয়েই ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্য হয়ে চট্টগ্রামের ভাষায় বলে উঠলেন, 'একি বাবা!' আমি বললাম, 'কি হয়েছে?' তিনি বললেন, 'শালগ্রাম কোথায়? আর আসনটি এখানে রেখেছো কেন?' আমি বললাম, 'আপনি আমাকে কি দেখিয়ে গিয়েছিলেন? ' আর শালগ্রাম তো আমি পাইনি। আমি ভেবেছি আপনি নিয়ে গেছেন, তাই তাঁর আসন আমি নানা চিন্তা ক'রে রেখে দিয়েছি।' তখন তিনি বললেন, 'কেন, শালগ্রাম তো 'ধারা'তেই রয়েছে।' আমি বললাম, 'ধারাতে রয়েছে মানে?' তখন আমাকে নিয়ে দেখিয়ে দিলেন। আমি দেখলাম, একটা হাঁড়ি জলে পূর্ণ হয়ে রয়েছে, শালগ্রাম তার মধ্যে ডুবে আছে। অবাক্ আমার চেয়ে তিনিই বেশী হয়েছেন, আর ভীতিতে কাঁপছেন। আমি তখন বললাম, 'আমাকে বলে গেলেন না কেন যে হাঁড়ির মধ্যে রয়েছে?' তখন তিনি বললেন, 'তুমি যে জান না তা কে জানে?' আমি বললাম, 'অনেক সময় ব্রাহ্মণরা পূজার জন্য শালগ্রাম নিয়ে যায় তা দেখেছি, তাই সে ধারণাই পোষণ করেছি।' তখন পূজারী বললেন, 'এ শালগ্রাম তো কোনদিন নেওয়া হয় না।' আমি বললাম, 'তাতো জানি না, তবে মনে হয় গরমে তিনি মশারির নীচে থাকতে চাননি, তাই তাঁর ইচ্ছাতেই সারারাত জলে রয়েছেন।' পূজারীর গুরুত্ব বজায় রেখে আরো দু' একটা কথা বললাম।

এর মধ্যে একদিন গোবিন্দ, তিনি আবার বেণু বাজাবার ঢংএ আছেন, সিংহাসনের রেলিংএ বাড়ি খেয়ে floorএ পড়ে গেছেন, পড়ে একটা আঙ্গুল একটু বাঁকা হয়ে গেছে। আমি দেখলাম মহা-সমস্যা তো, তাই তাড়াতাড়ি মন্দিরের দরজা বন্ধ ক'রে সেখানে একটা নোড়া ছিলো, সেটা দিয়ে ঠুকে ঠুকে কোনমতে আঙ্গুলটাকে ঠিকঠাক ক'রে রেখে দিলাম। এ খবরটা আমি নিজেই গিয়ে কথায় কথায় বলে ফেললাম। বাড়ীসুদ্ধ সবাই ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং আমাকে শোনালেন যে, 'যতবার পড়েছে, ততবারই একজন না একজন সংবৎসরের ভেতরই মারা গেছে।' আমি তখন বললাম, 'তা হলে তো মুস্কিল! কাল আমার হাত হতে কাঁসার গ্লাসটা পড়ে গিয়েছিলো, তা হলে তো এক বছরও যাবে না, ছ' মাসেই হবে। এর মধ্যে বাটি কিংবা অন্য কিছু যদি হাত থেকে পড়ে যায় তবে তো আরো শীঘ্র হবে।' তাঁরা বলছেন, 'কেন, তা হবে কেন?' আমি বললাম, 'যদি ওটা পড়লে হতে পারে, তবে গ্লাসটা পড়লে হবে না কেন? ওঁটাও ধাতুতে তৈরী, এটাও ধাতুতে তৈরী, পড়ে গেলে দুটোরই ফল যে একই হবে।' তাঁরা বললো, 'ওঁর তো পূজো করা হচ্ছে, উনি দেবতা।' আমি বললাম পূজো তো দু'টোকেই করা হচ্ছে, গ্লাসবাটিতে যে তৃষ্ণা মেটাচ্ছে, সেও তো পূজোর কার্য্যই করছে, সেও তো মনের একজাতীয় চাহিদা মিটিয়ে যাচ্ছে।'

....তার কারণ বস্তু-বিশেষের তত্ত্ব যদি তত্ত্বের ভেতর না আনা যায়, প্রতি মুহূর্ত্তে হাবুডুবু সেখানেই খায়। তখনই নাকে মুখে জল গিয়ে দুনিয়ার বস্তুকেও অসুস্থতার চেহারায় পরিণত করে, প্রাণ যে ওষ্ঠাগত, সর্দ্দির ব্যারাম আমার—স্বাদের কি দোষ? ওকে গালি দিলে কি হবে? নিজের গলদের প্রতিবিধান কর, রূপ তখনই আসবে। তাই আজ আমাদের কোথায় কোন গলদ, কি ভাবে যে কোন ব্যারামে আটক হয়ে আছে, কোন প্রকৃত স্বাদকে বিস্বাদ বলে গালি দিচ্ছি—

গলদে যে আছি তাও ভুলে গেছি, তার জন্য যে সমস্ত ভুলজাতীয় ভাষণ কিংবা মন্তব্য করছি—বিস্বাদের মতই এলোমেলো হয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। না বুঝে সন্দেহ করা, ভুল বোঝা, বদনাম দেওয়া, অপমান করা, সমালোচনা করা, বুঝিয়ে দিলে রাগ করা, হালকা সম্মান বোধ—সব-কিছুই বিস্বাদের মত বের হয়ে যাচ্ছে গলদে সে নিজে রয়েছে ব'লে। আমাদের সেখানেই operation করতে হবে, তখন প্রকৃত রূপ নিজের রূপের সঙ্গে মিশে যাবে, জিহ্বার সাথে খাদ্যের সাথে বন্ধুত্ব তখনই হবে, সেই জিহ্বাই আমাদের দরকার। এই বিশ্বের সমস্ত জিনিষের স্বাদ বুঝে বুঝে যেন সে চলতে পারে—প্রচেষ্টা আমাদের সেখানেই।"

বত্রিশ

ঠাকুর সহরে* আছেন। আমরা† কয়েকজন তাঁর সঙ্গে রয়েছি। অনেকেই দীক্ষা নেবার জন্য আসছে। এক ধনী ব্যক্তি এসে উপস্থিত হলো, তার সাথে তার এক আত্মীয়ও আছে। তারা দু'জনেই ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে বসলো। ঠাকুরকে হাত দেখবার জন্য তারা অনুরোধ জানালো। ঠাকুর সেভাবেই ওদের সঙ্গে আলাপ করছেন। শুনলাম বহু জায়গায় তারা হাত দেখিয়েছে। কোন এক জ্যোতিষ ঐ ধনী ব্যক্তিকে হাত দেখে বলেছে যে তার একটা বিরাট ফাঁড়া আছে এবং সে ফাঁড়াটা এগিয়ে আসছে। ভদ্রলোক খুবই চিন্তিত, এর জন্য বহু প্রতিকারের চেষ্টাও করেছে, তবু তার ভয় পাছে যদি কোন ফল না হয়; তাই সে ঠাকুরের নিকট এসেছে হাত দেখিয়ে একটা প্রতিকার করার জন্য। ঠাকুর বললেন, "বেশ তো, এগিয়ে এসো।" ভদ্রলোক তার হাতখানা বাড়িয়ে দিল। আমরা একটু মুচকি মুচকি হাসছি আর নিজেদের ভেতর বলাবলি করছি, 'কত রূপই যে তুমি দেখাবে তার আর অবধি নেই।' ঠাকুরও হাতটা হাতে নিয়ে একটু মুচকি মুচকি হাসছেন। এরপর একটা কাগজকলম নিয়ে বসলেন ও তাকে বলতে লাগলেন, "আর একটি বিবাহ যে তুমি ঠিক করেছো, এ ফাঁড়াটি কেটে গেলেই তো তুমি কার্য্যে নেমে

---

* স্বামীবাগ, ঢাকা।

† শান্তিদাস মজুমদার, বারীন ঘোষ, অজিত ভট্টাচার্য্য, রবি ঘোষ (১)

যাবে। তোমার এ স্ত্রী তো এ ব্যাপার কিছুই জানে না, সুতরাং এতে কি তোমার শান্তি হবে? বিয়ে করার কিছুদিন পরেই তো তোমার প্রথমা স্ত্রী বিষ খেয়ে মরবে—এ ফাঁড়া যে রয়েছে, কোনটাকে সামলাবে? হয় তুমি ফাঁড়ায় পড়ে চলে যাও, না হয় তুমি বিয়ে না করলেই সবাই বেঁচে যায়।” তখন ভদ্রলোক বলছে, “তা হলে ফাঁড়ায় তো পড়তেই হবে।” ঠাকুর বললেন, “তার প্রতিবিধান যদি করে দি’।” সে বললো, “প্রতিশ্রুতি যদি দেন তা হলে আমি বিয়ে করবো না।”..ঠাকুর বললেন, “তবেই আমি যে আলাপে আসবো। আগে বল, তারপর অন্য কথা........*।” তাই প্রাণের ভয়ে সে বললো, “আমি বিয়ে করবো না।” ঠাকুরের কথা শুনে সে প্রায় অর্দ্ধেক নেই, তার তো একরকম কম্পমান-অবস্থা। ঠাকুর বললেন, “তুমি বহু মেয়ের সর্ব্বনাশ করেছো, অর্থে বুঝি মতিভ্রম হয়েছে তোমার? এসব দোষনীয় সব-কিছু ছাড়বে আমার কাছে বল, তবে আমি কথা বলবো। আজ এ পর্য্যন্ত থাক, দু’দিন পরে আসবে।” এর মধ্যে তার সাথে যে আত্মীয়টি ছিলো, সে-গুপ্ত কথাটি ফাঁস হয়ে যাওয়াতে ব্যাপারটি বুঝে ফেললো এবং এ খবরটা পরে তাদের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল।

তারপরের দিন সেই আত্মীয়টি ঐ ধনী ভদ্রলোকের স্ত্রীকে নিয়ে এসে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হলো। ঠাকুরের কাছে এসে স্ত্রীলোকটি খুব কান্নাকাটি করছে ও ঠাকুরকে বলছে, “আমার স্বামীকে আপনি রক্ষা করুন, তিনি সমস্ত টাকা-পয়সা নষ্ট করছেন। তাঁর এসব বুদ্ধি আমি কিছুই জানতাম না। তিনি যাতে অন্য দিকে না যান, তাঁর যাতে মতিভ্রম না হয় সে ব্যবস্থা আপনি

* বাদ পড়েছে।

ক'রে দিন্।" ঠাকুর বললেন, "আগামীকল্য তো তোমার স্বামী আসবে, আমি তখন দেখবো।" তবুও স্ত্রীলোকটি বলতে লাগলো, "আপনি তাঁর একটা প্রতিকার করে দিন্।" ঠাকুর স্ত্রীলোকটিকে বুঝিয়ে বিদায় ক'রে দিলেন।

পরদিন ঠিক সময় মত ঐ ধনী ব্যক্তি এসে হাজির হলো। ঠাকুর বললেন, "তুমি কি স্থির করেছ?" সে ভীতভাবে উত্তর দিলো, "যা বলবেন তাই করবো।" ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার Bankএ টাকা আছে তো?" সে বললো, "আছে।" ঠাকুর বললেন, "Cheque-বই নিয়ে এসো।" Cheque-বইটা তার সাথেই ছিল, সে তা বের ক'রে দিল। ঠাকুর বললেন, "প্রতিকারের জন্য বহু টাকার প্রয়োজন হতে পারে, রাজী আছ তো?" সে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, আমার প্রাণের চেয়ে বেশী কিছু নেই।" ঠাকুর তার স্ত্রীর নামে একটা লম্বা cheque কাটিয়ে নিলেন। তারপর তিনি একটা আশীর্ব্বাদী ফুল দিয়ে দিলেন এবং বললেন, "যাও, তুমি বেঁচে গেলে।" ভদ্রলোক অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলো, কিছু প্রতিবাদ করার বা কথা বলার অবকাশ হলো না। ঠাকুর সেই ভদ্রলোকের স্ত্রীকে দেওয়ার জন্য আত্মীয়-ভদ্রলোকটিকে ডেকে chequeখানা দিয়ে দিলেন। তারপর ঠাকুর ঐ ধনী ভদ্রলোককে বললেন, "যদি আবার খারাপের দিকে মনোনিবেশ কর, বিপদ যে-কোন মুহূর্ত্তে ঘনিয়ে আসতে পারে। কিন্তু তোমার বিপদ আছে কি নাই সে সম্বন্ধে আমি কিছু বললাম না। তোমার কথার উপর নির্ভর ক'রে আমি কাজ ক'রে গেলাম, তবে যদি বিপদ তোমার আসে, ভাল তুমি হয়ে যাবেই। আর যদি বিপদ না থেকে থাকে তবে তো ভালই রয়েছ, আমারও কোন শক্তি ব্যয় নেই। কি আছে না আছে, তা আমি এখন তোমাকে জানাবো না, তবে সময়ান্তরে জানিয়ে দেবো।" ঠাকুরের আবার সব-

কিছুই সবাইকে জানিয়ে দেওয়া চাই। কোনরকম হালকা কৃতিত্বের গৌরব এসে পড়লো কিনা, সেই চিন্তাতেই তিনি সব-কিছুর প্রকৃত অর্থ বুঝিয়ে দিতেন। যে জিনিষের গুরুত্ব নেই, সেই 'গুরুত্বহীন'কে তিনি গুরুত্ব কখনও দিতেন না। মনে হয়, তিনি কোন ফাঁড়া দেখেন নি। ভদ্রলোকের ভাল হওয়া দরকার—এটাই ঠাকুর চেয়েছিলেন। ঠাকুর ওকে কিছুই বললেন না, আবার সবই বলে দিলেন এবং সময়ান্তরে যে বলবেন, তাও জানিয়ে দিলেন। তিনি তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে তার জন্য সব-কিছুই করা ঠাকুরের পক্ষে সম্ভব হবে। প্রকারান্তরে তাকে এ কথা বলে দিয়েই ঠাকুর আবার এ সমস্ত কথা বললেন শুধু তাকে শোধরাবার জন্য।

বেশ কিছুদিন পর এই ভদ্রলোক আবার যখন ঠাকুরের কাছে এলো, তখন তার বেশ একটা পরিবর্ত্তন হয়েছে। ঠাকুরের কাছে বসে আমাদের সঙ্গে ও ঠাকুরের সঙ্গে তার নানারকম আলাপ-আলোচনা হলো। ঠাকুর কথায় কথায় হাসতে হাসতে ভদ্রলোকটিকে বললেন, "সেদিন তোমার হস্ত-রেখায় ওরা যা যা বলেছিলো, সেই অনুযায়ী তোমার কোন ফাঁড়া ছিল না, আমি তখন তোমাকে একপ্রকার বলেছিলাম ; তোমার উন্মাদ অবস্থার জন্য মনে হয় কথা ধরতে পারো নি, কিন্তু তোমায় যা করেছিলাম তা তোমাকে সংশোধন করার জন্য। আবার অন্যায়ে যদি মনোনিবেশ করতে, তবে অন্যায় ঘনিয়ে আসতো তোমার স্ত্রীর দিক্ দিয়ে, তাতে তুমি অসুবিধায় পড়তে। ব্যক্তিগত তোমার কোন মৃত্যু-ফাঁড়া ছিল না হস্ত-রেখায়। তোমাকে সময়ান্তরে বলে দেব বলেছিলেম, তাই জানিয়ে দিলেম।" এরকম বহু কাজ তিনি করেছেন, দৈনন্দিন এরকম বহু ঘটনা ঘটতো যা লিপিবদ্ধ ক'রে রাখা একরকম অসম্ভব বললেই চলে। ঐ ভদ্রলোক প্রণাম ক'রে চলে যাওয়ার পর ঠাকুর আমাদের বললেন, "দেখ, মানুষ কি ভাবে রোজগার করে। কত উপায় রয়েছে

দেখলে তো ? এই ভাবেই তো মানুষ ভয় দেখিয়ে আতঙ্ক ও ভয়ের সুযোগ সুবিধে নিয়ে বহু গো-বেচারার অর্থ আত্মসাৎ করছে। Worshipটা একটা instrument of earning, honesty যেন self dishonestyর দিকে কাজ ক'রে যাচ্ছে অনেকের ভেতর দিয়ে।"

তেত্রিশ

ঠাকুরের নিকট বসে* আছি, এমন সময় একজন সাধক এসে উপস্থিত হলেন। তিনি শোনলাম প্রায়ই সমাধিস্থ হন এবং সে-অবস্থায় অনেক রকম আদেশও পেয়ে থাকেন। সাধক এসে ঠাকুরের নিকট চক্ষু বুজে বসলেন। ঠাকুর সাধকের দিকে তাকিয়ে আছেন। কিছুক্ষণ পরে সাধক কাঁপতে আরম্ভ করলেন এবং কাঁপতে কাঁপতে মেঝেতে পড়ে গড়াতে আরম্ভ করলেন ও নানা রকম ভাব প্রকাশ করতে লাগলেন, হাত-পা ছুঁড়তে আরম্ভ করলেন, একবার হাসছেন আবার কাঁদছেন—এভাবে 'মাতৃ' 'পিতৃ', 'রাধাকৃষ্ণ' বহুভাবের পরিবেশন করলেন। ঠাকুর এসব দেখে একটু হাসলেন এবং আমাদেরকে† বললেন, "সাধনার এটা যে কোন জাতীয় প্রকাশ, তা-ই ওকে একটু জিজ্ঞেস করতে হবে।" এর মধ্যে সাধক প্রায় উলঙ্গ হয়ে গেছেন। ঠাকুর বললেন "ওকে জিজ্ঞেস করতো কেন ওরকম করছে।" আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি এরকম করছেন কেন?" তখন তিনি বললেন, "আমি 'বিশ্বনাথ', কাশী হতে এসেছি।" এবং কথা বলার সাথে সাথে তিনি ঐরূপ ভাবই প্রকাশ করলেন। আমরা তাঁকে বসতে বললাম। 'বিশ্বনাথ' বসলেন এবং অবোধ্য ভাষায় কিছু বলতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে 'বিশ্বনাথ'

---

* স্বামীবাগ, ঢাকা।

† সুভাষ চক্রবর্ত্তী, দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী (২), ভূপেন রায়, অনিল ঘোষ, যদুনাথ রায়, বারীন ঘোষ, অজিত ভট্টাচার্য্য, শান্তিদাস মজুমদার আরো অনেকে।

স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন। ঠাকুর তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি এরকম করছেন কেন? আর এগুলো কোন জাতীয় সাধনার অঙ্গ? আপনি নিজের উপর বেশ খেয়াল রেখেই বোধ হয় এগুলো করছেন। যদিও আপনি ভাবের পরিচয় দিয়ে গেছেন, তথাপি এ মোটেই ভাবের অভিব্যক্তি নয়, এগুলো ঠিক ভাবের বিকারের মত।" সাধক বললেন, "আমার মধ্যে যখন এসব দেবদেবীর আবির্ভাব হয়, তখন আমি আত্মহারা হয়ে যাই।" ঠাকুর বললেন, "এও কি সম্ভব? আর এও কি বিশ্বাসযোগ্য? যদি এতটা সহজে মনের এতটা পরিচয় দিতে পারতেন, তবে আর নিজেকে অভিব্যক্ত করার জন্য এই সমস্ত কার্য্যকলাপ করতেন না কিংবা যুগলমূর্ত্তি কিংবা মাতৃমূর্ত্তিকে প্রকাশ করবার জন্য বা আপনার ভেতরের এই 'বিশ্বনাথ'কে ফুটিয়ে তোলার জন্য যে রকম পরিশ্রান্ত হয়ে যে সমস্ত করছেন, নিজে জোর ক'রে লজ্জার হাত থেকে এড়িয়ে এবং মুদ্রাদির দ্বারা নানারকম ভাবের দ্বারা যা-কিছু করলেন, প্রকৃত বিভূতি বা শক্তি যদি আপনার থাকতো তবে এ সকলের আশ্রয় নিতেন না। আদতে নেই বলেই ঐ ভেতরকার পরিচয়টা নানা গতিবিধিতে maximum উলঙ্গ পর্য্যন্ত গিয়েছেন। নিজের আত্ম-প্রবঞ্চনাকে ঢেকে সেটাকে সত্যরূপে দেখাবার জন্যই যা-কিছু, আর যদি প্রকৃত সত্যই থাকতো তবে এই সমস্তের বালাই থাকতো না আর 'ভাঁড়' কিংবা 'দশা'র systemটা হচ্ছে নিজের সত্যতা ও সাধুতার চেহারা প্রকাশ ও প্রচার। বিভূতিকে তাচ্ছিল্যের চেহারায় বর্ণনার অভিসন্ধির কারণ, কোন্ সময় কে কোন্ বিভূতির জন্য আঁকড়ে ধরে, তাই আগেই তার হাত হতে রেহাই পাওয়ার জন্য ঐ বাণীগুলো প্রচার করে থাকে, আবার তারা বিভূতিবৎ কার্য্যের চেহারায় পরিণত করার জন্য ঐ সমস্ত আনুষঙ্গিক নানা-রকম 'দিলালি' ভাব ক'রে এক জাতীয় বিভূতিসম্পন্নের পরিচয়

দিয়ে যাচ্ছে। কারণ যে মহান্ শক্তির আবির্ভাব হয়েছে বলে পরিচয় দিচ্ছেন, তাঁর গতিবিধি বোধ হয় মুদ্রা, উলঙ্গ আর ক্ষণিকের হাসি, ক্ষণিকের কান্না—এই শক্তির বিকাশ করেই বুঝি 'বিশ্বনাথ' শক্তির প্রকাশ করছেন। আর দর্শকহিসাবে যাঁরা থাকেন, তাঁদের কাছে ঐ জাতীয় অবস্থা অস্বাভাবিক বলে মনে হয়, কারণ স্বাভাবিক চিন্তাতে ঐ জাতীয় কার্য্যকলাপগুলো দুর্ব্বোধ্য বলে মনে হয়। তাই অনেকে একটা অস্বাভাবিক কিছু ভেবে আর চোখে সংস্কারের ঠুলি প'রে 'একটা কিছু এসেছেন ঠিকই, নইলে কি আর এই হয়?'—নানারকম যার যার ঠুলি-অনুযায়ী যা-কিছু দেখে একটা মন্তব্য ক'রে চলে যাচ্ছে, এবং এই অবস্থা হতেই প্রচারের সূত্রপাত। তারপর এভাবে এভাবে প্রচারের দ্বারা ক্রমশঃ জিনিষটা এরূপ জটিলতায় গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর সেই ব্যক্তি 'স্বয়ং'এ গিয়ে দাঁড়ায়, universal ideaতে স্বয়ং সে-বিষয়ে কোন ভুল নাই, আর 'যিনি' বলেছেন 'তিনি'ও যে তার মধ্যেই একজন। সুতরাং এই সামাজিক এবং এদিক্কার বিচার-ক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে যে সমস্ত ভাবগত যা চলছে, তাদের দিয়ে তাদের ভেতরেরই কথোপকথন করা হচ্ছে, তাদের বিচারেই তারা কি পর্য্যায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেই সমালোচনাই করছি। তাতেই তারা যে পরিচয় দিচ্ছে, তাদের পরিচয়েই তারা বাতিল হয়ে যাচ্ছে,—আমার বক্তব্য সেখানেই। আমার বিশ্বাসটা তাদেরে দিয়েও তাদের অবিশ্বাস ক'রে যাচ্ছি, কিন্তু বিশ্বাস করবার জন্য এত ঝোঁকা সত্ত্বেও যে পারছি না তাতে বাস্তব বুদ্ধিতে নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়ছি। তবে সত্যের প্রতিষ্ঠা—সেই দৃঢ়তাই আমার জীবনপণ; তাই কারো কোন মনের দিকে চেয়ে কোন দিকে চেয়ে আমি আমার জানার পথ কিংবা জানিয়ে দেওয়ার পথ হতে চ্যুত হইনি।" তখন সাধক বললেন, "আমার এরকম ভাব তো বহুদিন হতেই হচ্ছে।"

ঠাকুর বললেন, "আমি যদি বলি ঐ ভাবটা, ভাবের ভাবের যে কথোপকথনটা, তা ব'লে নিজের বর্ত্তমান অবস্থার অবস্থাতে আস্থা স্থাপন করিয়ে দেওয়ার জন্য আপনি ঐ সমস্ত কথা টেনে আনছেন।" তখন সাধক বললেন, "আমি সত্য কথা বলছি, আমি মিছে কথা বলি না ; কেউ বিশ্বাস করুক বা না করুক তাতে আমার কিছু এসে যায় না।" ঠাকুর বললেন, "তারপরেই আসে 'তুল্য নিন্দাস্তুতি'র ব্যাপার—উপায়হীনের একমাত্র বাণী, দুর্ব্বলতায় ভগবানকে ডাকা ছাড়া যেমন উপায় নেই ; তাই শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে যে সমস্ত উক্তিগুলো আছে, এই সমস্ত 'দশায়' ও 'ভাবে' পড়া—এ জাতীয় ব্যক্তিদের রেহাই-পূর্ণ বাণী রেহাই পাওয়ার জন্য প্রয়োগ ক'রে যাচ্ছে। আপনি নিজেই বলছেন, 'কেউ বিশ্বাস করুক বা না করুক, আমি সত্য বলছি, মিথ্যা বলছি না।' আপনার এর আগের কথায় যে জোর পেয়েছি, এর আগে আপনাকে বলছিলাম, 'আপনার মা তো মরেনি।' আপনি বলেছেন, 'হ্যাঁ, মরেছে।' সেই "হ্যাঁ'র মধ্যে জোর ছিল, আমি এরপরই বলছি, 'আপনি মিছে কথা বলছেন, মা মরেনি', তখন আপনি জোর দিয়ে বললেন, 'মা হলো আমার, আপনি বললেই হবে নাকি ? আমি জানি না আমার মা মরেছে কিনা ? আপনি বললেই হবে ?' তাতো ঠিকই, আর যখন বললাম, 'বিশ্বনাথ' আসে নাই ফাঁকি, আর আপনি যা-কিছু করছেন, সবগুলো হচ্ছে কৃত্রিম, অভিনয় আপনি করে গেছেন 'বিশ্বনাথের' নামে, তখন তো আপনি তেমন জোর দিতে পারলেন না, তখন আপনার সুরের ভেতর বেসুরেরেই সাড়া পাওয়া গিয়েছিল, তাতে সন্দিগ্ধ ও বলহীনেরই পরিচয় পাওয়া গিয়েছিলো। আপনি যে ধরা পড়েছেন সে ভয়ে আপনি কম্পিত, আপনার কৃত্রিম ব্যবহারের জন্য আপনিই কম্পিত ও ভীত। সেই উচ্চ সুর নেই, সেই strength of mind নেই, কারণ সততা সেখানে নেই, তাই পাচ্ছে না। চোখমুখের ভাবেতে সেই মাতৃ-

বিয়োগের তর্কে যে strength of mindএর চেহারা ছিল, শিবহীনের অবস্থাতে তো তা নেই। আপনার কাছে আমি দুটোকেই 'নেই' বলে জিজ্ঞেস করেছি। আপনি এখন বলুন, আপনার নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করুন কি কাজ করে যাচ্ছেন। অনেককে ধাপ্পা দিয়ে নিজেকে এক জাতীয় প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছেন সত্যের আরোপ ক'রে। যা বললাম সত্য নয় কি?" তখন সাধক চুপ করে রইলেন। হঠাৎ তাঁর চেহারায় একটা করুণ ভাব দেখা গেল। মনে হলো যেন তাঁর ফাঁকি ধরা পড়েছে। সাধক আমাদের অনুরোধ করে বললেন, "আপনারা একটু বাইরে যান, আমার একটু কথা আছে।" আমরা বাইরে চলে গেলাম। কতকক্ষণ পর ঠাকুর আমাদের ডাকলেন। আমরা ঘরে ঢুকতেই ঠাকুর আমাদের বললেন, "এ বেচারা কাঁদছে, একে একটু শান্ত কর।" আমরা দেখলাম সাধক ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। আমরা সাধককে শান্ত করলাম, তিনি ধীরে ধীরে প্রকৃতস্থ হলেন। তখন সাধক তাঁর মনের কথা ঠাকুরের নিকট বলতে সুরু করলেন, "আপনি তো সবই বুঝতে পারছেন, আমি যে অপরাধ করেছি, এখন আমার কি উপায় হবে? আমায় আপনি উদ্ধার করুন, আমি সত্যিই সবাইকে এভাবে ঠকিয়ে এসেছি। বহুদিন আগে আমি একজনের কাছে যাই, সে ঐ রকম করতো। সে আমায় তার শিষ্য ক'রে নেয় এবং গোপনে আমায় এসব করতে বলে দেয়। আমি ভাবলাম তার আসনটা পাওয়া যাবে এবং তাতে আমার মোটামুটি চলে যাবে। আমি বহু জায়গায় গেছি, বহু বহু লোককে এসব করতে দেখেছি, সুতরাং আমি তখন ভাবলাম যে এর মধ্যে আমার ভাবগুলোকেও খাপ খাইয়ে নিতে পারবো।" সাধক এভাবে অনেক কথা বলে ফেললেন। তিনি বললেন, "এখানে যে উলঙ্গ হয়েছি, এটা শুধু অবস্থার সাথে তাল রেখে বাহবা নেওয়ার জন্য, কাজেই উলঙ্গ হতে কোন দ্বিধা বোধ করিনি।" ঠাকুর বললেন, "বাহবা পাওয়ার জন্য অনেক

কিছু করে ফেলা যায়, সুতরাং সাধারণ চক্ষে ওটাই আশ্চর্য্য—'মার প্যাঁচ' সেখানেই। দেখ, আমাকে একজন বলেছিলো সব-কিছু খুলে আমার জীবন-চরিত লিখতে। আমি বললাম, 'যে জীবনের 'আকাম কুকাম' জাতীয় যা-কিছু অপরের দিক্ থেকে এসেছে তাও লিখবো নাকি? তারপর আমি সব খুলে যে বলবো sincerely, ওটাই সূক্ষ্মে একটা credit নেওয়া দেখছি যে; আর জীবন-চরিত যে যত প্রাণ খুলে লিখবে, creditএর মাত্রা তার তত বেড়ে যাবে—সেখানেই বোড়ের মুক্ততার চাল। মাঝে মাঝে আলাপ-ছলে নিজে নিজেই হাসি, কেউ আমাকে সরল বলে, কেউ বলে 'একেবারে ছেলেমানুষ, কিছুই বোঝে না', কারণ আমি একেবারে খুলে বলি কিনা। এই সমস্ত কথা সম্মান-সূচক ভাবেই বলে, আর 'ছেলেমানুষ, কিছু বোঝে না'—এগুলোতে গুণেরই পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। একটা মেয়ে একদিন এসে হাত ধরে টান দিয়েছিলো, ভাব করতে চেয়েছিলো, আরো কত কিছু, কিন্তু আমি যাইনি, আমি তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে avoid ক'রে এসেছি, minus করে দিয়ে এসেছি, আবার আমার বাবা মা'র কাছে গিয়ে বলি, 'এরকম একটা মেয়ে এসেছিলো, আমাকে অনেক কিছু ব'লে গোপনে এক জায়গায় যেতে বলেছিলো।' বাবা মা হাসেন আর বলেন, 'ছেলেটা একেবারে বোকা!' আর ভক্তরা বলছে, 'ঠাকুর কি ছেলেমানুষ!' কিন্তু এই যে এক জাতীয় sincere-গিরি করলাম, সেটা বাবুগিরির মতই দেখলাম, এ একটা সেরেফ credit নেওয়ার মত দেখলাম সূক্ষ্মে; কারণ আমার ডান হাত বাঁ-হাত খেয়াল নেই লোকের কাছে। মা বলেন, 'তুই কিছুই বুঝিস্ না।' বাবা বলেন, 'এত ছেলেমানুষ হলে কি ক'রে চলবে?' সবাই বলাতে আমি যেন 'হাবা' ব'নে গেলাম্। তখন চিন্তা করলাম circumstantial influenceএ ঐ 'হাবা' সেজে থাকাটাই আনন্দ, কিন্তু আমি তো বুঝতে পারছি 'আমি 'হাবা'র যে বাবা।' কিন্তু তখন আমি সবাইকে

বললাম, 'হাবা বনলে চলবে না; sincerely খুলে যে বললাম, এটা কিন্তু একটা personally credit নেওয়া—'আমি সত্যবাদী, আমি সব কথা বলে ফেলি!' আমি যে কেন বললাম, সাধারণের পক্ষে তাহা বলা অস্বাভাবিক, কিন্তু আমিও সাধারণের মধ্যেই একজন; আমার পেছনে 'সাধু', 'গুরু', 'মহান্' বলে ছাপ আছে কিনা, তাই আমার বলাটা creditএর মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে—এই জাতীয় অবস্থাতেই influence ক'রে অবস্থায় ভুলিয়ে রাখে, আবার নিজের স্বরূপকেও change করিয়ে দেয়, এই যে পরিবর্ত্তিত হয়—বুঝছে, যাচ্ছে, অনেক সময় অনিচ্ছায়ও যেতে হয়, তারপর আর উপায় থাকে না, যেতেই হয়। আমার বেলায়ও প্রায় সেই অবস্থাই আসতে চেয়েছিলো, আমি আবার ওর উপর দিয়ে চলতে আরম্ভ করলাম, 'এসব বললে চলবে না, আমি হাবা সাজবো না, আমি ছেলেমানুষ মোটেই নই।' আমি বুঝে শুনেই সব বলছি, sincerityর যে চেহারা দেখালাম তা বুঝেই করছি, এটা বললে যে credit হবে তাও আমি জেনেছি, সুতরাং মুখে যে বললাম, এই যে এক জাতীয় ধরা দিলাম, এটাও একটা kind of credit নেওয়া to the power infinity, অর্থাৎ যা বলবো তার মধ্যেই selfকে maintain ক'রে চলছি। কিন্তু সেই maintenanceএর মধ্যে একটা 'খুশ' থেকে যায়, সব-কিছু details time to time বলে যাচ্ছি, সুতরাং influenced হওয়ার আর ভয় বেশী থাকে না।" তারপর ঠাকুর আরো নানাবিষয়ে আলাপ করলেন। সাধক প্রণাম করে বললেন, "এ যে 'বহুৎ ওস্তাদ'।" ঠাকুর তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন, "একজন যে ভেক্ ধরে অন্যের নিকট মহান্ বলে পরিচয় দিচ্ছে, সে ভাবছে, 'আমি' ঠিকই realisationএর দিকে যাচ্ছি। 'আমি' ভাবছি সে realisationএর দিকে ঠিকই যাচ্ছে, তাই silenceটা maintained হয়ে যাচ্ছে। 'ছলে' যে মহান্ সেও চলে যাচ্ছে, 'বলে' যে মহান্ সেও চলে যাচ্ছে,

আবার উভয়ে উভয়ের ভাব যদি ঠিকই বুঝতে পারে, সমব্যবসায়ী বলে উভয়ে উভয়কে মানিয়ে চলছে। আর 'বলে' যে মহান্ তার তো ছলকে নষ্ট করে দেওয়া উচিত আর প্রকৃত রূপকেও বের করে দেওয়া উচিত। সত্যতা প্রকাশ সেখানে হবে, সত্য যেখানে প্রতিষ্ঠিত আছে। আবার আঘাত দিলে যার যার স্বরূপ বের হতে থাকে তাদের positionএ ঘা লাগার জন্য, বেশীর ভাগ তাই হচ্ছে। যারা সত্যে প্রতিষ্ঠিত তারা কোনটাতেই টলবে না, জাগ্রত করবে এবং জাগায়ে দেবে।"

চৌত্রিশ

একদিন আমরা* নদীর† পাড়ে ঠাকুরকে নিয়ে বসে আছি‡। পূর্ণিমা রাত। পাড়ে বসে বসে নানারকম কথাবার্ত্তা হচ্ছে। কাগজ পেন্সিল আমাদের সাথেই আছে, যতটা পারছি চাঁদের আলোতে টুকছি। আমাদের মধ্যে একজন কথায় কথায় ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা ঠাকুর, চন্দ্র এবং সূর্য্যের পূজো কেন করে এবং এ পূজায় কি উপকার হচ্ছে?" ঠাকুর চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছেন। চাঁদের আলোতে তাঁকে বেশ দেখাচ্ছে, আমরাও দেখে বেশ উপভোগ করছি। ঠাকুর একটু হেসে বললেন, "এ যে প্রেমের খোরাক রে!" ঠাকুর আমাদের নিয়ে প্রায়ই একটু আধটু রগড় করতেন, তাই তিনি হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন, "কবিত্ব সাহিত্য তো এমনিই ফোটে! আমার মত কৃষকের পক্ষে সম্ভব কি প্রেম সম্পর্কে কবিতা লেখা? আর এ মর্ম্ম সম্পর্কে বলতে গিয়ে বাইরের মর্ম্ম সম্বন্ধে বুঝতে গিয়ে নাকে কাপড় দিয়ে দৌড় দিলেম।" আমরা জিজ্ঞেস করলাম, "সেটা কি রকম হলো?" ঠাকুর বললেন, "আরো ভেতরে চলে গেলাম, আমি কিন্তু ডাক্তার, গেছি 'অপারেশন' করতে, এমনি পিক্ বেরিয়ে গেছে, ঐ সমস্ত চেহারা দেখে তখন কি সেই দৃষ্টি

---

* সতীশ দে, সুরেন্দ্র দে, নবদ্বীপ দাস, অজিত ভট্টাচার্য্য, বঙ্কিম মাষ্টার, মণীন্দ্র চক্রবর্ত্তী আরো কয়েকজন।

† তিতাস।

‡ কৃষ্ণনগর, ত্রিপুরা।

থাকে ? ভেতরে হাত দিয়ে নাড়ীভুঁড়ি দেখে, আমি আর কি উপভোগ করবো রে ! আমার জন্য এসব চাঁদের আলো ? এসব ওদের জন্য। আমি ঢুকবো ভেতরে দেখবো মলমূত্র, চাঁদ আর নেই, তখন দেখবো combination of every parts, দেখবো moleculesএ চলে গেছি খুঁজতে খুঁজতে। এখন এমন একটা আবিলতার মধ্যে চলে যাবো, তখন আর প্রেম করবার সময় থাকবে না, ঠিক যন্ত্র ফেলে রস নিংড়ানোর মত শুধু রস নিংড়িয়ে চলে যাই ; এর মধ্যে কি তত্ত্ব আছে, তত্ত্ববিদ্‌দের এ জাতীয় উচ্ছ্বাস করার সময় থাকে না। এর মধ্যেও কি গান গাওয়া যায় না ? এর মধ্যেও গান গাওয়া যায়—সে হলো আলাদা ব্যাপার।

যাক্ যা জিজ্ঞেস করছিলি, সে ব্যাপার বলছি, অন্ধকারকে আলোতে এই তো উদ্ভাসিত করছে, প্রয়োজন তো একেবারেই তা finished। আলোতে সবই সম্ভব, সব একেবারে আলোকিত রয়েছে, অন্ধকার কিন্তু সঙ্গেই। তুই যদি ঠিক আলোর গতিতে দৌড়াতে পারিস, এক পা অন্ধকারে, এক পা আলোতে, ইচ্ছে করলে এ ভাবে থাকতে পারিস। এখন এই চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ তারকাদি তোমার ভেতর ঠিক তেমনি জ্বলছে, কারণ তাপ তোমাতে রয়েছে, তাতে রয়েছে এবং যার যার ক্রিয়া, ঐ জাতীয় অবস্থা প্রকারান্তরে করে যাচ্ছে। তুমি যদি সেই সূর্য্যের চিন্তা কর, তোমার স্বাভাবিকতায় সূর্য্য সাংঘাতিক উত্তপ্ত, তা অনুভব করতে পারছো এবং সেই উত্তপ্তের মধ্যে যখন নিজেকে ঢেলে যাচ্ছো এবং সেই অনুযায়ী তোমার partগুলোও গড়ে যাচ্ছে এবং স্বাভাবিক নিয়মেতে গাছের পাতা যেমন ray থেকে বাতাস থেকে তার খোরাক নিচ্ছে, ঠিক সেই partগুলোও rayএর থেকে ray খাচ্ছে এবং খেয়েই আর একটি যে রসের উৎপাদন করছে, আর একটা partsএর খোরাক দাঁড়াচ্ছে—এভাবে চলছে আর একটি অবস্থা ; rayই কিন্তু খেয়ে খেয়ে তারা বাড়ছে,

তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক সবই রয়েছে। আগেও তো বলেছি, মনে তো নিশ্চয়ই আছে তোদের। Magnetএর সঙ্গে মিশে যেমন magnetised হয়ে যায়, ঠিক সূর্য্যের চিন্তাতে চিন্তাতে দেখবি তোর সমস্ত part সেরূপ হয়ে যাচ্ছে, partগুলো অত বড় নয় বলেই বুঝি অসুবিধা হয়? Temperature ইচ্ছে করলে carry করে নিয়ে আসা যায়, এতটুকু বিন্দুতেও ঐ 'উত্তপ্ত' maintained হতে পারে, যেমন একটা পিঁপড়ে একটা ভাত নিয়ে যাচ্ছে, প্রকারান্তরে দেখা যাচ্ছে এ পিঁপড়েটা থেকে ভাত অনেক ওজন বেশী কিন্তু টেনে নিয়ে যাচ্ছে; এটাকে যদি ওজনে আনা যায়, মানুষের সামিল করলে ভাতটা প্রায় দশ মনের মত; ঠিক ঐ যে বিন্দুটা, ঐ যে carry করছে দেখা যাচ্ছে ঐ বিন্দু টেনে টেনে আরো বেশী শক্তিশালী হচ্ছে, যেমন photographyতে বিরাট জায়গা এতটুকুতে সব দেখা যাচ্ছে, ততদূর যাওয়ার দরকার কি? তোর যে জিহ্বা তাতে সব স্বাদ পাচ্ছিস্; জিহ্বা কিন্তু বহু নয়—এক, আবার সব স্বাদই পাচ্ছিস্; আর দেখিস এক নাকে সব ঘ্রাণ পাচ্ছিস্; চক্ষু কতটুকু, তাতে সব দেখতে পাচ্ছিস, এটা রহস্য নয় কি? আশ্চর্য্য নয় কি? সহজ ব'লে দাম দিতে পারছিস্ না, কিন্তু ছোট্টর মধ্যেই যে বিরাট কি ভাবে রয়েছে এবং সব-কিছু যে কি ভাবে সজ্জিত রয়েছে—সব-কিছুই দেখবার মত। তেমনি এত বড় আলোক, এতগুলো তারকা ঐ এক-একটি glandএর এক-একটি partএর ভেতর টেনে নিয়ে সব-কিছু নিয়ে সমতার পরিচয় দিচ্ছে অজস্র অজস্র টেনে নিয়ে। কত অংশের সমষ্টি রয়েছে, কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ রয়েছে যাকে 'তুমি' বলে প্রকাশ করছো, 'আমি' বলে প্রকাশ করছি, তাতে এই যে 'আমি' বলে এবং 'তুমি' বলে সম্বোধন করছি; এই যে 'আমি', 'তুমি' শব্দ বলছি—এই শব্দকে যদি divide করতে যাস্, কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে ভেতরে গিয়ে যে মিল রয়েছে, আবার সব-কিছু একত্রিত হয়ে ভাষার পরিচয়

দিচ্ছে, শব্দের পরিচয় দিচ্ছে। যন্ত্র যেমন শত তারেও একটা শব্দেরই পরিচয় দিচ্ছে, এই যে vibration অথবা প্রত্যেকটি শব্দের সমন্বয়ে যে শব্দটি হচ্ছে, ঠিক তেমনি অজস্র অজস্র অংশের সমন্বয়ে অণুর সমন্বয়ে partগুলো এভাবে রয়েছে যে এক-একটি বাহ্য-বস্তু যখন গ্রাহ্যেতে আনা হয়, তখন সেই বস্তুগুলো, অংশগুলো সেই সমতাতে গিয়ে প্রত্যেকটি সমতুল্যের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে, তখন অজস্র অজস্র চন্দ্র সূর্য্য তোমাতে বিরাজিত অবস্থায় বিরাজ করছে। এক সূর্য্য সমস্ত পৃথিবী এবং আরো অনেক পৃথিবীকে যেমন রক্ষা ক'রে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে যাচ্ছে, প্রয়োজনের তাগিদে যেমন তার আগমন, ঠিক অজস্র অজস্র সূর্য্যের সমন্বয়ে প্রয়োজনের তাগিদে তোমাতে যে বিকশিত হচ্ছে ও সঞ্চালন করছে হয় মনের দিক্ দিয়ে, না হয় জ্ঞানের দিক্ দিয়ে। মন যে অত বড়, তার কত যে বিকাশ, তাকে আবার আলোকিত করতে হলে, তাকে ফুটিয়ে তুলতে হলে এক সূর্য্যে দুই সূর্য্যে কি হবে—তাকে খোরাক যুগিয়ে যাচ্ছে অজস্র অজস্র সূর্য্য-শক্তির সমন্বয়ে। সব-কিছু নিয়ে উদ্ভাসিত হচ্ছে সেই মন, কি জ্ঞানে কি বিচারে এই যে খোরাক নিচ্ছে, এই যে সঙ্গত, এর নাম কিন্তু বাস্তবে দিয়েছে 'শিবশক্তি'—নাম শুনেছ তো? এই universeএর খোরাক সম্পর্কে—সে হচ্ছে আলাদা ব্যাপার—কেহ প্রকৃতি-পুরুষের মিলিত অবস্থা, কেহ সঙ্গম অবস্থা বহু নামাকরণে যার যার ভেদাভেদে পড়েছে, সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ব-অবস্থায় এবং চিরন্তনের মত এই সঙ্গতে maintain করছে। সেই ঝড় সেই ফোয়ারা এমনি ভাবে চলছে আমাদের ভেতর দিয়ে, যার নাম 'সহস্রার', সহস্রভাবে সহস্রমুখী হয়ে সমস্ত ধারাতে, যার নাম বলতে পার 'সহস্রদল' ইত্যাদিতে। যা'ক সে কথা—ঠিক তেমনি তোমার ধারাও চলছে তাতে এবং এই দুয়ের সঙ্গমেই হচ্ছে সৃষ্টি—যেমন তোমাতে আর নারী-সঙ্গমে, দুয়েতেই দুয়ের

সরবরাহ যখন সমভাবে মিলিত হয়, তখনই সৃষ্টির আবির্ভাব হয়। সৃষ্টি দু'রকমই—উপভোগও সৃষ্টি, আবার প্রসূতির প্রসবে—এক জাতীয় সৃষ্টি ; আবার সেই সঙ্গমের যে ধারা বাহ্যিক সম্মিলিত অবস্থা, তাতে যে কীটের উদ্ভব, তাতেও আর এক সৃষ্টি। দেখা যাচ্ছে একই সৃষ্টিতে কতগুলো রূপ দিয়ে যাচ্ছে এই প্রত্যেকটি স্তরে স্তরে বহু বহু রূপে, সেই রূপকেই বলেছে 'অগণিতরূপ', তাই প্রত্যেকটি অবস্থা যখন অগণিত হয়ে যাচ্ছে—গণিত সেখানেই দাঁড়াচ্ছে। তাই এই সৃষ্ট জীবের যতটুকু বাহ্য ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যেতে এসেছে, গণিতের কষাকষির ভেতর এক হতে একশত পর্য্যন্ত যেমন সংখ্যা রয়েছে, এই দিয়ে যেমন এক কোটি হতে অনন্ত কোটি, এতে যখন বহন করে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে, তেমনি এই সৃষ্টির ভেতরও রহস্য, তাতে যে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ রয়েছে যেমন—চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা—কি চন্দ্র, কি সূর্য্য, কি তারকাদি, কি বিশ্বরূপের যে কোন পদার্থাদি এই গণিতের 'এক হতে দশ'এর মত কয়েকটি সংখ্যা-বিশেষের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে মাত্র। সেই 'অগণিত'কে বহন করার জন্য তাই এ সমস্তের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।" ঠাকুর অল্পের উপর দিয়ে আমাদের কয়েকটি কথা বললেন মাত্র। তিনি বললেন, "আরও অনেক তত্ত্ব বলার রয়েছে, তবে মাত্র কয়েকটি কথা বললাম।" আরো অনেক কিছু বলেছেন, কিন্তু সব লিখতে সমর্থ হইনি। ঠাকুর এর মাঝে আর একটি কথা বললেন, "দেখ, কেউ বুঝে করুক আর না বুঝেই করুক, প্রকারান্তরে কার্য্যকরী এক জাতীয় হয়েই যাচ্ছে, বিকাশ যে দিক্ দিয়েই থাক—action তার হবেই ; তবে বেশী কিছু না, সময়োপযোগী সব-কিছুর প্রয়োজন রয়েছে। এখন ধ্যানের কার্য্য করবে—চৈত্র মাসে লেপ গায় দিয়ে বসলো—গ্রন্থে আছে দুই কম্বল গায়ে দিয়ে বসবে ; অবস্থা হচ্ছে শুধু শীতের জায়গা

আর গ্রীষ্মের জায়গা। এখন ব্যবহারের দিক্ দিয়ে যদি গ্রীষ্মের জায়গায় শীতের জায়গার ব্যবহার করে বসে, তবেই একটু অসুবিধা; ওস্তাদ থাকলে বেশী অসুবিধে হয় না, তাই এসব চন্দ্র সূর্য্য। যে কোন অসুবিধাতে গেলে তার মাত্রা যদি ভুল হয়ে যায়— শূন্য দু'একটা মাত্র, শূন্যের মাত্রা বেড়ে গেলেই কিন্তু 'দশ'এর জায়গায় দশ হাজার হতে পারে, আবার কমে গেলে দশ হাজারের জায়গায় দশও হতে পারে, আবার এক বাদ দিলে শুধু শূন্য পেয়েও আসতে পারে যে। কোন অবস্থা, কি করছে না করছে, সেটাই চিন্তণীয় ব্যাপার। তোমার ভেতরে এখন ঠাণ্ডার দরকার তুমি দিয়ে বসলে গরম, সেখানে সর্দ্দিগর্ম্মির ভয় আছে। উপযুক্তে যদি উপযুক্ত ঔষধ না পড়ে, বিপদ প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, সে তো তোমরাই জান। কার সূর্য্য, কার চন্দ্র, কখন কোন আবহাওয়ায় কার কি প্রয়োজন, সেটা কৃষক ক্ষেত্র বুঝে বুঝে দিতে জানে; জানিস তো বর্ষার আগমনে সরিষা রোপণ করলে জলে ভেসে যাওয়ার ভয় আছে।"

—

পঁয়ত্রিশ

প্রায়ই আমাদের* ক্লাস চলতো, ক্লাসে বহু রকম আলাপ-আলোচনা হতো। সব সময় লেখার মত সময় ও সুযোগ হতো না। এর মধ্যে আবার অনেকে কিছু কিছু লিখেও নিতো। আমরা এখানে† একাদিক্রমে প্রায় চার পাঁচ মাস ঠাকুরের নিকটে আছি। আমাদের ক্লাস চলছে, ক্লাসে সর্ব্বপ্রকার লোকেরই সমাগম হচ্ছে—বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবক, যুবতী সবাই আসছে। ঠাকুরের বয়স তখন পনেরো বৎসর চলছে, তিনি পাহাড়ের দিক্ থেকে মাত্র এসেছেন। বেশ কয়েকদিন যাবৎ আমাদের ক্লাসে 'ধ্যান' 'যোগ' সম্পর্কে নিয়মিত আলাপ হচ্ছে। এরপর হঠাৎ ঠাকুর কয়েকদিনের জন্য একটু বাইরে‡ গেলেন। আমরা§ তাঁর সাথে গেলাম।

* * *

ঠাকুরের উপস্থিতি অনেকেই জানলো, লোক সমাগমও বেশ হতে লাগলো। কয়েকদিন পর কুড়ি-বাইশ বছরের একটি সুন্দরী মেয়ে

---

* যদুনাথ রায়, বারীন ঘোষ, প্রাণ শঙ্কর চক্রবর্ত্তী, শান্তি দাস মজুমদার, খোকা রায়, অজিত ভট্টাচার্য্য, দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী(১), আরো অনেকে।

† স্বামীবাগ, ঢাকা।

‡ চট্টগ্রাম।

§ অজিত ভট্টাচার্য্য, আশু সেন।

ঠাকুরকে দেখতে এলো, ঠাকুরের কথাবার্ত্তায় এবং শিক্ষাপদ্ধতিতে সে বেশ আনন্দ পেলো ; কিন্তু এই আনন্দের উচ্ছ্বাস শেষ পর্য্যন্ত ঠাকুরের উপরেই গিয়ে পড়লো। উপদেশ শুনে সবাই চলে যায়, অথচ মেয়েটি সবাই চলে গেলেও বসে থাকে, প্রতিদিন তার একটি গোপন কথা থেকে যায়। সে তার গোপন কথাটি ঠাকুরকে জানাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে, আমাদেরও* সরিয়ে দেয়। অথচ ঠাকুর আমাদের ইঙ্গিত ক'রে বুঝিয়ে দেন 'তোমরা যেও না।' আমাদেরও তাই যাওয়া হয় না, মেয়েটিরও গোপন কথা আর বলা হয় না। অবশেষে উপায় না দেখে মেয়েটি তার গোপন কথা চিঠির ভেতর দিয়ে প্রকাশ করলো। ঠাকুর চিঠিটা পড়লেন, পড়েই আমাদের হাতে দিলেন। আমরা দেখলাম চিঠিতে লেখা আছে, "আমি যেদিন হতে তোমাকে প্রথম দেখি, সেদিন হতে আমি আমার মধ্যে নেই। তুমি আমার মনকে হরণ ক'রে নিয়েছো, দেবতা হলেও তুমি, স্বামী হলেও তুমি, তাই আমার মনের সুপ্ত বাসনা তুমি পূর্ণ কর—আমি তোমাকে পেতে চাই-ই-ই।" তারপর ঠাকুর বললেন, "ওস্তাদ যদি ঠিক থাকে, 'তাল' কেটে গেলেও ঠিক তাকে গুছিয়ে নিয়ে যেতে পারে। যেভাবে এসেছে সেভাবে রেখেই ওর মনকে পরিবর্ত্তন ক'রে দিতে হবে।" তিনি মেয়েটিকে ডাকলেন এবং ওকে বুঝালেন, "তুমি যেভাবে আমায় চাচ্ছ, আমি যদি তোমার সঙ্গে যাই, আমার যদি কোন প্রকার ক্ষতি আসে, সেরকম কার্য্য কি তুমি করতে চাও ? সুতরাং তুমি যদি আমায় প্রকৃতই ভালবেসে থাক, আমার দ্বারা যে সবাই তৃপ্তি পাচ্ছে, সবাই যে ভালবাসছে, তা দেখে বুঝে তুমি তৃপ্তি গ্রহণ কর, তবেই হবে প্রকৃত ভালবাসা।" মেয়েটি তবুও ঠাকুরকে

---

* অনিল ভট্টাচার্য্য, চিত্তরঞ্জন দাস, অজিত ভট্টাচার্য্য, আশু সেন, কৃষ্ণ প্রসন্ন তর্কবাগীশ সপ্ততীর্থ।

নেবেই—কান্নাকাটি করতে লাগলো। তখন ঠাকুর বললেন, "তোমার মনের উন্মাদনা উত্তেজনায় চলে গেছে কিনা, তাই কোন কথাই তোমার কর্ণে যাচ্ছে না, তুমি আমার সৌন্দর্য্যে কিংবা আমার যশে প্রতিষ্ঠাতে ভুলে গিয়েছ। তুমি ভুলে যাও জ্ঞানের ভেতরে, তবেই হবে প্রকৃত ভালবাসা আমাকে। আমি যে উপদেশ দিচ্ছি; তা শোন, জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হও, সেটাই আমার কাম্য। আজ যে চাওয়ার জন্য তুমি এগিয়ে আসছো, এ যে অহরহই হচ্ছে, এতে নূতনত্বের কি আছে? সবাই যা করছে তুমিও তা করছো, সৃষ্টির আরো নূতনত্ব কিছু দেখাও, যে সমস্ত সঞ্চিত রয়েছে তা জাগিয়ে দেখাও। রাস্তায় বের হলে—কুকুর, বেড়াল, ছাগল, গরু, সবাই তো একই চাহিদার পেছনে দৌড়াচ্ছে, যদিও রীতিতেই দৌড়াচ্ছে, তুমিও কি সেই পথের পথিক হতে চাও? থাকবে—তা প্রাকৃতিক নিয়ম, তুমি যে প্রাকৃতিক নিয়মে; সমস্ত সহজাত যা তোমাতেও রয়েছে, যতটুকু না হলে নয়, ততটুকু ব্যয় ক'রে এই সমস্তগুলোকে সাহায্যকারী ক'রে নিয়ে এগিয়ে চলো সেই চলার পথে, তবেই জানবে জানা বস্তুগুলোকে—জ্ঞান সেখানেই সুন্দরভাবে খেলা করবে। যখন সেই বস্তু হতে হারিয়ে থেকে ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে মনোনিবেশে থাকে, তখন একাগ্রতা ঐ সকল গুণকে বৃদ্ধি করে—মাত্রায় না থেকে অতি মাত্রায়ও চলে যেতে থাকে, তখনই balance হারিয়ে ফেলে; তা'ই যাতে না হয় তার জন্যই balance প্রতিষ্ঠিত করতে হবে. এগিয়ে যাওয়ার জন্য। তুমি আজ এইভাবে এসেছ বলেই তো আমি বলতে পারলাম। সুতরাং তোমার উন্মাদনাকে সুন্দরভাবে গ্রহণ ক'রে তার মর্য্যাদা রেখে আমি এই কথাগুলো বললাম, তোমার উন্মাদনা হচ্ছে তুমি বৃত্তির নিবৃত্তির জন্য এগিয়ে এসেছিলে, আমি সেই বৃত্তির নিবৃত্তিই ক'রে যাচ্ছি প্রকারান্তরে, ক্ষণিকের তৃপ্তি যাতে তৃপ্তির মধ্যে থাকে, তারই ব্যবস্থা তোমাকে বলে দিলাম। সুতরাং তোমার

চাওয়াকে আমা হতে বঞ্চিত করলাম না। দুঃখ পাওয়ার তোমার কিছু নেই, যে আকারে তুমি আমায় চেয়েছিলে, শুধু পরিবর্ত্তিত অবস্থায় তোমার তৃপ্তি করে যাওয়ার বন্দোবস্ত করছি। তাই তুমি যে আবেদন করলে, তা ক্ষুণ্ণ না ক'রে আবদনকে গ্রাহ্যেতে এনে তোমার বাসনাতে রেখে দিলাম। তুমি যেভাবে আমাকে চাচ্ছ, তুমি খোঁজ ক'রে দেখবে সেভাবেই পাচ্ছ। তুমি producing machineএর products নিয়ে business কর, যন্ত্রটিকে নিয়ে নিলে products কি করে হবে? গল্পে আছে, কল্পতরুর নিকট যা চায় তাই পায়, সবাই সেখানে গিয়ে তৃপ্তি পেতো। একজনের হিংসা হওয়াতে মূলেই বিনাশ, অবস্থা তো বুঝতেই পারছ; এও ঠিক তাই নয় কি? হাল যদি ঠিক থাকে তবে সবাইকে নিয়ে নেওয়া যেতে পারে। মাঝি একজন বহন করে শতজন—শত চীৎকারেও হালের মাঝে হাল ধরে রাখলে কোন বেগই যে পেতে হয় না; আবার ওস্তাদ মাঝি সবার সঙ্গে সায় দিয়েই চলে—সেরকমই যে হতে হবে। আজ আমার হালটি রেখে তোমায়ও ঠিক রাখতে হবে; সেখানে মিলও থাকবে বৈষম্যও থাকবে। তুমি তো জান, বৈষম্য থেকেও আকর্ষণ তার মধ্য দিয়ে pass করতে থাকে, ব্যবধানেও যেমন current pass ক'রে চলে যেতে থাকে, তাতেই আলোর প্রকাশ হয়, সর্ব্বত্র আলো তাহা হতেই পায়, সে নিজেই আলোতে উদ্ভাসিত—মাধুর্য্য সেখানেই যে। দূরে থেকেও তুমি সব-কিছু পাবে ঠিক ঐ জাতীয় অবস্থাতে, সুতরাং আপসোস করার কিছু তো নেই, আলো ঠিকই জ্বলবে জ্ঞানের বিকাশ ঠিকই হবে, তবু আবার বৈষম্য রয়ে যাবে, প্রয়োজনেই যে রয়েছে; তাই যা-যা বলে দেওয়া হলো ঠিক সেই অনুযায়ী কার্য্যে নিজেকে ব্যয় করবে। জীবনের উদ্দেশ্য সব-কিছু হবে—যখন নিজেকে খুঁজে বেড়াবে।" ওকে এভাবে বলতে লাগলেন, মেয়েটি ঠাকুরের কথায় তৃপ্তি পেলো। তারপর ক্ষমা চেয়ে

প্রণাম ক'রে দীক্ষা নিয়ে চলে গেল। দীক্ষা নেওয়ার পর ঠাকুর ওকে বললেন, "তুমি আমায় বিয়ে করতে চেয়েছিলে।" মেয়েটি লজ্জিত হয়ে মাথা নত করলো। ঠাকুর আবার বললেন, "তাই তো হলো, বিয়ে হচ্ছে বহন করা, তোমাকে বহন করার ভার তো আমি নিয়েই গেলাম, সুতরাং তোমার আকাঙ্ক্ষা প্রকারান্তরে পূর্ণই যে হলো।" মেয়েটি হাসি মুখে আবার ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে ঘর হতে বেরিয়ে গেল।

ছত্রিশ

ঠাকুর সহরে* আছেন। বহু লোকের সমাগম হচ্ছে। ঠাকুর তাদের সঙ্গে আলোচনায় প্রায় সময়ই ব্যস্ত থাকেন। আমরা† সাথে সাথে থেকে আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজগুলো করে যাচ্ছি। এর মাঝে একটি মহিলা চীৎকার ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, "আমার ছেলেটি মারা যাচ্ছে, তুমি বাঁচাও।" ঠাকুর বললেন, "বস, ওদের সাথে আলাপ শেষ করে নেই।" সেদিনকার সমস্ত আলাপ লিখতে পারিনি, কিছু কিছু লিখেছিলাম। ঠাকুর বিভূতি সম্পর্কে আলাপ করছিলেন। কোন বিভূতিরই তিনি দাম দিচ্ছেন না, শক্তি যে আমাদের মধ্যে আছে সে কথায়ই জোর দিচ্ছেন। ভক্তদের 'কবে হবে ঠিক নেই, হবে কিনা কে জানে'—এ সমস্ত আকুলিবিকুলি চলছিলো। তিনি ঐ সমস্ত নৈরাশ্যজনক কথাবার্ত্তা সরিয়ে দিয়ে সবাইকে এই আশ্বাস দিচ্ছিলেন, "হতে বাধ্য, হবে এবং হয়ে রয়েছে—বিকাশ তাহাই করতে হবে। বিভূতি সবার ভেতর সঞ্চিত রয়েছে, তারই প্রকাশ করতে হবে। এই সৃষ্টিতে সবাই সমান অধিকার নিয়ে জন্মেছে, কেবল ভেদাভেদে যার যার এক-একটা শক্তির বিকাশ

---

* স্বামীবাগ, ঢাকা।

† জিতেন ঘোষ, বঙ্কিম মাষ্টার, সত্যেন রায়, শ্যামবিনোদ ঘোষ, মণ্টু রায়, শচীন দাস, নবদ্বীপ নন্দ, অনুকূল পাল, মহম্মদ্ আলি, বিষ্ণুপদ বসু, বারীন ঘোষ, শান্তিদাসমজুমদার আরো অনেকে।

করে যাচ্ছে।" এসব কথা তিনি বলছিলেন এবং আমাদের লিখে রাখতে বললেন, 'সব যে এক শক্তি হতেই জন্ম'—কি ভাবে হচ্ছে তা তিনি বুঝিয়ে দিবেন। এটা তাঁকে একসময় মনে করিয়ে দিতে বললেন। তারপর সবাই চলে গেলে মহিলাটি বললেন, "হাসপাতাল থেকে ফেরৎ দিয়ে দিয়েছে, বলেছে, 'বাঁচবে না, নিয়ে যাও।'—মা'র মন তো।" ওর কান্নাকাটিতে ঠাকুর বললে, "বেশ, দেখবো।" এরপর ঠাকুর একটা গাড়ী ক'রে ওর বাড়ী* চলে গেলেন। সাথে আমরা দু'জন† আছি। ঠাকুর রোগীর ঘরে ঢুকছেন। ঠাকুরকে ঘরে ঢুকতে দেখেই রোগী‡ বকতে আরম্ভ করেছে, "এই বালক কি করবে?" ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, "Doseটা অনেক ছোট হলে কি হবে, মানুষটা বড় হলে কি হবে, তাতে কি ঔষধে ক্রিয়া হয় না? দেখা যাক্ না।" একথা বলে তিনি গিয়ে রোগীর নিকটে বসে পড়লেন। যতই সে চটে ততই তিনি হাসেন আর বলেন, "একেই বলে রোগী।" ঠাকুর সব কাজেরই একটু details বলে নিতেন, একটু explain করতেন, তার কারণ মনে হয়, যে কাজগুলো করতেন তার দাম দিতেন না। আর সব-কিছু যে সবার পক্ষে সম্ভব তাই বুঝিয়ে দিতেন, সব আটঘাটগুলো ঠিক ভৌগলিক মানচিত্রের মত বুঝিয়ে দিতেন। ঠাকুর তখনই বললেন, "দেখ, এই যে উপর দিয়ে উড়ো জাহাজ যায়, মানচিত্রে নিয়ে যাচ্ছে, দেশ তো পরে গিয়ে দেখছে, ঐ directionএ directionএ গিয়ে যার যার গন্তব্য স্থলে পৌঁছে।" আমরা দেখলাম রোগ, দুঃখ নানারকম বিভূতি সব-কিছুই মানচিত্রের মত ক'রে বুঝিয়ে দিচ্ছেন আমাদের গন্তব্য স্থলে পৌঁছবার জন্য।

---

* গোপীবাগ, ঢাকা।

† অজিত ভট্টাচার্য্য, বারীন ঘোষ।

‡ অমূল্য বসু।

রোগীকে বলছেন, "তুমি কি ভাল হতে চাও?" রোগী বললো, "আপনি আমায় কি করে ভাল করবেন? আমাকে হাসপাতাল থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে।" ঠাকুর বললেন, "রোগ ধরতে পেরেছে কিনা সে বিষয় তো দেখতে হবে। রোগ যদি ধরতে পারতো তা হলে ঠিক ঠিক সারাতে পারতো। Diagnosis ভুল হলেই ও'জাতীয় হয়, তাতে তারা যে efficient নয় তা বোঝা যায় না। অনেক সময় diagnosisএ ভুলের জন্যে অনেকে দুর্ভোগে পড়েন, আমি একটু diagnosis ক'রে দেখি কিছু করতে পারি কিনা।" রোগী কেবল বকাবকিই করছে আর তাকিয়ে আছে। ঠাকুর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখ্ রে, এই যে চতুর্দ্দিকে মানুষ মান-অভিমান, নিন্দা চর্চ্চা করে, এ হলো আর এক রোগীর বকা, সুতরাং ডাক্তার যারা, তারা চটে না; আর ওদের গালিতে মহান্‌রা গুরুত্ব দেন না, কারণ অজ্ঞানতামূলক বাণী, সুতরাং ক্ষমা সেখানেই গিয়ে দাঁড়ায়।" আবার এদিকে রোগী ও রোগীর মা'র সঙ্গে আলাপ করছেন, সবার সঙ্গেই তিনি আলাপ করছেন। রোগীকে বললেন, "দেখ, আমি যে ঔষধ দেব তা খেতে পারবে তো?" রোগী বললো, "রোগ সার্‌লে খেতে পারবো না কেন?" ঠাকুর এক গ্লাস জল চাইলেন, জল নিয়ে ওর গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, "যাও, তোমার রোগ ধুয়ে পরিষ্কার করা হলো। চারদিন পর তুমি দেখবে বেশ হাঁটতে পারছো, তখন গিয়ে না হয় আর কয়েকটি গালি দিয়ে এসো, 'কেন মশায় আমায় ভাল করলেন?'" ওরা ঠাকুরকে টাকা সাধছে, ঠাকুর বললেন, "ওকে এই টাকা দিয়ে ফলটল খাইয়ে দিয়ো, আমার আর 'ভিজিটে'র প্রয়োজন হবে না।" তিনি গাড়ীভাড়াও নিলেন না। ফেরার পথে গাড়ীতে আমরা বলছি, "গাড়ী ভাড়াটা নিলে মন্দ হতো না।" ঠাকুর বললেন, "দেখ, ঐ গাড়ীভাড়া নিলেই তাড়াতাড়ি যাওয়ার ইচ্ছে হবে, ভাড়া না নিলে নিজের গাঁটের পয়সা খরচ হলে তাড়াতাড়ি যেতে

ইচ্ছে করবে না। একটু slack দিলেই তাড়াতাড়ি যাওয়ার ইচ্ছে হবে, একটু বসার ইচ্ছে হবে, গল্প করার ইচ্ছে হবে, আস্তে আস্তে অনেক দূর পর্য্যন্ত যাওয়ার ইচ্ছে হবে, যত ছেড়ে দেওয়া যাবে ততই slack হওয়া স্বাভাবিক, এঁটে যত বাঁধবে ততই কষবে।" তখন আমরা চুপচাপ করে রইলাম।

* * *

চারদিন পরে দেখি রোগী ভদ্রলোক ভাল হয়ে অনেক ফল নিয়ে এসে উপস্থিত, গিয়ে ঠাকুরের পায়ে পড়ে কান্নাকাটি করছে, চোখের জল ফেলছে। আগের ঐ জাতীয় কথাবার্ত্তা স্মরণ ক'রে অনেক ক্ষমা চাইলো। ঠাকুর একটু রগড় করে বলছেন, "এও যে আর এক জাতীয় গালি দিচ্ছিস্।" রোগী শুনে হা ক'রে তাকিয়ে আছে, আমরাও* যে অবাক্ না হয়েছি তা নয়, 'ক্ষমা চাইছে, কান্নাকাটি করছে—এটা আবার কোন জাতীয় গালি?' ঠাকুর বললেন, "সুস্থতার গালি—অসুস্থতার সময় ছিল এক রোগ, তখনকার জন্য ওটাই প্রাপ্য, আর সুস্থতার সময় এ জাতীয় প্রাপ্য, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপের বিকাশ বা পরিচয় মাত্র—অবস্থা একই; জিহ্বা একই—বিভিন্ন বস্তুতে বিভিন্ন স্বাদের পরিচয় দেওয়া মাত্র; মুখ একটি—ক্ষণে হাসি, ক্ষণে কান্না অবস্থা-ভেদে। তাই আমি তোমার কোনটাই নিচ্ছি না—গালিও নেইনি, প্রশংসাও নেইনি। ক্ষমার কোন কথাই আসছে না, এখানে খুশী অখুশীর কথাও আসছে না।" তারপর ঠাকুর বললেন, "ফলগুলো তোমরা বসে সব খেয়ে ফেল, আমি দেখি।" প্রসাদ ক'রে দেওয়ার জন্য আমরা বললাম, তিনি ডালাখানা ছুঁয়ে দিলেন। দেরী হচ্ছে বলে ঠাকুর একটা ধমক দিলেন,

* বঙ্কিম মাষ্টার, অনুকূল পাল, প্রাণশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, মহম্মদ্ আলি, শান্তি দাস মজুমদার, বারীন ঘোষ ইত্যাদি।

"তাড়াতাড়ি আমার সামনে খা।" তখন বসে বসে খেতে আরম্ভ করলাম, রোগীও বসে গেল আমাদের সাথে, ঐ অবস্থা একটু দেখে ঠাকুর ভেতরে চলে গেলেন। রোগী তারপরদিন এসে দীক্ষা নিলো। যেদিন দীক্ষিত হয় সেদিন দীক্ষিত হওয়ার জন্য আরও অনেকে উপস্থিত। ঐ রোগী সবাইকে বলছে, "আমাকে উনি কৃপা করেছেন।"—ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক বলে গেল। ওখানে* আর একটি রোগী† ছিল, সেও সেই একটা সুযোগ পেল। এমন সময় ঠাকুর সবাইকে ডাকলেন, ঐ রোগীটিও ঠাকুরের কাছে কান্নাকাটি করে পড়লো ; সে পা জড়িয়ে ধরে বললো, "আমায় ভাল করতেই হবে।" ঠাকুর বললেন "এত কান্নাকাটি কেন?" ঠাকুর তখন সেই রোগমুক্ত লোকটিকে ডেকে বললেন, "তুই বুঝি কিছু বলেছিস্?" "হ্যাঁ, আমি বলেছি।" ঠাকুর ঐ রোগীকে বললেন, "তুই গিয়ে মাঠে বসে থাক্ ঐ ঠাটা-পড়া রৌদ্রে।" সে মাঠে বসতে গেল। এদিকে সবার দীক্ষা হয়ে গেল। তিনি বসে বসে আলাপ করছেন, "যে সমস্ত অসুস্থতা এসে জড়িয়ে ধরে এবং শরীরকে পাত করার চেষ্টা করে, আর একটি শক্তি এমন ভাবে বৰ্দ্ধিত হওয়া দরকার যে শক্তিতে ঐ সমস্ত বীজাণুগুলোকে নষ্ট করে দিতে পারে ; সেই powerটাকে যদি জাগিয়ে নেওয়া যায়, যে-কোন মুহূর্ত্তে যে-কোন অসুখকে ভাল ক'রে দেওয়া যেতে পারে ; সুস্থতা ঠিকই থাকে, মাঝে মাঝে যে উপদ্রবগুলো উপস্থিত হয়, তাদের কেবল সরিয়ে দেওয়া—লড়াই কেবল জীবাণুর সাথে, তাই জীবাণুগুলোকে ধ্বংস করতে গেলে অণুতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, যে-কোন জীবাণুকে সেই শক্তির দ্বারা যাতে সরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। জীবাণু প্রবিষ্ট হওয়ার সুযোগ যখন

---

* স্বামীবাগ, ঢাকা।

† ভূপতি নাথ গোস্বামী।

পাচ্ছে এবং ওর 'সম'তে আনার জন্য যখন লড়াই করবার সুযোগ পাচ্ছে, তখন ভাবতে হবে আর একটি শক্তি অণুতে অণুতেই বিদ্যমান রয়েছে, এখন জয়-পরাজয় পরবর্ত্তী কথা। কিন্তু শক্তি যখন রয়েছে, সেই শক্তিকেই বাড়াতে হবে। সেই শক্তি রয়েছে যাতে বাইরের কোন উপদ্রব এসে উপদ্রব না করতে পারে। এই দেহের এমনিভাবে সমস্ত জায়গায় বিরাজ করতে থাকে এই সমস্ত সূক্ষ্ম জীবাণু, এমন অজস্র অজস্র অণুপরমাণুতে জীবাণু সমস্ত রয়েছে, তাতে তাদের সমকক্ষ সমজাতীয় এমন কিছু রয়েছে যাতে—হয় খোরাকের জন্য, না হয় বন্ধুত্ব পাতাতে যায়—এই যে বন্ধুত্ব এই সমতায় সমভাবে যে তারা রেখে যাচ্ছে, সমস্ত শরীরকেই যেন আঁকড়ে আছে, অণুপরমাণু যেন এমনিভাবে একটা 'মুষ্টিমেয়' আবদ্ধতায় আছে, তাতে এটুকু বুঝা যাচ্ছে যে আমাদের শরীরের সমস্ত কিছুই অণুপরমাণু; তবে যে-কোন মুহূর্ত্তে এসব অণুপরমাণু উড়ে যাওয়ার মত অবস্থায় আসতে পারে। কারণ ক্ষয় যখন হচ্ছে, যে-কোন মনের একটু যদি ভালভাবে প্রকাশ ক'রে নেওয়া যায় বা ভালভাবে একটু নাড়াচাড়া ক'রে গুছিয়ে নেওয়া যায়, তাতে এই যে পরিবর্ত্তন, এ যে শক্তিরই বিকাশ অথবা টেনে নিয়ে যাচ্ছে অথবা তাদের সমতুল্য করে নিচ্ছে, যখন দেহের অবস্থা পরিবর্ত্তিত ক'রে নিচ্ছে। দুই মণ একজনের ওজন, তাকে তেত্রিশ সের করে ফেললো, এখন জীবাণুতেই থাক অথবা যাতেই থাক—এগুলো গেল কোথায়? যে অবস্থাতেই হউক এই যে, অপসারণ, শক্তি বিনে তো নয়—শক্তিরই প্রকাশ, যে ভাবেই হউক, যুদ্ধে পরাজিত হই আর না হই, এই যে পরিবর্ত্তন, প্রতিটি জীবের ভেতরই সেই পরিবর্ত্তিত রূপ শক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। সেই মূল শক্তিকে যদি আয়ত্তে এনে—সমস্ত অণুপরমাণু ঠিক queen-bee-জাতীয়—queen-bee যেমন এগিয়ে চলছে, মৌমাছিগুলো যেমন তার সাথে সাথী হয়ে যাচ্ছে, যেখানে সে উপবিষ্ট হচ্ছে সেখানেই যেমন একটা

মৌচাক form করছে; এই queen-bee যেমন guide করছে সবাইকে, আর অণুপরমাণুগুলো যেমন মৌমাছিগুলো, 'will-force' যদি queen-bee-জাতীয় হয়ে guide করে সমস্ত দেহের সমস্ত অণুপরমাণু ইত্যাদিকে, তবে তার সাথে সাথে সমস্ত অঙ্গাদির অণুপরমাণু ধাবমান হবে; will-force-জাতীয় যে queen-bee এবং এই will-force যেখানে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে, যে চেহারাতে গিয়ে বসবে, সে-জাতীয় figureই ধারণ করবে, সেই অঙ্গাদির যে অণুপরমাণু মৌচাকের মৌমাছির মত হয়ে এবং তা আছে বলেই সেই সৃষ্টির আদি সূক্ষ্ম হতে যেন শক্তির সঞ্চালনে এই যে দেহের পরিপুষ্ট অবস্থা, আবহাওয়ার সমস্ত অণুপরমাণু হতেই সমস্ত বিকাশ, সেই মনঃশক্তি সমস্ত শক্তির উপরে কার্য্য ক'রে ক'রে সমস্ত দেহের ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা কার্য্যকরী হয়ে যাচ্ছে প্রকারান্তরে এবং সেই মনঃ শক্তির সাথে সমস্ত অণুপরমাণুগুলো সেই ধাঁচে ধাঁচে সেই ধাপে ধাপে মিশে মিশে আজ দেহরূপ মৌচাকে যে পরিণত হচ্ছে, সেই মনঃশক্তির দ্বারাই তাহা সম্ভব হচ্ছে। আজ এই যে ক্ষয়ের অবস্থা, মনঃশক্তি সেই দুর্ব্বলতার দিকে এগিয়ে গিয়ে সেই দুর্ব্বলতাতে যে সবলতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে এবং সমস্ত দেহের পাত এইভাবেই ক'রে ক'রে ওর পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে—শক্তির বিকাশ যে দিক্ দিয়েই হউক না কেন, হয়ে যাচ্ছে। আজ যে power-house রয়েছে, কতগুলো 'মেসিন' তার দ্বারা চালিত হচ্ছে—গমের কলও চলছে, ময়লার কলও চলছে, আবার মাখনের কলও চলছে—শক্তি যে একটাই। আজ দুর্ব্বলতার দিক্ দিয়ে যা'ক, সবলতার দিক্ দিয়েই যা'ক, ক্ষয়ের দিক্ দিয়েই যা'ক, শক্তির প্রকাশ করেই যাচ্ছে। তাই এ রোগ এ জাতীয় যা-কিছু সবই শক্তির স্পর্শে সবই সম্ভবে।" তারপর রৌদ্রে যে বসে ছিল সেই রোগীর অসহ্যের মাত্রা বুঝতে পেরেই তাকে ডাকলেন ও

বললেন, "আবার গিয়ে বসতে পারবে?" রোগী চুপ ক'রে রইলো। ঠাকুর তার মাথায় একটু স্পর্শ ক'রে বললেন, "যা তোর সমস্ত জীবাণু ধ্বংস হয়ে গেল।" তখন ঠাকুর আমাদের বললেন, "এটা rayর মত কার্য্যকরী হয়।" তখনকার মত আলাপ এখানেই শেষ হলো। ঠাকুর ভেতরে চলে গেলেন।

সাঁইত্রিশ

আমরা* পাহাড়ে আছি। হিমালয় আমাদের কাছ থেকে বেশী দূর নয়। ভোর থেকে অনেক রাত পর্য্যন্ত অবিরাম জন-সমাগমের চাপ হতে কয়েকদিন দূরে রাখার জন্য আমরা ঠাকুরকে নিয়ে এসেছি। এখানেও কয়েকজন এসে তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলো। একদিন একজন ব্রহ্মচারী এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে বসতে দেওয়া হলো, উনি ঠাকুরের নিকটেই বসলেন। ঠাকুর তাঁর পরিচয় ইত্যাদি নিলেন। ব্রহ্মচারী ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন, "সংসারে থেকে কি সন্ন্যাস হয়?"

ঠাকুর বললেন, "আপনি কি সংসার-ছাড়া?"

"আমি তো সতেরো বৎসর আগে গৃহত্যাগ করেছি।"

"আপনি কোন্ গৃহে গেছেন?"

"গৃহে! না তো—আমি আশ্রমে আছি।"

"আশ্রমটা তো আর গৃহ ছাড়া নয়, এ যে পিত্রালয় থেকে শ্বশুরালয়ে যাওয়ার মত।"

"আমি যে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেছি।"

"সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন ক'রে কোন্ চেহারাতে আছেন, সেই চেহারাটা বুঝিয়ে দিন্।" তারপর ব্রহ্মচারী যোগশাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্রের কথা বললেন।

---

* শান্তি দাস মজুমদার, দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী (৩), অজিত ভট্টাচার্য্য।

ঠাকুর বললেন, "শাস্ত্রে আছে তো শুনলাম, এখন আপনি যাতে আছেন সেই বিষয় বলুন। আপনি তো সবার মতই একজন—আপনি আলো পেয়েছেন কিনা, আলো দেখেছেন কিনা, যদি তা পেতেন তবে আপনি এ জাতীয় কথাবার্ত্তা বলতেন না—এ যে নিষ্প্রভ।"

তখন ব্রহ্মচারী একটু রেগে গম্ভীরভাবে বললেন, "সন্ন্যাস কি তবে মিথ্যা? শাস্ত্রবাক্য কি ভ্রান্ত?"

"আমি তো সন্ন্যাস সত্যি কি মিথ্যে সে সব বিষয়ে আলাপ করতে যাইনি, শাস্ত্র সম্বন্ধেও কিছু বলতে যাইনি।"

"আমি কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী, কাম আমায় স্পর্শ করতে পারে না।"

"কথায় যে অনেকটা এগিয়ে গেছেন, সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। আপনার ব্যাপারটা কি রকম জানেন—দৃষ্টিশক্তি পড়ার সাথে সাথেই যেমন রূপের পরিচয় হয় না, রূপ পরে আসে, আপানারও তেমনি কথা আগে চলে যায়, ভাব আসে পরে। কথা ছাড়ুন, 'ভাব' বলুন, ভাব-স্বরূপটুকু বলুন। কালের স্রোতের মতন যে 'গৎ' ধারাবাহিক চালিয়ে এসেছে, সে 'গৎ' প্রয়োগ ক'রে যাচ্ছেন কি? প্রকৃত উন্মাদনাতেই অ-ভাব ভাবে এসে বিকশিত হবে—কি সন্ন্যাসী, কি গৃহী, কি ত্যাগী, কি ভোগী, যা-কিছু ধরা পড়বে তখনই। এই ক্ষেত্রে যদিও কথাগুলো আপনার অসামঞ্জস্যপূর্ণ লাগতে পারে, কিন্তু শুধু শোনবার জন্য বলছি, অবস্থাগুলো জেনে নেওয়ার জন্য বলছি—আমাকে বুঝিয়ে দিন্। আপনি রাগ করলেন বা আপনি আসবেন না বা আমাকে বকে চলে গেলেন, তাতে আপনার বুঝটুকু clear না ক'রে এড়িয়ে চলে গেলেন।"

"আমি নারী-মাত্রকেই মাতৃবৎ দেখি।"

"বেশ তো, মাতৃবৎ পিতৃবৎ—ছেলেমেয়ে যখন আছে, তখন এক হলো 'মাতৃজাতি' আর এক হলো 'পিতৃজাতি'।"

"আমি প্রত্যেক মেয়েকেই আমার গর্ভধারিণী মাতৃরূপে দেখি।"

"বিদ্যুৎ তো খুবই চম্‌কে যাচ্ছে, চক্ষু তো ঝল্‌সে যাওয়ার উপক্রম—তাতে কি হবে—তারপর দেখি মেঘ-গর্জ্জন, অন্য কিছু নয়। একি আপনার গর্জ্জন, না বস্তুতঃ বর্জ্জন? না এখন ভঞ্জনে আছেন, না ভজনে? কোন্ অবস্থায় আছেন আমাকে বলুন।"

এরপর ব্রহ্মচারী যেন হঠাৎ নিরুত্তর হয়ে গেলেন। তাঁকে নিরুত্তর দেখে ঠাকুর আবার বলতে লাগলেন, "দেখুন, আপনি যে কামবর্জ্জিত অবস্থায় আছেন, তাতে কিন্তু আপনার গৌরব মোটেই দিচ্ছি না, সে যে একটা দুঃখেরই ব্যাপার, কারণ যার নেই তার ত্যাগ কি করে হয়?—থাকলেই তো ত্যাগ, 'আছের'ই তো ত্যাগ। আপনার যে নেই বললেন, তাতে কি ক'রে বুঝলেন যে ত্যাগ?"

তখন ব্রহ্মচারী বললেন, "থাকবে না কেন, আছে। আস্তে আস্তে সাধানর দ্বারা ত্যাগ করেছি।"

ঠাকুর বললেন, "দেখুন—ত্যাগ হওয়ার এটা কি? অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদিতে সচেতন আছেন কি? না, তাদের কোনটাকে বর্জ্জন করেছেন আর কেনই-বা বর্জ্জন করলেন? তারা যদি আপনার কোন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি ক'রে না থাকে, কাম-ইন্দ্রিয় বুঝি আপনার চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলো? সব ইন্দ্রিয়ের স্বাদেই কাম-ইন্দ্রিয়ের যে প্রকাশ—যার যার ইন্দ্রিয়ের স্বাদকে গ্রহণ ক'রে সেই ইন্দ্রিয়েরই ক্ষুধা নিবৃত্তি করছে; প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই লিঙ্গবৎ, একথাটি আপনি ভুলে যাবেন না। ঐ সমস্ত লিঙ্গের বেলায় আপনি সহজ ক'রে বসে আছেন, আর একটিকে নিয়ে ত্যাজ্যে ফেলেছেন। ভোটে বুঝি সেটাই জিতে গেল? রাজত্বটা চমৎকার! আর ভোটদাতারা বিশেষ কি হবে? সচেতন যখন সর্ব্বত্র, ত্যাগের বেলায় ওটা কেন? ত্যাগ কি ত্যাগেতে? সচেতন কি ক'রে অচেতনের পরিচয় দিল?—একি সম্ভব? যা ছাড়ার

নয়, ছাড়তে পারে না, ছেড়ে যাওয়া যায় না, তা কি ক'রে ছাড়া যায়? কথোপকথনে 'বর্জ্জন' বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে, আমিও না হয় ভদ্রতার খাতিরে আপনাকে স্থান দিয়ে গেলাম ; যুক্তি তো ভদ্রতাও মানবে না, সামাজিকতাও মানবে না, সে সব ফাঁস ক'রে দেবে। ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব হতে পারে, কিন্তু যুক্তিতে তো কাটাছেঁড়া ক'রে ফেলবে। Operationএর যন্ত্র সবার উপর প্রযোজ্য, যদি septicএ আক্রমণ ক'রে ফেলে,—কিন্তু আপনার কথায় আপনিই যে septicযুক্ত, আপনিই বলে যাচ্ছেন যে আপনার septic হয়েছে। ব্যাপার হলো কি জানেন—পিক্ বেশী হয়ে গেলে ব্যথা-বোধ থাকে না, বেশী দিন স্থায়ী হলে আরো ভেতরে যাওয়ার উপক্রম হতে থাকে ; তাই আপনার কথাই আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছে 'সাধু, হও সাবধান।'"

ব্রহ্মচারী বেশ একটু চটে গেছেন। তারপর ঠাকুর আরো কয়েকটি 'ডোজ' দিলেন। আমরা দেখছি ব্রহ্মচারী আগের মত অতো তাড়াতাড়ি আর ঘাড় নাড়ছেন না। তাই ঠাকুর বললেন, "সব সাধনাই এক জায়গায় নড়চড় হয়ে যায়—যেখানে 'চমৎকার' সেখানেই চম্‌কে। আর আপনি যখন এত বড় ব্রহ্মচারী হয়েছেন,—নিয়ম আছে তো জানেন—বহু ঘাত-প্রতিঘাত না খেলে ব্রহ্মে কি আর পৌছান যায়? আমি সে-সম্পর্কেই নাড়াচাড়া দিচ্ছিলাম,—কত হাজার নারীর সংশ্রব? কারণ সতেরো বছর যাবৎ গৃহত্যাগ, নারীর experience না হলে যে সংশোধনই হয় না। নারী যখন ব্রহ্মচারিণী হবেন, তাঁরও ঘাত-প্রতিঘাতে আসতে হবে। যাক্ আপনার experience-সম্পর্কে আমি একটু জানতে উৎসুক।" তখন ব্রহ্মচারী তাঁর বাল্যবয়স হতে 'কলেজ-লাইফ' পর্য্যন্ত প্রেমের ব্যাপারে যে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন—তাঁর সত্যের সাড়া-ই তাঁকে 'টার্ন' করে নিয়ে এসেছে, একথা ঠাকুরকে জানালেন। ঠাকুর তখন বললেন, "আপনাকে একথাগুলো

বাজাবার জন্যে বলেছি।" ঠাকুরের একটা ব্যাপার আমরা লক্ষ্য ক'রে এসেছি, তিনি যখন কাউকে পরীক্ষামূলকভাবে কোন মাত্রায় কোন কথা বলেন, তারপরই সেটা খুলে বলে দেন, 'আমি আপনাকে বাজাবার জন্য বলেছিলাম, নিজে বুঝবার জন্য।' ঠাকুর এরূপ ক্ষেত্রে সব সময় 'নিজে বুঝবার জন্য, নিজে জানবার জন্য' এই ভাবে কথা বলেন। তিনি সহজভাবে মিশে মিশে ধীরে ধীরে ওদের সব জেনে নেন, এটা আগাগোড়াই আমরা দেখেছি। আমাদের বুঝার খুব ঝোঁক ছিল কিনা, তাই সেই সবগুলো কাপড় ক'যে বোঝাতে আরম্ভ করতেন, আর এমনি কলের কল, যে একবার পা ফেললেই আট্‌কে যায়, আর ব্যথার জ্বালায় 'ছাড়্ ছাড়্' করে। তারপর যখন 'Sir, Sir' বলে, তখন ঠাকুর বলেন, "এতক্ষণে........ এসেছে কিছু, ওকে বসাও ওখানে।" ঠাকুর কখন কোন চিন্তায় থাকেন ধরা ভারী দায়। আমরা সব সময় সঙ্গত ক'রে 'বহুরূপে'র খালি রূপই দেখছি, কত আর বর্ণনা করবো। যাক ব্রহ্মচারী যেন আটক্ই পড়ে গেলেন, মনে হয় যেন তাঁর গলদ ধরতে পারছেন। ঠাকুর বললেন, "সন্ন্যাস-টন্ন্যাস ওসব কিছু নয়—জন্মই সন্ন্যাস, ত্যাগ—শ্মশান। এ পর্য্যন্তই খেলোয়াড়ের খেলা, এর মধ্যেই যে যার মার প্যাঁচ দিয়ে বড় বলে বাহাদুরি নিয়ে যেতে পারে, সেই হলো ওস্তাদ। আপনার সব ইন্দ্রিয় ঠিক, আর এক ইন্দ্রিয়েতে বুঝি মারামারি? কৈ, নাকে তো সিমেণ্ট দিচ্ছেন না, চোখে তো plaster লাগাচ্ছেন না, কর্ণে তো সীসা ঢেলে দিচ্ছেন না,—ওঃ! এসব যে লিঙ্গশ্রেণীভুক্ত, সে-বোধে এততেও আসেননি আপনি।"

ব্রহ্মচারী আস্তে আস্তে তাঁর সকল ভুল স্বীকার করলেন এবং বললেন, "আমার কামের ইচ্ছা তো আছেই, আমার সব-কিছুই আছে।"

ঠাকুর বললেন, "আপনি ফেসাদে পড়ে 'বাবাজী' হয়ে আছেন, আপনি তো কোন মেয়ের দিকে চাইতে পারছেন না, ইচ্ছা সত্ত্বেও

দেখতে পারছেন না, যদি কেউ পাছে দেখে ফেলে। সব সময়ই তো আপনার ভয়, 'ছুটে গেল নাকি।' এখন একটাকে রাখতে গেলে আর একটা থাকে না—এই ভয়েতেই আপনি তো তটস্থ।" ব্রহ্মচারী বললেন, "হ্যাঁ।" তারপর ঠাকুর আবার বলতে লাগলেন, "এমন সুন্দর চেহারাখানিকে এমন করেছেন কেন? সন্ন্যাসীর বেশটা—universe থেকে কি ছাপ মেরে পাঠিয়ে দিয়েছে যে সন্ন্যাসী এরকম হবে? তার তো তবে ন্যাড়া হয়েই জন্ম হওয়া উচিত ছিল—কেশযুক্ত হওয়ার কি মানে? সুতরাং ঐ সমস্ত বাদ দিয়ে ঘরে গিয়ে মায়ের মনে শান্তি দিন্ আর ঘর-সংসার করুন। আর দরকার নেই, একদিন রাগ করে চলে যান তবেই হবে, তারপর ঘরে গিয়ে বসুন।" ব্রহ্মচারী বললেন, "হ্যাঁ, আমি আপনার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছি, তা করবো।" তারপর বছর দুই পরে একদিন ব্রহ্মচারী সস্ত্রীক এসে উপস্থিত হলেন। ঠাকুর তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "আছ কেমন?" ব্রহ্মচারী বললেন, "অনেক ভাল আছি।"

আটত্রিশ

ঠাকুর গ্রামে* আছেন। সাথে অনেক ভক্তও† রয়েছে, লোকের ভিড় তো লেগেই আছে। খুব গরম, রৌদ্রের তাপে সব জ্বলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। কেহই শস্য বপন করতে পারছে না, এক ফোঁটা বৃষ্টিও নেই। চারদিকে কৃষকদের হাহাকার পড়ে গেছে। বারো-চৌদ্দজন হিন্দু-মুসলমান‡ গ্রাম থেকে এসে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হলো। ঠাকুরের কাছে এসে তারা কান্নাকাটি করছে, বৃষ্টি না হলে তারা বাঁচবে না। ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, "বৃষ্টি তোমাদের কবে দরকার?" তারা বলছে, "সে তো আজ হলেই ভাল হয়।" ঠাকুর বললেন, "যা তোদের বাড়ী যেতে যেতেই দেখবি বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে।" বহুলোক বসে আছে, সবাই একথা শুনে বেশ আশ্বস্ত বোধ করছে, আবার সবাই ভাবছে, 'এত রৌদ্র, এত উত্তাপ, এত সূর্য্যের তেজ, মেঘের লেশমাত্র নেই, অথচ বৃষ্টি কি করে সম্ভব?' প্রত্যেকেরই একটা ঔৎসুক্য হলো এবং একথা ক্রমে ক্রমে

---

* কৃষ্ণনগর, ত্রিপুরা।

† ধীরেন্দ্র সাহা, নরেন্দ্র সাহা, জিন্নৎ আলী, শ্যামবিনোদ ঘোষ, নিরোদ সাহা, মহেন্দ্র শ্যাম, সতীশ সরকার, আশু সেন, নগেন্দ্র দে, অনুকূল পাল, বিনয় সোম, বিজয় সোম, নরেশ ঘোষ, অজিত ভট্টাচার্য্য ইত্যাদি।

‡ হজি মিঞা, নান্না মিঞা, বদিয়র রহমান, তাছদ্দেক্ হোসেন, ফাজিল মিঞা, রেবতী কর্ম্মকার, জগদীশ নম, সুরেন্দ্র নম, সুরেন্দ্র দে, মহিম ভূঁইমালি, হৃদয় ভূঁইমালি ইত্যাদি।

চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশ অন্ধকার ক'রে ফেললো, এমন জোর বৃষ্টি হতে আরম্ভ করলো যে তিন দিন পর্য্যন্ত একই ভাবে চললো। বৃষ্টি মাথায় ক'রেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে বহুলোক ঠাকুরের নিকট এসে উপস্থিত হলো, নানারকম ভোগ দিয়ে কীর্ত্তনাদি করতে লাগলো। ঠাকুর বললেন, "ঝড়ে বক মরে ফকিরের কেরামতি বাড়ে। বৃষ্টি যে এমনি হতো না তার কি প্রমান আছে? আমি বুঝতে পেরেই তো তোদের বলেছি আজই বৃষ্টি হবে। তবু সবাই তো আমারই বাহাদুরি দিচ্ছিস।" সকলে বললো, "বৃষ্টি এতদিন হয়নি, যখন তুমি বলেছ যে তোরা বাড়ী যেতে যেতেই বৃষ্টি দেখবি, তখনই বৃষ্টি হলো, কাজেই এটা তুমি না করালে হতে পারে না।" ঠাকুর প্রায় বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন যে বৃষ্টি এমনিই হতো, কিন্তু আমরা তা ছাড়বো কেন? এ জাতীয় অসংখ্য বিভূতি বহুরকম ভাবে দেখেছি। ঠাকুর বললেন, "বৃষ্টি হওয়ানো বা ঝড় থামানো যে-কোন ব্যক্তির পক্ষে মোটেই কিছু নয়। আবহাওয়ার এমন একটা অবস্থা দাঁড়ায়,--হয় বৃষ্টি, না হয় ঝড়, না হয় উত্তাপ—আবহাওয়ার অবস্থাতেই তা সম্ভব। পৃথিবীর আকার কিংবা এ বাহ্যজগতের আকার বৃহৎ হলে কি হবে, তুমি এবং তোমাতে যে স্থিত রয়েছে, এই আয়তনের দিক্ দিয়ে এবং বিচারের দিক্ দিয়ে একই অবস্থা তোমাতে এবং ওতে রয়েছে,—যেমন coins আর একটা cheque—value একই; এই বিশ্বপ্রকৃতির এই বিরাট মূল্য এবং তুমি—একই পদার্থ, একই মূল্য। তোমারও সেই মাত্রা এবং আবহাওয়াকে সেই মাত্রাতে নিয়ে—যেই মাত্রাতে নিলে হয় বৃষ্টি হবে, না হয় ঝড় হবে, না হয় উত্তপ্ত হবে, ঐ tempoকে আয়ত্তে আনাই হচ্ছে 'সাধনা' এবং তোমার সেই সাধনাই আবহাওয়ার উপর গিয়ে পড়বে; যেই মাত্রাটা down হয়ে আছে, প্রকোপ যেটা চলেছে,—যেমন উত্তপ্ত হয়েছিলো, এখন বৃষ্টি হওয়ার জন্য যে tempo দরকার, তার সমতা রক্ষা করার জন্য will-forceটা

তার উপর প্রয়োগ হবে, তখনই উত্তপ্ত অবস্থা ঝড়ের অবস্থা গিয়ে দাঁড়াবে, আবহাওয়া হতে তখনই ঝড় হয়ে আসবে, তার পরিচয় দিচ্ছে যেমন 'উদ্ভিদ্'। আগে ছিল হোম, যাগ, যজ্ঞ,—হোমে যে-সব আনুষঙ্গিকের দ্বারা বৃষ্টির জন্য যজ্ঞ করা হতো, তার উপর অনেকটা কার্য্যকরী হতো, যেই gasএর সৃষ্টি হতো, সেই gas গিয়ে আবহাওয়ার সাথে মিশে ঐ আবহাওয়ার সাথে আবহাওয়ার tempoতে বৃষ্টি হওয়ার মত tempo ক'রে পথ করে নিতো, তারপরই বৃষ্টি হতো। চিন্তাশক্তির প্রভাবের দ্বারা যে অনুষ্ঠানের দ্বারা এই সমস্ত আবহাওয়ার মধ্যে যে আধিপত্য কিংবা আয়ত্তে আনার চেষ্টা করছে, এই একজাতীয় সাধনাতেই হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ যে মন হতে এ সমস্ত করছে, সে-মন স্বয়ং যদি নিজের ভেতর নিজেই কার্য্যকরী ক'রে কি gas, কি power, সেই জাতীয় gas-রূপে ছেড়ে দিলে—আবহাওয়াতে মিশে যার যার জন্য ছাড়া হলো, তাকে তাকে তখন রূপে পরিণত করতে সমর্থ হয়। সুতরাং তুমি-যে সে-শক্তিতে বিদ্যমান রয়েছ, তাই তুমি যদি নিজেকে নিজে চিন্তা কর, তবেই বুঝতে পারবে; কারণ তোমার অবস্থায় ও তোমার ভেতর যে উত্তাপ রয়েছে, তোমার ভেতর ঝরণার মত ঘর্ম্ম বেরিয়ে যাচ্ছে এবং শীত বোধ আছে, তোমার আবহাওয়ার কার্য্যকারিতা তোমার ভেতর যে চলছে, তোমার ভেতর আর একটি অবস্থার সৃষ্টি করছে তোমার শারীরিক আবহাওয়ার তারতম্যের ভেতর দিয়ে; যখন instinct আছে, সময়ে বাড়ছে ও কমছে, তাকে অনেক বাড়ানো যায় এবং কমানো যায়, শুধু শক্তি-সাপেক্ষ। এখন একটা 'অশান্তি' কিংবা 'দুঃখপূর্ণ' মনের মধ্যে এসে চাপ দিলো, তখন একদিনে কৃষ্ণ কেশকে শুভ্র কেশে পরিণত করে, যুবাকে বৃদ্ধে পরিণত করে, সেই শোক কিংবা দুঃখ কিংবা আঘাতে যে জিনিষটা আমার উপরে এসে প্রতিফলিত হলো, 'আমি আবহাওয়ার' ভেতরে ঐ মন্ত্রমূলক বা will-force-জাতীয়তার

কার্য্যকরী করছে এই 'আমি আবহাওয়াতে' যার tempoটা আশী বছরের অবস্থাটা এক ঘণ্টায়ই পরিণত ক'রে ফেলে ; ঐ প্রত্যেকটি অবস্থাই কি শোক, কি দুঃখ, সেই অবস্থাতে এনে আমার উপর কার্য্যকরী হল, হয় gas-রূপে, এটাও a kind of gas, আবহাওয়া-রূপ যে figureটি আমার will-forceটা ঠিক কার্য্যকরী ক'রে যাচ্ছে এক জাতীয় gas-রূপে, এটাকে শোক বল, দুঃখ বল, প্রেম বল অথবা অন্য কোন নামাকরণ দিয়েও যদি বুঝিয়ে দেওয়া যায় তাতে আপত্তির কিছু নেই। Nothingএর মধ্যে থাক আর somethingএর মধ্যে থাক, প্রশ্ন হলো আবহাওয়াতে গিয়ে effective হচ্ছে। তাই এক মাস পরে যে বৃষ্টি হতো তা এক ঘণ্টা পরে গিয়ে হচ্ছে, ঠিক যুবাকে বৃদ্ধ করার মত, কৃষ্ণ কেশকে শুভ্র কেশ করা, দু'মণ ওজনের দেহটা আট-দশ সের সাত দিনে কমে যাওয়া—এই যে action ও reaction এভাবেই চলছে শক্তির আদান-প্রদান, শক্তির বিকাশ সেখানেই, তবে আয়ত্তাধীনে সব-কিছুকে আনতে হবে, সফলতা সেখানেই। তোমাতে যে শক্তি বিদ্যমান আছে, তা আর কিছু প্রমাণ বা উপমা ছাড়া তোমাতে যা রয়েছে তদ্দ্বারাই বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যেমন তোমার marbleএর মত দুটো চক্ষু রয়েছে, এই চক্ষু দিয়ে তুমি কত বড় জগৎকে—যতদূর তুমি চাও, কোটি কোটি মাইল দূরে যে তারকা, তাকে তুমি দেখতে সমর্থ হও। এই ছোট্ট দুই ছিদ্র যে কর্ণ, তার ভেতর দিয়ে বহু দূরের শব্দকে শোনবার মত অবস্থা তোমার রয়েছে ; নাসিকার দ্বারা ঠিক একই অবস্থা, জিহ্বাতে বা ত্বকেতে এই একই অবস্থা ; তাতে কি উপলব্ধি করতে পারছো ? —একটা জিনিষ বুঝে নিতে পারছো, এক-একটা ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয় এই বিশ্বজগতের সব-কিছু হাবভাবকে ওর সাথে সম্পর্কিত ক'রে রাখছে, ঠিক যেমন সঙ্গমবৎ অবস্থা। তোমরা তো জান যে সঙ্গমটা সাধারণতঃ এক জাতীয়েতে সম-অবস্থায় প্রকৃতি-পুরুষের মিলনে হয়ে

থাকে। তোমার মনের সঙ্গমের জন্য আর একটি যে চাচ্ছ, সেও তোমাকে চাচ্ছে, এই উভয়ের যে যোগাযোগ-সূত্রে গাঁথা, উভয় উভয়ের নিকট যেমন একই মূলে বাঁধা, উভয়ে উভয়ের একই মূল্য বহন করছে। তোমার নেত্র হতে যে দৃষ্টি নির্গত হচ্ছে কোন সন্ধানে এবং ধাবমান হয়ে যাচ্ছে সঙ্গম করার উদ্দেশ্যে, সেই নেত্র, সেই দৃষ্টিশক্তি—power of sight, সে তার নিজের sexual hunger মিটিয়ে যাচ্ছে, meet up করছে by atmospheric movements; কারণ তুমি একটা wallএর দিকে চাইলে তো তোমার sexএর উদ্ভব হয় না, কিন্তু চক্ষু সে যখন দেখতে পাচ্ছে তখনই সে তার ক্ষুধা নিবৃত্তি করছে, দেখার মত অবস্থায়ই সে যে সুযোগ পাচ্ছে, আবহাওয়া যে সুযোগ দিচ্ছে; আবহাওয়া সে-সমতা রেখে নিজেও সে-তৃপ্ততার মধ্যে তৃপ্তি নিয়ে তার ক্ষুধা মিটিয়ে যাচ্ছে। এই জাতীয় hunger প্রত্যেকের কি শ্রবণ, কি ঘ্রাণ, কি স্বাদ, এই আবহাওয়ার উপর যে তৃপ্ততামূলক কার্য্য করে যাচ্ছে, আবহাওয়া তাহা full speedএ return দিয়ে তার সাড়া দিয়ে যাচ্ছে এবং সে self satisfactory সাড়া নিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থাতে প্রত্যেকটি উভয় উভয়ের সঙ্গে সঙ্গমবৎ কার্য্য করে যাচ্ছে এবং সৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে—কি? কি?—শ্রবণকে সৃষ্টি করছে, ঘ্রাণকে সৃষ্টি করছে, sightকে সৃষ্টি করছে। প্রত্যেকে যার যার কার্য্য ক'রে প্রয়োজনে নিজেরা তৃপ্তি পেয়ে যাচ্ছে, যার যার তৃপ্ততা হয়ে যাচ্ছে। সমতা আছে বলেই উভয়ের উভয়ের সঙ্গম হচ্ছে, নামাকরণ এখন এই এক জাতীয় প্রকৃতি-পুরুষের মিলিত অবস্থা। তবে কে পুরুষ কে প্রকৃতি বলা যায় না, তাই প্রত্যেকেই পুরুষ, প্রত্যেকেই প্রকৃতি। সুতরাং তুমি, তোমাতে যে সব-কিছু বিদ্যমান তোমার অবস্থাতে বা তোমার ব্যক্তিগত অবস্থাতে, তুমি যে বিরাট আবহাওয়ার আর একটি আবহাওয়াতে রয়েছো, তাই তুমি যদি তোমাতে গভীর চিন্তায়

মনোনিবেশ কর, তবেই তুমি তোমার সাড়া পেয়ে যেতে পারবে। সুতরাং তোমার মনের কর্ম্মক্ষমতা বা একাগ্রতা শক্তি যার উপর প্রতিফলিত করবে, কার্য্যকরী করবে যেই মনোনিবেশ ক'রে—সফলতা সেখানেই গিয়ে দাঁড়াবে। এখন রাস্তা দিয়ে গেলে—ইচ্ছামত নারী পুরুষ উভয়ে চললে, যার যার ক্ষণিকের খোরাক নিয়ে গেলে, কি তা হতে হয়—তাতে নিজেকে নিজে চঞ্চল করা হয়; সেই জন্যই ছিল বিবাহ কিংবা বহন-প্রথা মনকে এক জায়গায় নিবিষ্ট করার জন্য। তাই তুমি আর এক জনকে যে আনবে, তাকে সেই জাতীয় অবস্থায় না আনলে সৃষ্টি হবে কি ক'রে? শিশুর উদ্ভব কি ভাবে হবে? তাই তোমরা আজ যে হা-হুতাশ করছো ঠিক ক্ষণিকের টোকান কাম-উন্মাদনার রেশ, তাতে তো আর শিশুর উদ্ভব হতে পারে না, ব্রণের উদ্ভব হতে পারে; তাই আজ সেই ফোড়াফাড়ি জাতীয় কথা বলছো, রূপের পার্থক্য শুধু ভ্রূণে আর ব্রণে, আর মাঝের গোল শুধু ভ্রমে, রূপ সে যে সর্ব্বক্ষণে, কিবা ভ্রূণে, কিবা ব্রণে, কিবা ভ্রমে—সৃষ্টির মাধুর্য্য যে সেখানে। ব্রণ টিপে দিলে একটু শাঁস বের হয়, একে concentrate করলে তোমার মত আর একটি রূপ বের হয়, যদি মনকে এক জাতীয়তে নিবিষ্ট ক'রে বহনে আনতে পার, তার নাম বিয়ে। তাই যে-কোন অবস্থা হতে যে-কোন জিনিষের উপর মনকে স্থাপন করলে বহনের ভার নিতে হবে তো। যাহা আছে তাহাই বাড়াবে, বাড়বার জিনিষগুলো যখন রয়েছে, যোগ-সূত্র যোগে গিয়ে সেথায় দাঁড়িয়েছ—সাধন সেখানে গিয়েই প্রতীক্ষা করছে প্রত্যক্ষতাতে ধ্যেয় বস্তুতে যাহা ধারণাতে আছে।" হঠাৎ কথা থেমে গেল, কারণ দুটো রোগী এর মধ্যে এসে হাজির হয়েছিলো, ঠাকুর ওদের ব্যাপারে মনোনিবেশ করলেন। সবাইকে বললেন, "তোমাদের আবার পরে বলবো।"

———

ঊনচল্লিশ

শিব-চতুর্দশীর কয়েকদিন পর ঠাকুরকে নিয়ে আমরা* কয়েক জন এক জায়গায়[†] হেঁটে যাচ্ছি। যেতে যেতে হঠাৎ রাস্তার পাশে শ্মশানে এক সাধককে দেখে ঠাকুর একটু থামলেন। তারপর হাঁটতে হাঁটতে তিনি সেই সাধকের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ঠাকুর ওর সাথে আলাপ ক'রে জানলেন যে তিনি 'তান্ত্রিক'। সেখানে দেখলাম কতকগুলো মরার খুলি, কতকগুলো বোতল এবং আরো আনুষঙ্গিক কতকগুলো জিনিষ ছড়ানো অবস্থায় রয়েছে। ঠাকুরকে দেখে সাধক বললেন, "বৈঠ বেটা।" ঠাকুর ওখানে বসলেন। সাধক ঠাকুরের পরিচয়বার্ত্তা জিজ্ঞেস করলেন। ঠাকুর তাঁর পরিচয়-বার্ত্তা দিলেন। ঠাকুরকে দেখে তিনি খুব ভবিষ্যদ্-বাণী করছেন, "তুমি বড় হবে, তুমি ভাগ্যবান্" ইত্যাদি—নানা রকম কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন। আর মাঝে মাঝে সেই সাধক চিমটা দিয়ে মাটিতে বাড়ি দিচ্ছেন ও আওয়াজ করছেন, করঙ্ক থেকে জল নিয়ে আমাদের সবার গায়ে ছিটাচ্ছেন আর গালবাদ্য করছেন, আর মাঝে মাঝে উচ্চ স্বরে এক-একটা চীৎকার করে উঠছেন। ঠাকুর বসে বসে দেখছেন। ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে কতদিন যাবৎ আছেন?" সাধক বললেন, "শ্মশানে শ্মশানে

---

* অজিত ভট্টাচার্য্য, অনঙ্গ ভট্টাচার্য্য, দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী(৩), আশু সেন, শান্তি দাস মজুমদার।

[†] সীতাকুণ্ড, চন্দ্রনাথ।

থাকি, যে শ্মশানে যে কয়দিন দরকার সেভাবেই কাটিয়ে যাচ্ছি। মহাশ্মশানে যখন যাই সেখানে কিছুদিন বেশী থাকি।" ঠাকুর বললেন, "আপনার এ সমস্ত অনুষ্ঠানের উপকারিতা-সম্পর্কে জানতে পারি কি?" সাধক বললেন, "বাবা, বহুদূর—বহু বাকী, বহু কষ্ট সাধন।" ঠাকুর বললেন, "কষ্ট সাধনটা কি?" সাধক বললেন, "ভয়, ভীতি, ঘৃণা, লজ্জা, সব ত্যাগ করতে হবে, শবের উপর ধ্যান করতে হবে, শ্মশানের ভস্ম মাখতে হবে, মরার খুলিতে খেতে হবে, 'সিদ্ধি' এবং 'কারণে' ভরপুর হয়ে থাকতে হবে। সেই 'ভরপুর' নেশার জন্য নয়, সেই মঙ্গলময়ীর চিন্তাতে ডুবে থাকতে হবে, আর নগ্ন-অবস্থায় থাকতে হবে।" এসব কথা তিনি ঠাকুরকে বললেন। ঠাকুর বললেন, "আপনি যে সাধনা করছেন, যে মন স্থির করার জন্য এত ব্যস্ততা, এত অনুষ্ঠান, এই সমস্ত জিনিষগুলোতে যদি মাতোয়ারা হয়ে থাকতে হয়, আর সংগ্রহের একটু ত্রুটি হলেই যদি আবার বিক্ষিপ্ততায় গিয়ে দাঁড়ায়, তবে তো ভারি মুস্কিল! শব না পেলে যদি ধ্যান না হয়, খুলি না পেলে যদি খাওয়া না হয়, চিমটা না পেলে যদি আর একটি অঙ্গের ত্রুটি হয়, এই ভাবে এই ভাবে ত্রুটিতে ত্রুটিতে ত্রুটির মাঝেই যে রয়ে যাওয়া হচ্ছে। আর আসার সাথে সাথে আপনি যে সমস্ত কথা আমায় বললেন, 'তোমার মঙ্গল হবে, ভাগ্যবান্ তুমি', এটাই-বা সাধনার কোন অঙ্গ? কেনই বা আমাকে একথা বললেন? আপনি যদি বাস্তবিকই মঙ্গলময়ের চিন্তাতে ডুবে থাকার মনস্থ ক'রে থাকেন বা ডুবেই থেকে থাকেন, এই ভাষণে কি সেই পরিচয় দিচ্ছে যে আপনি ডুবে আছেন? না ভাণের ভাণ করছেন? আমি যদি একথাটা বলি, আপনি কি ব'লে আমায় বুঝিয়ে দিতে পারেন। আপনার অনুষ্ঠানগুলোর মত এ বাণীও একটি অনুষ্ঠান-জাতীয়তার মধ্যে দাঁড়িয়েছে। বলুন আপনার কি বক্তব্য আছে।" সাধক

বলে উঠলেন, "আমি ভাণ করছি? মঙ্গলময়ী! আমার উপর এই দোষারোপ?" এই বলে সাধক চীৎকার করছেন, "তোর সন্তানকে এই অপমান?" ঠাকুর বললেন, "অনুষ্ঠানেতে এই সমস্ত উক্তিগুলোও যে দাঁড়িয়েছে। আপনার এ কথাবার্ত্তাগুলো অনুষ্ঠান ছাড়া যে নয়, আর মানের গোড়ায় গিয়ে বুঝি টান পড়েছে—তাই সুরগুলো বেসুরে গিয়ে বেসুরের সুরে বেরিয়ে পড়ছে। এ যে প্রকারান্তরে আপনাকেই আপনি ফাঁস করলেন। মঙ্গলময়ীর কি দোষ? আবার মঙ্গলময়ীকে টেনে এনে আপনার মত 'তাঁকে' কেন পরিচয় দিচ্ছেন? এটা কি অনুষ্ঠানের ভেতর আর একটি বাণী-বিশেষ নাকি? আর এই সমস্ত কি মঙ্গলময়ীর মঙ্গলাচরণের বস্তু-বিশেষ নাকি? আর এই সমস্ত বস্তু দিয়ে যদি মঙ্গলময়ীর পরিচয় হয়ে থাকে, তবে বস্তুর অস্তিত্ব যে কি, সে বিষয়ে গিয়ে যে nilএর মত দাঁড়াচ্ছে। খুলির পরে আর ধূলি ছাড়া কি হবে? আগে চর্ম্ম, মাংস, মেদ, মজ্জা নিয়ে যে দেহ, শেষ সার যখন হয় অস্থি, এ দিয়ে যাত্রা করলে ভস্ম ছাড়া আর কি পাওয়া যাবে বলুন, আপনি উত্তর দিন্।" সাধক বললেন, "হ্যাঁ, তুমি বড় নাস্তিকের মত কথা বলছো, এ সমস্ত তর্কের বস্তু নয়, এ সমস্ত অন্তরের জিনিষ।" ঠাকুর বললেন, "অন্তরের জিনিষ যদি বস্তুতঃ হয়েই থাকে, তবে স্থূল জিনিষ নিয়ে মারামারি করছেন কেন? আমরা তো আর অন্তরকে দেখতে যাচ্ছি না, তবে অন্তরের সাড়াটুকুনু যা দেখছি, সেই সাড়ারই গীত গাইছি—গীতের বস্তু যদি হয় অসারের, আমি কি আলাপ করবো সারের? একটা ভাঙ্গা ঢোলের আওয়াজ—টন্‌টনের আশা কি করে করেন? ঢেপ্‌ঢেপের আওয়াজই যে হবে।" তখন সাধক বললেন, "আমার আসনে চল।" তাঁর আসনের দিকে নিয়ে গেলেন। সেখানে একটু খুঁড়ে তিনি দেখালেন কয়েকটি মরার খুলি, সেখানে তাঁর আসন পাতা রয়েছে। তিনি একটা বোতল

থেকে 'কারণ' ঢাললেন, তারপর তিনি 'মা, মা' বলে পান করলেন এবং চক্ষু মুদ্রিত করলেন আর বললেন, "এ অপমান এখনও সহ্য করছিস্, মা ? তোর অভাগা সন্তানের কোন দাম নেই ?" ঠাকুর বললেন, "এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন ? এর আগেই আপনি বলেছেন যে মান, অপমান, লজ্জা, ভয়, ভীতি, ঘৃণা ত্যাগ করতে হয়, কঠিন সাধন—একটু গালিতেই যেন আঘাত লেগেছে, এটা কোন্ স্তরে গিয়ে পড়ে ? আরতো অনেক বাকী রয়েছে, অল্পেতেই এই পরিচয় ?" এর মধ্যে সাধক, কতকগুলো পঁচা গলা কি যেন ছিলো, সেগুলো খেতে আরম্ভ করলেন। ঠাকুর বললেন, "এটা কি বীরত্বের প্রকাশ ? না সাধনারই কোন অঙ্গ-বিশেষ ? না মহাপ্রসাদ ?" সাধক বললেন, "এরকম করতে পারবে ?" ঠাকুর বললেন, "আমি না পারলেও আমাদের বাড়ীর পালিত কুকুরটি পারে, সে তো দেখছি তা হলে 'মহাতান্ত্রিক'। আপনি আর কি পারেন ? সে নর্দ্দমা-নালার পচা গলা সব উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদের তুল্যে গ্রহণ করে, আর সঙ্গম করতেও সমস্ত কুক্কুরীকেই সে তার নিজের স্ত্রী বানিয়ে নিয়েছে—কি মা, কি বোন, আর তো কথাই নেই, সদরে তার দ্বার খোলা। সে সব ত্যাগ করেছে, 'তাঁর' কৃপা পেয়েছে কিনা এখন পর্য্যন্ত টের পাইনি, তবে আমার দ্বার-রক্ষক হিসাবে আছে। আর মাঝে মাঝে যখন আমি বিশ্রাম করি তখন পায়ের কাছে এসে 'আলাঢুলা' করে—পেলে তো করতো না আমায়। যদি সেই সাড়া পেতো তবে দু' একটি উপদেশই দিতো, আর সবাই গিয়ে তার কাছে নত হয়ে পড়তো। তবে রাত্রিবেলায় ভয়ে তার কাছে কেউ এগোয় না, রূপটি জানে কি না, তাই। আপনি যে এ সমস্ত মহাপ্রসাদ গ্রহণ করছেন, আমরা এগিয়ে আসতে পারছি না অভ্যস্ত নয় ব'লে, তবে এক জাতীয় অভ্যস্ত তো আছিই। আপনি না হয় নাড়ীভুঁড়ি, পচা, আর একজন না হয় মুরগী-ভাজা, কেউ না হয় খাচ্ছে কুক্ত-ভাতে,

আর কেউ না হয় খাচ্ছে মাছ-ভাতে, প্রকারান্তরে সেই মহাপ্রসাদ তো সবাই খাচ্ছে, বিশেষটা কি? আপনি বুঝি ভাবছেন এ দেখিয়ে একটা বাহাদুরি নিয়ে যাবেন—অসম্ভবটা সম্ভব করছেন, আর লম্ফ দিয়ে পর্ব্বত ডিঙ্গাচ্ছেন; আমি দেখছি এক জায়গায়ই নৃত্য করছেন আর বলছেন, 'এই হিমালয়, এই প্রশান্ত মহাসাগর, এই হনুমানের সাগর-লঙ্ঘন'—কল্পনায় সবই সম্ভব। শূন্যে সৌধ-নির্ম্মাণ যে সেটা—মনে মনেই তৃপ্তি। আমি দেখছি যে একই জায়গায় রজ্জু ঘুরাচ্ছেন।" তখন সাধক বললেন, "তুমি তো অনেক বলে যাচ্ছ, তুমি এর গুরুত্ব যদি বুঝতে তবে আর এসব বলতে না। আমিও সমস্ত লজ্জা ত্যাগ করেছি, সমস্ত স্ত্রী-জাতিকে সঙ্গম-জাতির মধ্যে এনেছি।" ঠাকুর বললেন, "তবে তো অনেকটা এগিয়ে গেছেন। সদরে তো আর সমর্থন পাবেন না।" সাধক বললেন, "তান্ত্রিকের সঙ্গমের দরকার হয়, 'বিন্দুসিদ্ধা' দরকার হয়।" ঠাকুর বললেন, "যে সিদ্ধারই দরকার হউক, আপনি কি সবার সম্মুখে সব-কিছু করতে পারেন?" এরপরই সাধক চীৎকার ক'রে বলে উঠলেন, "পারুলি—ই, পারুলি— ই।" পারুলি না পালি, সে বোঝা গেল না। গেরুয়া বস্ত্র পরিহিতা মধ্য-বয়স্কা একজন স্ত্রীলোক এসে উপস্থিত হলো এবং সে সবাইকে প্রণাম করলো, তারপর ঐ স্ত্রীলোকটি ও সাধক দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে কি যেন ইসারা করলো। এরপর সাধকের সম্ভাষণে আমরা বুঝলাম স্ত্রীলোকটির নাম 'পারুলি'। ঠাকুর বললেন, "এও কি বহুদিন যাবৎ তান্ত্রিক সাধনা করছে?" ঠাকুর স্ত্রীলোকটির দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, "আপনি বেশ ভাগ্যবতী। আপনি-যে এই পথে সাধনার দিকে চলেছেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে এই পথের এই সব নিয়ে নাড়াচাড়া করি না, আর প্রয়োজনও হয়নি। আপনি বুঝি তাঁর সাথে সাথে শিখছেন?" হঠাৎ সাধক বলে উঠলেন, "এই তান্ত্রিক সাধনা করতে হলে সঙ্গমে মনোনিবেশ করতে হয়, কিন্তু বীর্য্য

পাত করা নিষেধ।” ঠাকুর বললেন, “অনেকটা তো তবে এগিয়ে গেছেন। পাত করতে করতে নিপাতে দাঁড়িয়ে যাওয়ায় কি আর পাত হচ্ছে না? না, পাত করছেন না? আর পাত যে করছেন না বলছেন, যখন সঙ্গম করছেন, ‘মেসিন’ যখন চলছে, ক্ষয় তো হচ্ছেই, নতুবা চলছে কি ক’রে? তবে আস্তে আস্তে চলছে কিনা, তাই পাতের মাত্রাটাও একটু একটু হচ্ছে। এরও এক কারণ আছে, মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে একটু শিথিলতা আসবেই, বৈরাগ্যের সাড়া কি সেটাই নাকি? ভোগ করতে করতে আর যখন ইচ্ছে না হয়, ত্যাগের চেহারা কি সে-ভাবে বর্ণনা? অসমর্থ হলেও ত্যাগের নাম দিয়ে অনেকে বাহাদুরি নেয়, সে-ভাব তো নয়?” এরপর সাধক হাতে একটু তামাকপাতা ইত্যাদি নিয়ে ডললেন, তারপর একটা চাকু বের ক’রে হাড়ের উপর সেটাকে কাটতে আরম্ভ করলেন, আর মাঝে মাঝে গালবাদ্য দিতে লাগলেন। ঠাকুর বললেন, “ওটা আবার কেন?” সাধক বললেন, “মাঝে মাঝে মন একটু এদিক ওদিক গেলে টেনে রাখে, আর গালবাদ্যেতে ভোলানাথ খুশী।” ঠাকুর বললেন, “বেশ কথা তো বললেন, ‘কারণে’ খুশী করুণাময়ী, আর গাঁজাতে খুশী ভোলানাথ, দুটি দিয়ে বুঝি দুটোকে একবারে খুশী করছেন। ‘গোচর’ ঠিকই দিচ্ছেন, খুঁটো ঠিক রেখে আর দড়ি দিয়ে বেশ ঘুরাচ্ছেন; আর গালবাদ্যেতে ‘তিনি’ খুশী হন, সেটা কি ভাবে অবগত হলেন?” সাধক বললেন, “আমায় জানিয়ে দিয়েছে।” ঠাকুর তখন বললেন, “তবে অনেকটা তো এগিয়ে এসেছেন। বাড়ী গিয়ে এবার ‘ড্রাম’ পেটাবো, তবে তো ‘বাবা ভোলানাথ’ আমার বাড়ী ছাড়াই হবে না, মুখটা ব্যথা ক’রে লাভ কি, একটা কেরোসিনের টিন ইত্যাদি এনে পেটালেই হয়।” তখন সাধক ঠাকুরকে বললেন, “ও তুমি বুঝবে না।” ঠাকুর বললেন, “আপনার একটা দিক্ দেখে বেশ ভাল লাগছে, এত যে বলছি, আপনি কিন্তু চটছেন না।” সাধক

বললেন, "চটবো কি বাবা, সব শেষ করে ফেলেছি।" ঠাকুর বললেন, "যে জায়গায় আছেন, তাতেই বোঝা যাচ্ছে, শেষ না হলেও অপেক্ষা করছেন—কবে হবে, আমরাও আসছি। না চটে যে বেশ মিষ্টিভাবে উত্তর দিচ্ছেন, তাতে আপনার সাথে আলাপ ক'রে বেশ খুশি লাগছে। এতে বুঝা যায় কি জানেন, বেহায়া শত বকলেও চটে না, কারণ তার দোষের উপর সে সজাগ ; একটা গুণকে তো প্রকাশ করা চাই, তাই না চটে চুপ করে থাকা, নির্দ্দোষের মত চেহারা দেখাবার জন্য এটাও একজাতীয় গুণ—দোষীর বেলায় এই জাতীয় প্রযোজ্য। অনেকে সংসারে বড় হয়ে অনেক গালিগালাজ খায়, অনেক অপমানের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে হয়, ভেতরে ভীষণ চটে যায়, পারলে কিভাবে অপদস্থ করবে সে চিন্তা করে, কিন্তু মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে এই ভয়ে মুখে মিষ্টি হাসিটুকু দিতে সে কার্পণ্য করে না, পাছে ধরা পড়ে যায়—এটাও একজাতীয় সাধনা। কষ্ট ক'রে বেশ পরিশ্রম ক'রে এটাকে বজায় রাখতে চেষ্টা করে। নেতৃত্ব করতে গেলে তা করতেই হবে, উপায় যে নেই। সবার ধাত হলে যে সাধারণ হয়ে পড়বে, তাই বাধ্য-বাধকতায় তার ঐ সমস্ত চেহারা করিয়ে নিচ্ছে। সে নিজে কিন্তু রূপ হতে বহু দূর, আপনার বেলায়ও যে নয় তার প্রমাণ কি? সেজে বসেছেন, ফাঁস হয়ে পড়লে কোন চেহারায় পরিণত হবেন, তাই জোর করে সহ্য করছেন গালিগালাজগুলো। আপনাকে যদি বুঝতাম আপনার অনুষ্ঠানের ভেতরে আপনার সরলতা রয়েছে, আগ্রহ রয়েছে, আপনি প্রচেষ্টাতে রয়েছেন, অন্তর এবং বাহির আপনার সমতায় রয়েছে, তবেই আপনার পক্ষে সম্ভব হতো আমার বাণীগুলো হজম করা। এখন যে তা হচ্ছে না, তার পরিচয় প্রথম হতেই যে পাচ্ছি, অনুষ্ঠানের মত আমার এই অপমানসূচক কথাগুলোকেও অনুষ্ঠান-জাতীয়তার মধ্যে রেখে, ভেতরে সাংঘাতিক আক্রোশমূলকভাবে রেখে যে গালবাদ্য, 'সিদ্ধি' আর 'কারণ', আর আমার কথোপকথন

এক জাতীয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন, মাঝে মাঝে উচ্চ স্বরে চীৎকার—তাই নয় কি? আপনি বলছেন, আপনার সাথে 'তাঁর' আলাপ হচ্ছে, আবার নিজেই বলছেন, 'তাঁকে' খুশী করতে চলছি, আবার বলছেন, 'সঙ্গম ক'রে মন সংযম করছি, 'বিন্দুসিদ্ধা'র চেষ্টা করছি'—এসব চেষ্টার সফলতা হলেই তো 'তাঁর' দর্শন। আপনার ভাষণে তাই তো জানাচ্ছেন আবার বলছেন 'তাঁর' দর্শন হয়েছে। দর্শন হলে অনুষ্ঠানের আর প্রয়োজনীয়তা কি? রান্না শিখলে 'টোফা-মুচি' তো আর থাকে না, মনঃসংযমতার পরিচয় সেখানেই শেষ, মনঃস্থাপনের পরিচয়ও সেখানেই শেষ, সাধনার পরিচয় তো সেখানেই, দর্শন যেখানে মিলে যায়। বাড়ী বসে বসে ষ্টেশন গুনলে ষ্টেশনে পৌঁছান যায় না, তার ব্যবস্থা তো করতে হবে; ব্যবস্থা যখন করছেন, এগিয়েও যখন যাচ্ছেন আর বলছেন রাস্তাও ঠিক আছে, গন্তব্য স্থলও যখন ঠিকই আছে, আবার বলছেন পৌঁছেছেনও; বাড়ী বসে ষ্টেশন গনার মত করছেন কেন? হয় বসে ষ্টেশন গুনছেন, না হয় ভুল করে দিক্‌ভ্রম করছেন আর তা না হয় যাত্রা ক'রে এগিয়ে চলছেন, গন্তব্য স্থল ঠিক নেই; গন্তব্য স্থলে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও এগিয়ে যাওয়ার মাত্রা যদি এগিয়ে যাওয়ামূলক ঠিকও থেকে থাকে, হোঁচট খাচ্ছেন, না হয় 'বিন্দু'র মধ্যে ধাক্কা খেয়ে আট্‌কে আছেন, না হয় কোন ঢেউয়েতে হাবুডুবু খাচ্ছেন, আর না হয় কল্পনার মাঝে মাঝে এগিয়ে চলছেন, আর তা না হয় অভিনয়ের মাঝে অভিনয় করছেন।

আপনি তো এই মঞ্চে নানা পরিচয় দিলেন, রাজাও হলেন, প্রজাও হলেন, আবার উন্মাদও সাজলেন, আবার সন্ন্যাসীও হলেন, এ যে 'হ-য-ব-র-ল'। উত্তর দিন্, এখন বলুন আপনি কোন্‌টা।" তখন সাধক বললেন, "তাঁর দর্শন হলেও তো চেষ্টা করতে হবে 'তাঁকে' সম্পূর্ণ আয়ত্ত করার জন্য।" ঠাকুর বললেন, "এ যে সূর্য্যের আলোতে

টিপ্‌বাতির কথা। যদি 'তাঁর' দর্শনই হয়ে থাকে, তবে আর অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না, 'তাঁর' আলোতেই সে নিজে টেনে নিয়ে যাবে, সেই আলোতেই সব প্রকাশ করবে; একবার যদি উদ্ভাসিত হয় তখন টিপ্‌বাতি অনেক দূর সরে যে যায়—এই অনুষ্ঠানগুলো যে আলোর অভাবেই। সূর্য্যের দীপ্তিতে আর কিছুর প্রয়োজন হয় না, এখন যে দীপ্তি, এতো প্রদীপ-বিশেষ, ঐ অন্ধকারে এই একটু-একটু আলোতে আলোর সন্ধানই করছেন। এখনও সেই প্রদীপ, দর্শনেও যদি এ প্রদীপই রয়ে যায়, উপহাস কাকে করা হচ্ছে? জাহাজের সাথে নৌকার প্রতিযোগিতা, আপনার পরিচয়েতে 'তাঁকে' বর্ণনা কি সমীচীন?" তখন সাধক বললেন, "না, আমি সেই ভাবার্থে বলিনি, মনকে পাকা করতে তো হবে? কাঁচা মাটিতে তো আর জল রাখা যায় না, তাই পুড়ে পাকা করছি।" ঠাকুর বললেন, "বেশ তো, কাঁচা মাটি পোড়া করবার চেষ্টা করছেন, কাঁচা মাটিতো হঠাৎ নিয়ে উনুনে চাপান হয় না? তার আগে 'তা' দিয়ে নিতে হবে, সে 'তা'ই বুঝিয়ে দেয় আমার সমকক্ষ আর একটি যে রয়েছে তাতে চাপিয়ে দাও। সেখানে গিয়ে উনুনে যখন তাকে ফেলে দেওয়া হয়; তখন পুড়ে সে হয় লাল। আপনি এখন কাঁচা রয়েছেন, পাকবার চেষ্টা করছেন। হঠাৎ আগুনে ফেটে নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় আছে যে, এখন 'তা' দিন্। তবে এখন 'তা'. দিতে গেলে—একটু বুঝে নিন এই সমস্ত তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা, বুঝে এলেই তো সব বুঝ ঠিক হবে। তারপর উনুনে চাপিয়ে দেবেন, তখন সব সহ্য হবে, গলে যাওয়ার ভয় আর থাকবে না; এখন যখন ভয় রয়েছে, আপনার কথায় আপনিই পরিচয় দিচ্ছেন, আপনার কথা হতে আপনাকেই বলছি, কাঁচা মাটিকে সাবধানে রাখুন, কখন গলে যায়, ভেঙ্গে যায়, তার আগেই সাবধানতা অবলম্বন করুন, তবেই হবেন তৈরী। আর এই অনুষ্ঠানের মর্ম্মকে বুঝুন কেন করছেন। এই

হাড়টুকু যে দেখছি সিদ্ধি কাটতে কাটতে প্রায় দু'আঙ্গুল গর্ত্ত করে ফেলেছেন,—আপনি কতটুকু গভীরে গেছেন ? একটা তো ঠিকই, না পেলে আর উপায় থাকে না, তখন এই সমস্ত ফেলে আব্‌গারীর দিকে চলতে থাকেন, তখন গালবাদ্যও থাকে না, আর মঙ্গলময়ীও থাকে না, তখন সেই 'দোকানের সাড়া' না পাওয়া পর্য্যন্ত জানলায় দাঁড়িয়ে আছেন, কখন দেবে 'সাড়ার বস্তু'। তারা কম উপকার করছে না, ভোলানাথ আর মঙ্গলময়ীর ইঙ্গিতকে অহরহ বিলিয়ে দিচ্ছে সেই ইঙ্গিতে যাওয়ার জন্য ; তারা না জানি আরো কোন পর্য্যায় গিয়ে বসে রয়েছে। যে দান করে তার পকেটে আছে বলেই তো। সে দাতা যেন কোন সাড়ার সাড়ায় সাড়া পেয়ে দান করবার জন্য বসে রয়েছে, বুঝতে পেরেছে ঠিকই একটা। 'সাড়া'রা যে ছুটে আসছে সাড়ায় সাড়ায়—মাঠেতে সৌরভ...দেখে, নালায় দেখে সাগর, আর নিজেকে দেখে শূন্য-মার্গে, সবার দেখে মাথা নীচে ; 'মহারথী' সেই সাড়ার সাড়া পেয়েই বসে বসে দান করছেন, সেই 'সাড়া'দের সাড়ার জিনিষ দিয়ে, এদের দৌড়-যে এ পর্য্যন্তই ;" তারপর সাধক বললেন, "মনকে নিবিষ্ট করতে হলে এর প্রয়োজন হয়।" ঠাকুর বললেন, "নিবিষ্টতার দৌড় তো বললামই, অপথকে পথ ধরে নেওয়া, এই যে তার ধর্ম্ম দেখছি, তার পরিচয় তো দিচ্ছেন আপনার এই অনুষ্ঠানে, তবে তত্ত্ব-ব্যাখ্যা ইচ্ছামত যেখানে সেখানে ব্যবহার করা যায়। এক বেচারী নেমন্তন্ন খাওয়াবে, তরকারী এনেছে অনেক, এর মধ্যে উচ্ছেই এনেছে বেশী ; উচ্ছেগুলো ফেলে দেবে, তাই অম্বল হতে মিষ্টান্ন পর্য্যন্ত অল্প অল্প সবটার মধ্যেই ব্যবহার করে ফেলেছে, জিনিষগুলোর 'আয়'তো করলো। যে খাবে তার তো বুঝতেই পারছেন কি অবস্থা, আগাগোড়াই তিক্ততা নিয়ে চলে গেল। তত্ত্ব-ব্যাখ্যা ইচ্ছামত ব্যবহার করা যায় উচ্ছেকে যেমন ব্যবহার করা হলো। ব্যবহার তো করা যায় কিন্তু সেটা ধাতে আসবে কিনা তাতো দেখতে

হবে। 'কারণ'কে না হয় করলেন 'সোমরস', 'সিদ্ধিকে' করলেন 'মহানেশা,' পাঁচটা মাথাকে করলেন 'পঞ্চ-ইন্দ্রিয়', শবকে দেখে না হয় স্মরণে আনলেন 'আমারও তো একদিন হবে।' প্রথম উদ্যোগে না হয় ভয়ে ভীতিতে নাড়াচাড়া দিলেন, আর এগুলো যখন ধাতস্থ হয়ে যাবে তখন যে 'ডোম', তখন কোনটাতেই যে আবেগ আসবে না, আবেগের গোড়ায় যে nil। আপনার তো সে অবস্থা হয়েছে, কোনটাতেই আর মনঃসংযম হচ্ছে না। তবে আছেন বেশ জায়গাটিতে, এখানে এসে কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না, আর এখানে ইচ্ছে মত 'বিন্দুসিদ্ধা'-কার্য্যের পক্ষে সুবিধে হবে মন সংযম করার জন্য। কারণ আমাদের দেশের রীতিনীতিতে শ্মশানকে ভয় সবাই করে, আর এখানে lakeএর মত কেউ আর বেড়াতেও আসবে না, রসালাপের জায়গা তো এটা নয়, আর সহজে কেউ আসেও না, না ঠেকলে। এমন জায়গাকেই যখন আপনি এত সহজ ক'রে ফেলেছেন lakeএর সামিল, আপনি বাপের বেটা, ঠিক ঝোপ বুঝে কোপ্ দিয়েছেন, বিনা দ্বিধাতে বিচরণ করছেন, সেদিক্ দিয়ে অনেকটা গুছিয়ে নিয়েছেন, লাভ হলো কি? আপনি না হয় শ্মশান-হ্রদে, আমরা না হয় lakeএ।" তখন সাধক বললেন, "এই সমস্ত শাস্ত্রগত কাজ যে করছি, সবই কি ভুয়া?" ঠাকুর বললেন, "সন্দেহের পরিচয় দেখছি আপনিই দিচ্ছেন। প্রকৃত সত্যে যদি থাকতেন, সত্য যদি বুঝতেন, তবে 'শাস্ত্র কি 'ভুয়া' একথা বলতেন না, মনে জোর দিয়েই একথা বলতেন, 'আমি যা বলছি তা ঠিক, তার উপলব্ধি পাচ্ছি, যে যাই বলুক।' সে জোর তো আপনার নেই, দাঁত যদি নড়ে যায়, শক্ত জিনিষ খাবার সময় ধরা পড়ে যায়, যতই সে দাঁতের বড়াই করুক, চৰ্ব্বণ করলেই বুঝা যাবে ঠিক আছে কিনা। যতই আপনি ঠিকঠাকের চেহারা দেখান না, তখন আপনাকে লোলাতে হবে, আপনি বলের পরিচয় যখন দিতে যাবেন, লোলায়ে লোলায়ে লালা বের ক'রে ওটাকে

নরম করবার চেষ্টা করতে হবে, এর আগেই যে আর একজন টের পেয়ে যাবে, তাই আপনার খুঁটি যে নড়বে। বিবেক, বিচার, বুদ্ধি, ধ্যান, জপ, সাধনা, যা-কিছু সবই যে কঠিন পদার্থ হয়ে যাচ্ছে, তাই নড়ছে, বেশ টের পাচ্ছি; কিন্তু চেষ্টা করছেন দেখাবার জন্য নড়েনি, তাতে এ সমস্ত গালবাদ্য, চিমটার সাথে মাঝে মাঝে ঊর্দ্ধ নেত্র, হাসি-মুখে দু'একটা কথা, ভিতরে 'আক্রোশপূর্ণ'—এ যে লোলানি-ঝোলানির মত যে, তাতেও যে ভিজে না, এ যে আপনার লালায় আপনিই ভিজছেন, এ যে বুকে ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে। শক্ত দেখাবার চেষ্টাতে অত পরিশ্রম ক'রে নিজের ফাঁদে নিজেই যে পড়ছেন, তাতে যে ধরাই পড়ছেন, সে দিকেও যে খেয়াল নেই, তা স্বাভাবিক। প্রকোপ রোগে লজ্জা সরম খেয়াল থাকে না, তখন বাহ্যি, প্রস্রাব আপনিই বেরুতে থাকে, কারুর অপেক্ষা করে না, প্রকোপের দৌরাত্ম্য এরকম; আপনাতে প্রকোপ—আপনারও কিন্তু সেরকম কোন দিক্ দিয়ে কোনটা যে বেরিয়ে যাচ্ছে, সেটা আপনার খেয়াল নেই, বোঝে অন্যে, তখনই বিবিধ ব্যবস্থার দরকার। আপনার গতিবিধিতে সেই প্রকোপেরই পরিচয় দিচ্ছেন কিন্তু, এখন এই মহাশঙ্খের মালা আর এই পঞ্চমুণ্ডির সাধনা আর আনুষঙ্গিক যা-কিছু সবই কিন্তু প্রকোপেতে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, কোনটাতে আর ঠেকাতে পারছে না।" তখন সাধক বললেন, "আপনি তো বহু কথা বললেন, আপনি নিশ্চয়ই সাধনার কিছু জানেন।" ঠাকুর বললেন, "এই ধরনের পথ পদ্ধতির ব্যবহারেতে নেই, stethoscope—একটি যন্ত্র আছে, কার কি ব্যারাম তাতে ধরা পড়ে; শুধু মানুষই না, জীবজন্তুর বেলায়ও সেটা ব্যবহার করা যায়। কোনটা জানোয়ার কোনটা 'মান্-হুঁশ', তা যে ধরা পড়ে, যন্ত্র যদি সাথে থাকে। তবে মনরূপ যন্ত্র যদি করে নেওয়া যায়, এই সমস্ত সবই ধরা পড়ে, কোন্‌টা কোন্ জীব—এই যন্ত্রে সব 'যন্ত্র', সব ধরা পড়বে। তান্ত্রিকের প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা কিসের জন্য, কোনটার

কি দরকার, প্রত্যেকটি তত্ত্ব এই যন্ত্রেই পরিচয় দেবে, বিধি-ব্যবস্থা তখনই আসবে। বস্তুর পরিচয় পেয়ে গেলে কোন অসুবিধা থাকবে না, থাকেও না।" তখন সাধক বললেন, "আমি আপনার সঙ্গে কতকগুলো গোপন আলাপ করবো আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে।" ঠাকুর বললেন, "বেশতো, তা করা যাবে।"

চল্লিশ

সেদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিলো। ঠাকুর দোতলার ঘরে বসে* কথা বলছিলেন। সমস্ত দিনব্যাপী মুষলধারে বারিপাতের দরুণ লোকসমাগম খুবই কম ছিলো। শুধু আমাদের মধ্যে কয়েকজন† উপস্থিত ছিল। আমাদের ভেতর একজন ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলো, "ঠাকুর, কয়েকদিন যাবৎ ভাবছি 'কামশাস্ত্র' সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবো, কিন্তু এত লোকের ভিড় যে, সে-সুযোগ আর ক'রে উঠতে পারিনি; আজ একটু নিরিবিলি আছে, আজ ঐ বিষয়ে আলাপ হলে একটু জানতে পারতাম।" ঠাকুর বললেন, "দেখ, আমার বলতে কোন আপত্তি নেই, দ্বিধাও নেই। আমি সহজভাবে সহজ ক'রে সব তোদের বুঝিয়ে দিতে পারি, তবে পরিবেষ্টনী সে-ভাবে গড়ে না উঠলে, আলাপের বিষয়বস্তুগুলো যার যার অভিরুচি মত রূপ দিয়ে নানাভাবে ব্যাখ্যা করে যাবে, তাতে ঐ আলাপের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করবে; তবে আলাপের মর্য্যাদা তো আর ক্ষুণ্ণ হয় না, এটাতে যার যার ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণতার পরিচয়ই দিচ্ছে, বেষ্টনীর পরিবেষ্টিত রূপেরই যে বিকাশ, তাই যে রূপের বিকাশ হলে সব-কিছুরই মর্য্যাদা দিতে পারে, সেই রূপই বিকশিত করতে চেষ্টা করছি। আমাদের কোনটা গোপন, কোনটা লজ্জা, বেশীর ভাগ তার প্রকৃত অর্থ না বুঝে যে যেভাবে ইচ্ছা

---

* স্বামীবাগ, ঢাকা।

† শান্তি দাস মজুমদার, অজিত ভট্টাচার্য্য, বারীন ঘোষ, ভূপেন রায়, রবি ঘোষ।

এক-একটা রূপ দিয়ে যাচ্ছে। বেষ্টনীর চাপে আমিও সেই ভাবে চলছি চালিয়ে নেওয়ার জন্য, মূল বিষয়বস্তুর তত্ত্বকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। তবে যে বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে চেয়েছ, সেটা বিরাট বিষয়বস্তু। এ সমস্ত বুঝতে হলে একটু বেশী সময় দরকার। এখন তোমাদের একটুখানি hints দিচ্ছি মাত্র।

প্রাকৃতিক নিয়মে এক জাতীয় শক্তি সবাতে বিদ্যমান। অবস্থা ভেদে যার যার শক্তির প্রকাশ, প্রকাশে তারতম্যের ভাব দৃষ্টি-গোচর হলেও নিয়মের বশীভূতেই সব চলছে সুগমতাকে বজায় রেখে; কি পুরুষ, কি প্রকৃতি— সৃষ্টিকে এই দুই নামে বিভক্ত করা হয়েছে বুঝবার জন্য—উভয়েতে উভয় শক্তিই বিদ্যমান। একই শক্তি যে আবার উভয়ের উভয়ের সম্মেলনে সৃষ্টিরই আর একটি রূপ দিয়ে যাচ্ছে, যেমন নিজেকে নিজে রূপ দিয়েছে সৃষ্টিরই ভেতর দিয়ে। এই বিরাট সৃষ্টির সৃষ্টিতে যে আমরা জীবজগৎ ইত্যাদি রয়েছি 'স্ত্রী-পুরুষ' নাম-ভেদে—এক শক্তি হতেই যখন আগমন, আবার এক শক্তিতেই যখন স্থিত, কেবল প্রয়োজনে যার যার চিন্তাধারার পরিচয় দিয়ে আসছি, প্রকারান্তরে এক শক্তিরই যে বিকাশ করে যাচ্ছি; আবার বুঝে অবুঝে লড়াই করছে তারতম্য লক্ষ্য হওয়াতে—এরও প্রয়োজন রয়েছে, স্বরূপকে জানবার জন্য মন তখনই চিন্তাতে ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। এই ভাবেই মস্তিষ্কের সঞ্চালনে মনের গতিবিধি হতে থাকে, এই সূক্ষ্ম কারুকার্য্যতেই মন আশ্রয় নিয়ে আছে। আবার প্রতিটি সূক্ষ্মেই মন রয়েছে, আবার সঞ্চালনেই মনের উদ্ভব হচ্ছে, আবার মনের সঞ্চালনেই সব-কিছু হচ্ছে—এই ভাবেই চলছে সব, এই প্রাকৃতিক নিয়মে এই ভাবেই চলছে সব; প্রত্যেকে প্রত্যেকের দ্বারা চালিত—রহস্য তাতেই বিরাজিত, বুঝও বুঝবার জন্য সেখানেই স্থিত। তাই দ্বন্দ্ব ও লড়াই চলছে, কি ভেতরে কি বাইরে সমাধানে না আসা পর্য্যন্ত, আবার সমাধান যে রয়েছে সর্ব্বত্র। দ্বন্দ্ব ও সমস্যা

সেভাবেই চলে আসছে, প্রয়োজন তার রয়েছে রূপকে বিকশিত করার জন্য।

এখানে 'কামশাস্ত্র' বিষয়ে অনেকে অনেক কিছু লিখেছেন যিনি যতটুকু উপলব্ধি করেছেন। সেই সম্পর্কে কিছু বলার নেই, বলা হচ্ছে, কাম-বিষয়-সম্পর্কে বলতে গিয়ে সাধারণতঃ লিঙ্গের ক্ষুধা নিবৃত্তিকেই বুঝিয়ে গিয়েছেন অনেকে! কাম যখন ইচ্ছা, তাহা শুধু লিঙ্গ-বিশেষে হবে কেন? লিঙ্গ সর্ব্ব ইন্দ্রিয়তেই যে রয়েছে, ক্ষুধা লিঙ্গ-বিশেষে হবে কেন? চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ সবই যে লিঙ্গবৎ, যার যার ক্ষুধা নিবৃত্তি করে যাচ্ছে, কোনটা না হলে যে কেউ চলতে পারে না; সুতরাং কামও যে সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রয়েছে, আর যে যার চাহিদা মিটিয়ে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী নাড়াচাড়া করছে সেই শক্তির দ্বারাই সেই শক্তিকে—ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই ইচ্ছাকে নাড়ছে, ইচ্ছা কি ভাবে, কোন্ অবস্থায় নড়ছে, ইচ্ছা যে সর্ব্ব অবস্থায়ই চলছে—কাম সেখানেই যে রয়েছে। উন্মাদ শুধু লিঙ্গতে হবে কেন, সবটাতেই যে রয়েছে, কম বেশীর এখানে কিছু নেই, জায়গা-বিশেষে শুধু দাম দিয়ে গেছে। এ যে যার যার তৈরী দাম যে, দাম যে আবার প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েতেই রয়েছে, কেহ কোনটা হতে ফেলানো যায় না। এখানে যে লিঙ্গ-বিশেষ নিয়ে দাম দিয়ে গেছে, পাহাড়ে জঙ্গলে কোন কোন জায়গায় এর কোন দামই দেয়নি, স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়াদির সমতুল্যে নিয়েছে—এই দামাদামি করা হয়েছে যার যার ব্যক্তিগত অভিরুচি অনুযায়ী। ল্যাংটা সব সময়ই যে, সহজ তো এক জায়গায় না এক জায়গায় সবাই সবার নিকটেই-যে রয়েছে। অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলো যাহা লিঙ্গেরেই কাজ করে যাচ্ছে তাদের বেলায় তো এত ভাবছে না। ভাবছে না এই কথা বলা চলে না, সাবধানতা-অবলম্বন সব ইন্দ্রিয়ের বেলায়ই তো করেছে, সাবধানতার জন্য প্রকৃতি সেইভাবে সব বন্দোবস্ত ক'রে পাঠিয়েছেন, সেই শক্তিতেই যে দেওয়া

হুঁশ, তাহা দিয়েই তাহাদের গুছিয়ে নেওয়া হচ্ছে—স্বাধীনতা তো সেই শক্তি হতেই পাওয়া। দেওয়া যে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার, তাহা দ্বারা মাত্রা বুঝে বুঝে যাতে স্বাধীনতার অপব্যয় না হয় তা'ই যে তোমাদের করণীয়। ভাবনার বেলায় যেন এ লিঙ্গকে নিয়েই ব্যস্ত দেখা যায় বেশী। শক্তির অপব্যয় না হয় তাহাই যে চাওয়া, প্রাকৃতিক নিয়মে সবই চলছে, তারই দান যখন স্বাধীনতা, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার, চিন্তা, ভাল, মন্দ সব-কিছু এই সব নিয়েই তো সমভাবে চালিয়ে নিতে হবে। মাত্রা যদি কোনটায় বেশী পড়ে যায়, তার জের অন্যগুলোতে এসে প'ড়ে নানাদিকে অসুবিধা ঘটাতে পারে, তাই প্রত্যেকটি কার্য্যকে কার্য্য করার আগে ভাল ভাবে ভেবে নেওয়া উচিত। একজন 'টেরা'র অভিনয় করবে, সে ঐ চেষ্টাই করতে আরম্ভ করলো, ওর এই একটিই 'পার্ট'; সব জায়গাতে ঐ 'পার্ট'ই সে করছে। তাই 'টেরা' সাজার জন্য ভাল করে চেষ্টা করতে আরম্ভ করলো। এখন চক্ষু বক্র করতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নাকমুখ ইন্দ্রিয়েও চোট্ পড়তে আরম্ভ করলো; তারপর স্বাভাবিক অবস্থায়ও ঐ ইন্দ্রিয়গুলোতে একটা defect রয়ে যেতে লাগলো, শুধু তাই নয় গলার স্বর পর্য্যন্ত নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপক্রম। চেষ্টাতে সবই হয়, এখন বিকৃতেই যাও আর সোজাতেই যাও, একাগ্রতার তো সাধনা হচ্ছে, চেষ্টাতেই সেই সাধনা হয়ে যাচ্ছে, সফল কম-বেশী হবেই একাগ্রতার মাপ-কাঠিতে। তাই এই ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে এখানে বেশীর ভাগ ব্যক্তিই লিঙ্গ-ইন্দ্রিয়কে দাম বেশী দিচ্ছে। চরম সাধনা, সন্দিগ্ধতা সব-কিছুই যেন এর মধ্যে দিয়ে বসে রয়েছে, এত সতর্কতার বাণীতে সবাই যে এ বিষয়ে সতর্ক হয়েছে সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এখন কথা হলো, একদিকে এত টানে অন্য দিকে আবার যে শিথিলতার ভয় থাকতে পারে, তা ভেবেছে

কি ? 'সতর্কে'র সাবধনতা তো সবাই করছে সৎ বনবার জন্য—moralityর চরম যেন এখানেই রয়েছে। সাধুজী, বাবাজী, সবই যেন এখানে এসে জমে রয়েছে, যে যত বেশী সতর্ক সে যে তত বেশী honest। এই সতর্কতার দিক্ দিয়ে যে যত বেশী কাওলাতি দেখাতে পারবে সে তত বেশী ওস্তাদ যে, gentleman-পোষাক যে, পোষাকের মারামারির মত যে। এখন কে কাকে পাহারা দিচ্ছে, সতর্ককে কি পাহারা দিচ্ছে, না পাহারাকে পাহারা দিচ্ছে ? এই সতর্ক কেমন জান ?—কাক যেমন চক্ষু বুজে তার খাদ্য লুকায়, মনে মনে ভাবে আর তো কেউ দেখলো না, এও যে ঠিক তাই। অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদির বেলায় সব খোলা, কেবল এই লিঙ্গের বেলায় মুদ্রিত ? বেশ তো মজা ! এও কি সম্ভব ? এই সতর্কতা কি সম্ভব ? এ যে ভেক্। প্রাকৃতিক গতিকে কি আট্কানো অতই সহজ ? অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদির বেলায় তো তোমরা সবাই উদাসীন, আর ১৪৪ ধারা এর ওপর জারী কেন ?—Black-marketingতো সেখানেই। অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলোতে যেমন, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, ঐ সকলের বেলায় তো দেখছি ঔদাসীন্য রয়েছে, প্রাকৃতিক গতিতে যেভাবে চলা দরকার সেভাবেই চলছে, আর একটির বেলায় অমন করছে কেন ? ঐগুলো যেভাবে যে নিয়মে চলছে, তাদের force, তাদের অভ্যাস এই লিঙ্গতে আসবেই, কামের ব্যাপারে ওদের বেলায় তো সহজ করে ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। এ কামকে কি এত সহজেই বন্ধ করা সম্ভব ? বহুভাবে এখানে এটাকে ঢাকতে চেষ্টা করছে—এ যে বর্ষার জল, বাঁধে মানবে কেন ? বাঁধ দিলে যে উপর দিয়েই উঠে পড়ে। যতই বাঁধ দেও না কেন উঁকিঝুঁকি দিয়েই চলছে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই প্রত্যেকের সাহায্য ক'রে চলছে—এভাবে এভাবে সব-কিছুতেই সব রয়েছে। একটা রূপকে দেখলে, চিন্তা করলে,

সঙ্গম কিন্তু দেখার সাথে সাথেই হয়ে গেল। তারপর ক্রমশঃ ক্রমশঃ রসাস্বাদ চলতে থাকে। এখন চক্ষুতে যে রূপকে টেনে আনলে, 'ও' দেখায়েই শেষ। তারপর ভাবনায় নিয়ে চিন্তা ক'রে যার যার উপযুক্ত বুঝে যে-যে ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন-বোধে বেশীর ভাগ সেখানেই অবস্থিত হচ্ছে। একটি রূপকে চিন্তা করছো, তাকে বেশ লাগছে, পেলে মন্দ হতো না। তারপর 'নিজের গুণ ইত্যাদি থাকলে নিজেই ওকে আনতে পারতাম।' নিজের সৌন্দর্য্যের উপর নজর হলো—'যদি সুন্দর হতাম তবে নিশ্চয় আমার দিকে তাকাতো।' তারপর ভাব, আলাপ, বিছানায় পর্য্যন্ত নিয়ে সমাপ্ত করলে। লিঙ্গের কার্য্যব্যাপারের মধ্যে এই বিষয়, তাই লিঙ্গ সাড়া দিয়ে জানাচ্ছে, 'তাড়াতাড়ি আন আর পারছি না', তখন ভিতরে বাইরে স্খলিত হতে আরম্ভ করলো, সব-কিছুতেই যে সব বিদ্যমান। লিঙ্গ কোথায়—চোখে চোখে প্রেম করছে, কাম কিন্তু তথায় sparkএর মতো খেলে যাচ্ছে, তারপর যদি গান—তারপর তো আর একটু হলো, ত্বকের স্পর্শে যেমন নিজেকে একটু 'তা' দিয়ে ফেললো, ডিম কিন্তু ফুটছেই, মানে, স্খলিত হয়েই যাচ্ছে। 'সতর্কে' দৃষ্টিকেও সতর্ক করছে, মানে আড়চোখে নানাভাবে চলছে চাউনির প্যাঁচ। এখন ভদ্রতাই রাখবে না চাইবেই—কি মুস্কিল, এক শাস্তি-বিশেষ যেন হয়েছে, কিন্তু বাঁধ মানছে কোথায়? একদিকে গলদ বের হবেই, সন্দেহ প্রতি মুহূর্ত্তে খেলে যাচ্ছে। তাতে নির্দোষকে দোষী বানাচ্ছে, সংসার ভেঙ্গে যাচ্ছে, ভ্রান্তির উপর calculation ঠিক নেই, ইচ্ছে মত মন্তব্য করে সংসারে অশান্তি বাড়াচ্ছে। বাইরের গতিবিধির উপর মন্তব্য করে যাচ্ছে—সত্য মিথ্যে ভাবছে না। 'সতর্ক' কিন্তু এই করছে, শুধু তাই নয়, এক বিরাট অশান্তি ও সন্দেহকে ঘরে নেমন্তন্ন ক'রে এনেছে, তাই সন্দেহ ও অশান্তি এমনি বাসা করে বসেছে, যেমন বর্ষার জল আট্‌কালে ঘরে বাড়ীতে উঠে বসে, ঠিক যে তেমন। তাই এই অশান্তি ও সন্দেহ এমনি

ঘিরে বসেছে, তার কবল হতে যে ছুটা দায় হয়ে পড়েছে, তাতে নিজের উপর পর্য্যন্ত confidence হারিয়ে ফেলেছে। নিজেকে অন্যত্র বিশ্বাস করাবার জন্য 'সত্য, বিদ্যা, মাইরী,' কিরে কাটছে, আর বলছে 'বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর, মিছে বলছি না, মা-বাবার কিরে দিচ্ছি,' নানাভাবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে তার কথাকে বিশ্বাস করাবার জন্য, কি দুঃখই-না! কেন অমন হয়েছে?—শুধু ঐ সতর্ক বাণীতে। সতর্ক থাকা ভাল, সমাধানের অস্ত্র যদি থাকতো, তাতো নেই। এই সতর্কতাকে maintain করছে অভিনয়ের দ্বারা, মনপ্রাণের দ্বারা নয়। কয়জনে বলতে পারবে বুকে টোকা দিয়ে 'আমি এই সতর্ককে মনপ্রাণ দিয়ে পালন করে যাচ্ছি'—খুব কম; আমার সঙ্গে এখন পর্য্যন্ত দেখা হয়নি। পারার যে নয়, যে বলবে পারে, সে যে নিজেকে অস্বীকার করবে, সৃষ্টিকে সে অস্বীকার করবে; প্রতি মুহূর্ত্তে যখন সৃষ্টি চলছে, কাম চলছে, সঙ্গম চলছে—এ কি সম্ভব? বলার বলা বলে যাওয়া, যেমন অভিনয়তে শুধু সাজে, যদি কেহ বলে আমায় এসে 'আমার কাম নেই', সে যে নিজেও থাকে না, তা কি সে ভাবে না?—সংস্কারে কাকের চক্ষু বোজার মত যে। এই সৃষ্টি অবধি চলছে কাম, তার প্রভাব আমরা জন্মেছি অবধি শ্মশানে যাওয়া পর্য্যন্ত তো থাকবেই, তারপরও থাকবে পঞ্চভূতে। তবে মাত্রা ছাড়িয়ে কোনটাই যে সমীচীন নয়, তার জন্য সাবধানের অস্ত্র রয়েছে—কি জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার সবই-যে, এই সকল দিয়ে হালের মাঝি যেমন হাল ধরে, ঠিক সেই ভাবে হালটা সর্ব্ব জায়গায়, সর্ব্ব ইন্দ্রিয়েই গুছাবে। যেখানে বাঁধা সেখানেই inquisitiveness, সেখানেই তারপর গলদ ঢুকতে থাকে। এখানে দেখা যাচ্ছে এই কামটিকে যেন পারলে খাঁচায় আট্‌কে রাখে, এ কি সম্ভব? আজ এমন পর্য্যায় এসে দাঁড়িয়েছে, এই সংসারে যেন কেউ কাউকে বিশ্বাস করছে না, কেউ যেন তাকে বিশ্বাস না ক'রে তারই যেন প্রকারান্তরে সাধনা করে যাচ্ছে। বাইরের ছাপের উপর

যে যতটা পারে honestyর চেহারা ধরে, সাম্যভাবকে কোনমতে বাইরে দেখায় যাতে লোকে 'সাধু, পণ্ডিত' বলে—এক সমস্যায় যেন পড়ে যাওয়া হচ্ছে। ছেলেমেয়েরা যে সতর্ক সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 'আমার পোষাক, হাবভাব, চালচলন, প্রত্যেকে দেখে পছন্দ করুক' তা বুঝে তারা আবার তাই গ্রহণ করছে—চলছে এই এক 'আড়ালে খেলা', আবার সতর্কতাও ভুলছে না, একদিকে ল্যাংটা আর একদিকে সতর্কতা—আছে বেশ! একটা গানের ধুয়া আছে, 'কি আনন্দ হলো, ওগো, কি আনন্দ হলো।' গান গাইছে, 'শুভক্ষণে লক্ষীন্দর বাসরে পশিলো।' ধুয়া দিচ্ছে 'কি আনন্দ হলো, ওগো, কি আনন্দ হলো।' তারপর গান গাইছে 'কাল রাত্রে কালনাগে লখাইরে দংশিলো', তখনও ধুয়া দিচ্ছে, 'কি আনন্দ হলো, ওগো, কি আনন্দ হলো।' কোথায় যে কি ব্যাপার হবে তার ঠিক নেই, ধুয়া দিতে হবে চালিয়ে যাচ্ছে। এও যে ঠিক তাই—সতর্কতার 'ধুয়া' দিচ্ছে, ভড়ংও চলছে; ঢংও চলছে, কায়দাও চলছে, আড়ে আড়ে চাইছে ও হাসছে—কি দোকানে, কি রাস্তায়; আর সতর্কতার—ধুয়া রূপে টানও দিয়ে যাচ্ছে। এ দুনিয়ার চালচলন গতিবিধিতে যেন একজাতীয় লিঙ্গের মারামারি চলছে—কথাগুলো খুব লজ্জাজনক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; আমি যা পাচ্ছি তাই বলছি; হতে পারে আরো সুন্দর রয়েছে, দৃষ্টিতে পড়লে তখন আবার বলবো, তাই লজ্জা ইত্যাদি ত্যাগ ক'রে বলতে কোন দ্বিধা বোধ করছি না; লজ্জার মার্ প্যাঁচ শুধু কাপড়ের তলে কিনা. তাই হয়েছে অসুবিধা। তলে যে আবার ল্যাংটা, তা যেন আবার ভুলে না যায়, ল্যাংটা বারণ সাময়িক একটা পর্দ্দাতে, সে যে আবার ল্যাংটা তাতো সে জানে। তাই কি honesty, কি সতর্কতা, কি সাম্য, কি ভদ্রতা, যা-কিছু সবই-যে একটা পর্দ্দার মতো কার্য্য করে যাচ্ছে, তলে যে ল্যাংটা তাতো ভুলে যায় নি,

মানে, জোর ক'রে অভিনয় ক'রে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে, আবার একটু চিন্তাশীল ব্যক্তিদের নিকট প্রতি মুহূর্ত্তে ধরা পড়ছে। ধরিয়ে দিলে বা বললে রাগ-অভিমান সবটুকুনুই যে আছে, ব্যাপার মন্দ নয়!—এ হলো বাচ্চাদের আছাড় খাওয়ার মত। বাচ্চা যদি আছাড় খায়, তাতে যদি আবার আদরপূর্ণ ডাক ডাকে, 'আহা, আহা, কিছু হয়নি', সে কাঁদতে আরম্ভ করে; এই বেশীর ভাগ হয়েছে—সাজবেও, আবার আছাড় যে খাচ্ছে একথা বললে চটবেও —আছে বেশ!" এইখানেই ঠাকুর প্রসঙ্গটা বন্ধ ক'রে উঠে গেলেন।

একচল্লিশ

আমরা* সবাই ঠাকুরের নিকট বসে† আছি। বহু লোক দীক্ষিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। ঠাকুর দীক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে আবার চার-পাঁচ জনকে একত্রেও দীক্ষা দিচ্ছেন। এর মধ্যে ঠাকুর একজনকে‡ দীক্ষা দিতে বসেছেন। ঠাকুর বলছেন, "তুমি ঠিক হয়ে বস।" সেও বলছে, "তুমি ঠিক হয়ে বস।" ঠাকুর বলছেন, "বল কি ?" সেও বলছে, "বল কি ?" ঠাকুর বলছেন, "বেশ তো !" সেও বলছে, "বেশ তো !" ঠাকুব বলছেন, "তুমি বলছ কেন ?" সেও বলছে, "তুনি বলছ কেন ?" সে ভাবছে এগুলো মন্ত্রমূলক বাণী, তাই ঠাকুর যা যা বলছেন, সেও ঠিক তা তা বলছে, সুতরাং যারা বসে ছিল, তারা এসব শুনে নিজেদের হাসি সামলাতে না পেরে একটু হেসে উঠলো। চাপা হাসির একটা অদ্ভুত শব্দ হলো, আর আমরা কয়েকজন মুখ বুজে হাসি সামলাতে চেষ্টা করলাম। তারপর ঠাকুর আমাদের ডেকে জানিয়ে দিলেন 'ওকে ডেকে নীচে নিয়ে বুঝিয়ে দাও।' আমরা ওকে ডেকে নিয়ে বুঝিয়ে দিলাম।

---

* রবি ঘোষ, প্যারীমোহন গোস্বামী, ভূপতি গোস্বামী, হরিপদ দে, খোকন রায়, নিশিকান্ত গোস্বামী, নীলকান্ত গোস্বামী, ব্রজেশ্বর দাস, সুভাষিণী দাস, শান্তিদাস মজুমদার, অজিত ভট্টাচার্য্য।

† স্বামীবাগ, ঢাকা।

‡ রোহিনী দাস নম।

সে সব বুঝতে পারলো, তারপর নিজেই হাসতে লাগল। একে একে সবাই দীক্ষিত হয়ে গেল। তখন সেই লোকটি ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলো, "প্রভু, আমার এরূপ ভুল হলো কেন?" ঠাকুর জবাব দিলেন, "এই জাতীয় ভ্রান্তি অনেকের মধ্যে চলছে, যখন নিজের কাছে নিজে ধরা পড়ে, নিজের কাছে হাস্যাস্পদ ও লজ্জিত হয়ে দাঁড়ায়। একটা আয়নাতে যত রকম বিভিন্ন চেহারা করবে, আয়নাটি সব তোমার স্বরূপকে প্রকাশ করবে। শুনেছি এক ভদ্রলোকের ন্যাড়া মাথা ছিল, গোঁফ তার কম ছিল; artificial কেশ ও গোঁফদাড়ি ব্যবহার ক'রে সে চলত এবং সবাই তার এগুলো natural বলেই জানতো; রাত্রে শোবার সময় এই নিয়েই শুয়ে থাকতো, সে এত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে তার এটা যে artificial, সে নিজেই ভুলে গিয়েছিল। এরকম অনেক হয়,—একমণ হু'মণ মাথায় নিয়ে চলেছে অথচ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চলেছে, অভ্যাসে সব-কিছুই সম্ভব কিনা, ঐ যে সাধনা....stageএ stageএ চলতে আরম্ভ করলো। সেই লোকটি—যার artificial গোঁফদাড়ি রয়েছে, তার মুখে একটা ব্রণ হয়েছে, সেটা 'অপারেশন' করাতে হবে, ডাক্তার একটা মলম দিয়েছিল লাগাবার জন্য। ডাক্তার বলেছিল, 'আপনি দাড়ি কামিয়ে এই ঔষধ ব্যবহার করবেন।' তারপর সে দাড়িগোঁফ খুলে রেখে দিল। রাত্রে হঠাৎ 'বাথরুমে' গিয়েছে, 'বাথরুম' থেকে ঘরে এসে তার চেহারা আয়নাতে দেখে হঠাৎ সে চীৎকার করে উঠলো; সে মনে করেছে, কে যেন তাকে follow করেছে; ভুলে গেছে যে তার দাড়িগোঁফগুলো artificial ছিল; নিজের রূপ দেখে নিজেই faint হয়ে গেল। আশেপাশের বহু লোক এসে ভিড় করল, সবাই ওকে দেখছে, আর প্রত্যেকেই ওকে দেখে চমকে উঠছে 'এ কিরে বাবা!'

তাই স্বাভাবিক, নিজের বিকৃত রূপ যখন নিজের কাছে ধরা পড়ে,

নিজেও ভয় পায়, অন্যেও ভয় পায়; কিন্তু এই বিকৃতি যখন অভ্যাসে পরিণত হয়—যে মন বিক্ষিপ্ত ব'লে পরিচয় দিচ্ছে এবং শত যে অন্যায় ক'রে যাচ্ছে, অপরাধ ক'রে যাচ্ছে, খুব ধাতস্থ হয়ে যাওয়াতে অভ্যাসবশতঃ সে ভুলে যাচ্ছে নিজের দোষগুলো-সম্পর্কে। বেশ্যাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একরকম 'বাবু' থাকে, ওরাই তাদের 'গার্ড' দিয়ে রাখে, সারাদিন business চলে তারাই 'গার্ড' দেয়। ঠিক আমাদের prestige, position, status এই সমস্ত অহমিকা বৃত্তিগুলো 'বাবু'-জাতীয় কার্য্য ক'রে যাচ্ছে 'আবিলতা-পঙ্কিলতা-ক্লেদপূর্ণগুলোকে' রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। 'পঙ্কিলতা' যদি একজনকে ধরিয়ে দেওয়া যায়, দোষ যদি একজনকে ধরিয়ে দেওয়া যায়, তখন এগুলোতে ঘা লাগে। কিন্তু সহজভাবে যখন ব্যয় হয়ে যাচ্ছে বা ব্যবহার হয়ে যাচ্ছে, তখন নিজের ব্যক্তিগত মনে আঘাত লাগছে না, কিন্তু বুঝতে পারছে—বেশ্যার সাথে যেমন জনগণ ব্যবসাসূত্রে গাঁথা—'বাবু'রই এক জাতীয় post hold ক'রে যাচ্ছে। কিন্তু বেশ্যাকে যদি কেউ নিয়ে যেতে চায় অথবা কেউ গুছিয়ে দিতে চায় for their rectification, তখন বাবুর সাংঘাতিক অবস্থা, পারলে তাকে মেরে ফেলে। মনের বিক্ষিপ্ততা, চঞ্চলতা এবং ক্লেদের অবস্থাগুলোকে কেহ যদি সংশোধন ক'রে দিতে চায়, বলে দিতে চায়, গুছিয়ে দিতে চায়—সম্মান, মান, অহঙ্কার সেখানে এসে আঘাত দিয়ে নিজেদের ভুয়া ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগে মেতে যায়। অপরাধ যেমন তারাই করলো—কেন তারা সংশোধন করলো, কেন অন্যে সংশোধন করতে আসবে। ঠিক প্রকারান্তরে প্রকারান্তরে এই সমস্ত পঙ্কিলতা নিয়ে একটু-আধটু যশ, একটু-আধটু অর্থের যোগাড়—তার জন্য বহু প্রকার অপরাধ করতে কার্পণ্য করছে না নিজেকে একটু বাস্তবের চেহারায় বাইরের নামাকরণ ভদ্র অবস্থায় maintain করার জন্য; তাই ঐ একটু মান, অহঙ্কার, যশ, ও'গুলোকে যেন আমরা

'kept'এর মত রেখে দিয়েছি। বাবুকে ওরা যেমন 'kept' রাখে, আমরাও এ সমস্ত বৃত্তিগুলোকে 'kept' রেখেছি, যত মান-অহঙ্কার-বৃত্তিগুলোকে। এখন আমরা বেশীর ভাগ 'kept'এর পূজোই করে যাচ্ছি, সুতরাং পাওয়া আর বেশী কি হবে—তু'খানা তবল-ডুগির বাড়ি, আর পান খেয়ে পিচ্ আর তিনখানা কোমরের প্যাঁচ। এই জাতীয় পরিস্থিতির মধ্যে এ এক জাতীয় আনন্দ, এটাকে ঠিক আনন্দ বলা যায় না, এটাকে বলে 'হিজড়া আনন্দ'—না পুরুষ না মেয়েমানুষ, না আনন্দ না নিরানন্দ, ঠিক দাদের ঘা—যখন চুলকানি হয়, নখ দিয়ে চুলকাতে বেশ আরামদায়ক, পরের জ্বালা বড় মারাত্মক,—এই জাতীয় জ্বালাই বেশীর ভাগ এই বাস্তবে চলেছে। যে-কোন লোকই অন্যায় যদি ক'রে থাকে এবং কেউ যদি করে, সে কারো কাছে বলুক, না বলুক, শত যশ নিয়ে যাক, position নিয়ে যাক, ক্ষতি নেই ; কিন্তু সে যখন একা মনে একা ঘরে শয়নে ক্ষণিকের জন্য চুপচাপ থাকবে, তখন তার নিজস্ব রূপের সম্পর্কে সে নিজেই বুঝতে পারবে, নিজেই অবগত হতে পারবে—ফাঁকি তো নিজেকেই দিল, ফাঁকিতে কিন্তু ফাঁকিই পড়লো, জ্বালা কিন্তু রয়েই গেল, যত শান্তির মুখোশই সে পরুক না কেন। সমাজের যশ-মান-প্রতিষ্ঠা সাময়িক 'টনিকে'র কার্য্য করে, বেশী নেশায় যখন পড়ে যাবে তখন liverটা পচেও যেতে পারে—ভয় সেখানেই, আমাদের ভেতর আক্রমণ সেখানেই হচ্ছে ; মনোজগতে তাই হাহাকার চলছে শান্তির জন্য। সত্যের সাধনাতে, জ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতে জানবার ও শেখবার প্রয়াসে না যাওয়া পর্য্যন্ত হোঁচটের মাঝেই চলতে হবে, হোঁচটরূপ জ্বালাতেই জ্বালা-জাতীয় ঔষধ প্রয়োগে যেমন তার উপশম হয়, তার বৃত্তির জ্বালাগুলোও সে জাতীয়তাতেই উপশমে রয়েছে। আগুনে হাত পুড়লে, তাপই যেমন তার উপশম, এই বৃত্ত্যনল জ্ঞানানল দ্বারাই উপশম ; জ্বালা যেমন বিদ্যমান, জ্বালারূপ ক্রিয়া যে অসহ্যরূপ জ্বালার

পরিচয় দিচ্ছে সেটুকু শুধু মান-অভিমান, আর সহ্য হচ্ছে 'তরোরিব'। শিক্ষণীয় বস্তু সেখানে, সাম্যতা যেখানে প্রতিষ্ঠিত, ঠিক যেমন মধুকরের মধু আহরণ শ্রম-সাপেক্ষ—গুণীর দক্ষতা যে সেখানেই; তাই গুণবান্ ব্যক্তি আহরণার্থে ঠিক তেমনি করে এগিয়ে চলবে জ্ঞানের অন্বেষণে, সেখানেই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়ে যাবে জানবার প্রয়াসে।" ঠাকুর আরো যেন কি বলতে যাচ্ছিলেন, ভিড়ের চাপ বেড়ে যাওয়াতে প্রসঙ্গটা ওখানেই চাপা পড়লো।

বেয়াল্লিশ

আমরা* ঠাকুরের কাছে বসে† আলাপ শুনছি। আশে-পাশের গ্রাম থেকে কয়েকজন লোক এসে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হলো। তারা ঠাকুরকে কীর্ত্তন শোনাতে চাইলো। ঠাকুর বললেন, "বেশ তো, তোমরা শোনাবে, আজই সময়মত এসো।" তারপর সেদিন সন্ধ্যাবেলা চার-পাঁচটা দল খোল-করতাল ইত্যাদি নিয়ে এসে হাজির হলো। কীর্ত্তন আরম্ভ হলো। তারা বহুভাবে 'নাম' করছে। ঠাকুর তাদের সবার খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। তারা পালা ধরে ধরে কীর্ত্তন করলো। নাম-কীর্ত্তনে—কেউ 'নামে', কেউ গানে, নানাভাবের পরিচয় দিল। ঠাকুর খুব মন দিয়ে শুনলেন। তারপর সবাই মিলে মৃদঙ্গ, কাঁসি, করতাল বাজিয়ে নেচে নেচে দু'হাত তুলে কীর্ত্তন করলো। ঠাকুরও বসে বসে বেশ উপভোগ করলেন। এভাবে কীর্ত্তন শেষ হলো। ঠাকুর সবাইকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "কতদিন যাবৎ এ কীর্ত্তন করা হচ্ছে?" তাদের সমস্ত ইতিবৃত্ত জিজ্ঞেস করলেন। তাদের নাম-কীর্ত্তনের একটা পদ ছিল, 'বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ গৌরাঙ্গ' এবং এই একপদই নানা সুরে বহুভাবে গাইছিলো। ঠাকুর বললেন, " 'বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ গৌরাঙ্গ'—কিন্তু এ চীৎকারে তোমাদের কি হলো?" তারা উত্তর দিলো, "তাঁর নাম

---

* শচীন দাস, সতীশ সাহা, মনু দাস, সুধীর সোম, কালিপদ দে, অজিত ভট্টাচার্য্য আরো অনেকে।

† দোগাছি, বিক্রমপুর।

গাইলাম, তাতে যা হয়।" ঠাকুর বললেন, "কি হবে না হবে, তার মর্ম্মার্থ না বুঝে এভাবে চীৎকার ক'রে যাচ্ছ দিনের পর দিন ; এর একটা প্রকৃত ভাবার্থ বা চিন্তাধারা তোমাদের ভেতর পোষণ করা তো উচিত। এখন বলছো 'বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ'—সে তো বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণেই রয়ে যাচ্ছে, তোমাদের কোন্ প্রাণে সাড়া দিচ্ছে, তোমাদের প্রাণে সাড়া দেওয়া চাই তো। সেই প্রাণের সাড়ার জন্য কি করছো?" তখন তারা উত্তর করলো, "কাজ ক'রে যাচ্ছি, সাড়া এখনও পাইনি, তবে ডেকে যাচ্ছি।" ঠাকুর বললেন, "এইভাবে যে লাফিয়ে লাফিয়ে নাম করছো, তাতে......ঐ উপকারের সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক রয়েছে?" তাদের মধ্যে একজন উত্তর দিল, "নাম করতে করতে স্বাভাবিকভাবে এ ভাব এসে যায়।" ঠাকুর বললেন, "দেখ, এর একটা প্রয়োজনীয়তা আছে,—এক অর্থে তা হলো একনিষ্ঠ ভাবে তাঁকে ডাকা, সেই সাথে সাথে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চালনা সুস্থতার দিক্ দিয়ে অনেকটা সফলতার দিকে যাচ্ছে, আর একনিষ্ঠতার দিক্ দিয়ে নিজের মনের একটা পবিত্রতা maintain করছো ; পবিত্রতা হলো—সমস্ত ক্লেদ, ঝামেলা, দুঃখ, দৈন্য হতে সাময়িক মুক্তি পাওয়া, তার জন্য এই উচ্চারণ। এই একনিষ্ঠভাবে তন্ময় থেকে সংসারের যতটুকু সময় একটু অন্যমনস্ক থাকা যায়—তার প্রয়োজনেই ছিল এ সমস্ত ব্যবস্থা, তার জন্যই ছিল এ সমস্ত মাহাত্ম্য-প্রকাশ ; মাহাত্ম্যে মাহাত্ম্যে মনকে বিগলিত করছে এবং তার মধ্যে যে ভাব-প্রবণতা দেখলাম, এক-একজন যে পড়ে পড়ে গেল, তার মধ্যে আবার দু'একটা আধ্যাত্মিকযুক্ত কথা বললে—এর রহস্য কি? এ-যে সঙ্গত হতে হারিয়ে যাওয়ার মত হচ্ছে, এ-যে ভেকে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ; কারণ প্রবণতার পরিচয় নিষ্প্রভ নয়, সমস্ত অবস্থা হতে তাকে উন্মুক্ত করে তুলবে এবং সূক্ষ্মতার পরিচয় দেবে। এ কি! এ কোন্ ভাব?—নিজেকে হারিয়ে রাখার মত রেখে তার মধ্যে দেখা

যাচ্ছে conscious ঠিকই রয়েছে এবং আর একটু চিন্তা ক'রে দেখা যাচ্ছে, ইচ্ছা করেই যেন করছে যতই সে ভাবের ঘোরে পড়ে গেছে দেখাক না কেন, অ-ভাবের মাত্রাতেই পড়ে যাচ্ছে ; অ-ভাবেতে অ-ভাবেতে যে ভাব দেখাচ্ছে—ভাবের ঘরে যে nil।" ঠাকুর ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি যখন নাচতে নাচতে পড়ে গেলে, তখন তোমার তো বেশ খেয়াল ছিলো।" লোকটি উত্তর করলো, "আজ্ঞে —ঠিক তা নয়, তবে– ।" লোকটির অস্পষ্ট উক্তিতে ঠাকুর এমনভাবে প্রশ্ন করলেন যে, প্রকৃত উত্তর না দিলেই তার নিজের স্বরূপ বেরিয়ে পড়ে। তখন লোকটি একটু অনিচ্ছা সত্ত্বেও সব স্বীকার করে ফেললো। ঠাকুর বলতে লাগলেন, "তোমরা এইভাবে যে করছো— এই কাজের প্রকৃত রূপটিকে দেখবার চেষ্টা কর। রূপের সন্ধান না ক'রে নিজেরা এই ভাবে যশের মাত্রা বাড়িয়ে নিজেদের হেঁয়ালিতে হারাবে না। অনুষ্ঠানে এই উপদ্রবই বেশী এসে দাঁড়াচ্ছে দেখছি, নতুবা তোমাদের গান ও নৃত্য বেশ আনন্দই দিচ্ছিলো। কারণ, সংসারে যে কলহ, দরিদ্রতা, অভাব, অভিযোগ যা-কিছু রয়েছে, তার তক্‌দমা উপশম এর মধ্যেই-যে রয়েছে—'যোগাসন', 'সিংহাসন', নানা যোগ , হঠাৎ কিছু দিলে অনুষ্ঠানের আনন্দ তো আর মিলবে না। বাহ্যিক আড়ম্বরের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সংসারের দিক্ দিয়ে—আড়ম্বরেই যদি শুধু মেতে যায়, আড়ম্বরই তাকে গ্রাস ক'রে ফেলবে ; আড়ম্বরে যদি মেতে যায় সেই মুখ হতে ছুটে আসা বড় দায়। জ্ঞানের পথ নীরস পথ, যে-রস প্রথম প্রথম পাওয়া যায় না, তাই হঠাৎ গিয়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে, যখনই বুঝতে থাকে নিজের নির্ভরতা নিজের উপর এসে দাঁড়াচ্ছে—নির্ভরশীল জাত কিনা, তাই 'নির্ভর' না পেলেই নিজের দগ্ধতায় যেন নিজেই জ্বলতে থাকে, ঠিক জ্বালার মত অবস্থা-যে ; কিন্তু যখন জ্ঞানের যন্ত্র গড়ে উঠবে তখন দেখবে নিজের 'নির্ভরে' নিজের-যে শান্তি—নিজে কি

ভাবে যে প্রস্ফুটিত হতে থাকবে—দেখবে নিজেই-যে সব-কিছু; সেই রূপটি যখন বিকাশ হয়ে পড়বে, তখনই প্রকৃত সন্ধান মিলবে। নির্ভর ক'রে ক'রে নিজেকে হারিয়ে—হারাণোও হচ্ছে না, নির্ভরও হচ্ছে না—এক মাঝামাঝি অবস্থাতে বিরাজ করতে থাকে, কারণ সেখানেও বিচার-বুদ্ধি প্রকারান্তরে খেলে যাচ্ছে, নির্ভর করার জন্য যে-সমস্ত বুদ্ধি-বৃত্তি দরকার, তার জন্য তো জ্ঞানের উপর নির্ভর করছে—কি ভাবে নির্ভর করবে, কি ভাবে এসে 'তৃণাদপি' হবে এবং সাম্য maintain করবে, সত্য maintain করবে, যত প্রকার নির্ভরযোগ্য যা-কিছু আছে, বুদ্ধি-বৃত্তি-চিন্তা দ্বারাই তো সব হচ্ছে; আগে তো উহাই প্রয়োগ করছে, secondary এগুলো যাচ্ছে, প্রকারান্তরে জ্ঞানের রেশ খেলেই তো যাচ্ছে। সেই নির্ভরতা যদি নিজের ভেতর প্রতিষ্ঠিত করে, তখন শক্তি বল আপনিই বাড়বে, আর ওর ভিতর একটু যেন দুর্ব্বলতায় ঘিরে ধরে, একটু অসুস্থ অসুস্থ যেন লাগছে—কবে 'তিনি' আসবেন, কবে দয়া করবেন, 'হা প্রভু, হে প্রভু' তার ভেতরে মাদকতা রয়েছে, তন্ময়তা রয়েছে, ভাব রয়েছে, উপশমও রয়েছে, এক জাতীয় শান্তিও maintain করছে। কিন্তু সন্দিগ্ধতা যে দূরীভূত হচ্ছে না, তার মধ্যে যে হাবুডুবু খাচ্ছে, কারণ নিজের উপর যে নিজের confidence, তাও আর হচ্ছে না, তখনই ভাব-প্রবণতা আসে কিনা, confidence আনার জন্যই তখন এই ভাব-প্রবণতার সৃষ্টি আরম্ভ হলো, 'আমি অভাগা পড়ে আছি, তুমি আমায় কুড়িয়ে নেও কর্দ্দম হতে, ময়লা হতে, আমার সন্দিগ্ধতা তুমি ঘুচিয়ে দাও—বহু অপরাধ ক'রে যাচ্ছি, তুমি বুঝে ক্ষমা ক'রে নেও, বৃত্তির চালনায় ঘুরছি—অন্তর্য্যামী তুমি, তুমি ঘুচিয়ে নাও, যা-কিছু করছি তুমিই করিয়ে নিচ্ছ। আমার আর কি আছে?' নিজের সন্দিগ্ধতায় যে নিজে সন্দিগ্ধবান্, নিজের উপর যে নিজের confidence কম—এই যে সমস্ত কথোপকথন, এ যেন kind of আদেশ দিয়ে যাচ্ছে

সূক্ষ্মে tactfully এড়িয়ে চলার মত পথ করার জন্য, এই সমস্ত বলে বলে হালকা করছে—'সব অপরাধ যা-কিছু তুমিই নিয়ে নেও' বলে শান্তির পথে দুশ্চিন্তা হতে এই যে সমস্ত ভাব 'কোথায় গিয়ে যে অপরাধ করছি, অন্যায় করছি', এও যে বুদ্ধিবৃত্তিরই খেলা, জ্ঞানের রেশ এখানেও রয়েছে—এই সমস্ত যে বুঝছি; সুতরাং বুঝটুকুনু সর্ব্ব-অবস্থায় রয়ে যাচ্ছে, বৃত্তির খেলায় নড়ছি চড়ছি, সব-কিছু যে বুঝছি, বুঝে আবার তোমায় দিচ্ছি; কিন্তু সেই বুঝ যখন নিজের বুঝকে বুঝতে চেষ্টা করবে, নিজের বুঝের দিকে এগিয়ে যাবে—একটু যেন এলোমেলো হয়ে ঘুরছে কেবল, তখন আপনাআপনি সব জাগবে, দেবতার প্রকাশ তখন ভেতর হতেই হবে। পালোয়ানের নিকট অনুনয়-বিনয় করলে আর 'বার্‌বেল্‌'কে চুমু দিয়ে এলে কি আর পালোয়ান হওয়া যায়?—তবে পালোয়ান হওয়ার inspiration পেতে পারে। পালোয়ান-মশায় তখন উপদেশ দিলেন আর সাহায্য করলেন instrument দিয়ে, আর তার নির্ভরতার জন্য বিনা পয়সায় তাকে শেখালেন—এটুকুনু benefit না হয় পেলো; কসরতই তো তার নিজেরই করতে হবে, তার 'বুক-ডন্‌' 'বৈঠক' পালোয়ান দিলে তো হবে না যে তোমার হয়ে তিনখানা দিয়ে দিলো। সাহিত্য-প্রকাশেতে এগিয়ে যাওয়ার inspiration পেতে পারি, ভগবদ্‌প্রেমে আবেগ হওয়ার অবস্থা আমার হতে পারে, 'তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, তিনি অন্তর্য্যামী—he can do everything'—এটুকুনু বুঝে নিতে পারি, তিনি বড় একজন পালোয়ান এটুকু বুঝে নিলাম; তেমনি ছিপকোষ নিয়ে নাড়াচাড়া করলে, ফোঁটা কাটলে কি হবে? কাজেই এ সমস্ত instrument ধরা-ছোঁয়া করলে তো আর পালোয়ান হওয়া যায় না, নাম জানা যেতে পারে মাত্র। 'পালোয়ান হবো, পালোয়ান হবো' বললেই শুধু পালোয়ান হওয়া যায় না—পালোয়ান হওয়ার circumstance হতে পারে, favourable আনুষঙ্গিক হতে পারে,

কিন্তু তার কাছা বেঁধে নামতে হবে, কসরত করতে হবে ; তাই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, সেই সাধনাই করতে হবে। তাই বিশ্ব-সৃষ্টির সমস্ত তত্ত্বকে বুঝতে হবে, প্রয়োজনীয়তার কারণ জানতে হবে, সৃষ্টি, আগমন কেন—জানতে হবে ; কেন আসা, কেন যাওয়া, প্রত্যেকের রহস্য তন্ন তন্ন ক'রে জানতে হবে। সেই বুঝাবুঝি যখন ঠিক বুঝে পরিণত হবে, তখন বুঝ ঠিক বুঝের দিকে নিয়ে যাবে, তখন অনুনয়-বিনয়, আকুলিবিকুলি আর থাকবে না, তখন থাকবে তার কঠোরতম অবস্থা, শাসন-জাতীয় অবস্থা, পথ দান ক'রে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ব্যস্ততা—যুক্তি থাকবে তার যষ্টিস্বরূপ। সেই শাসনেই থাকবে তখন মাতোয়ারা হয়ে, সাবধানতার বাণী সে-ই জাগিয়ে দেবে, তখন instrumentগুলো তার কাছে খেলার সামগ্রীতে দাঁড়াবে, তখন তার বাহুবলে যন্ত্রই ভয় পেয়ে চলে যাবে, যন্ত্রের চেয়েও বাহুর যন্ত্র এত বেশী প্রখর হয়ে পড়েছে যে, যন্ত্র গিয়ে হার মানছে। প্রাথমিক শিক্ষাতে যন্ত্রের প্রয়োজন রয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই যে—যন্ত্রকে কাপড় পরিয়ে, শাড়ী পরিয়ে বিছানায় শুইয়ে রাখলে তো চলবে না—তাকে খেলাতে হবে, খাটাতে হবে, মেজে পরিষ্কার করলে চলবে না—চক্‌চক্ কর্‌লে কি হবে ? নিজেকে চকচকে করতে হবে।” এই ভাবে নানা কথায় তিনি আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। আরো কি যেন বলতে চাইছিলেন, কিন্তু রাত বেশী হয়ে যাওয়াতে বললেন, “খেয়ে নেও, আবার বলবো।”

———

তেতাল্লিশ

ঠাকুরের সাথে একবার আমরা* 'লঞ্চে'† গ্রামের দিকে যাচ্ছি। ঝড়-বৃষ্টি সমানে চলছে, তিনটা নদীর মোহনা—ভীষণ ঢেউ। বৃষ্টির ঝাপটা 'লঞ্চের' এদিক দিয়ে ঢুকে ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ; ঢেউ লঞ্চের ভেতরে ঢুকছে—অবস্থা তো বোঝাই যাচ্ছে—কি যে অবস্থা। সবারই প্রায় ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা, কারুরই কিছু ঠিক নেই, সেদিনকার অবস্থায়ই বুঝতে পেরেছিলেম যে ছেলেমেয়ে এক। ঠাকুরের মাসীমা ঠাকুরের সাথে কিছু ডালের বড়ি তাঁর মা'র জন্য দিয়েছিলেন এবং ঠাকুরের পকেটে নীলের যে একটা পুঁটলি দিয়ে দিয়েছিলেন, ঠাকুর তা জানতেন না—ঐ সমস্ত নিয়ে ঠাকুর চলেছেন তাঁর মা'র কাছে। ঝড়ের ঝাপটা সবাইকে স্নান করিয়ে তোলার মত অবস্থা করেছে—লঞ্চও প্রায় ডুবুডুবু অবস্থা। এদিকে লঞ্চের সারেঙ্গ বিপদ-ধ্বনি জানিয়ে দিল, "অবস্থা বেশী সুবিধাজনক নয়, আপনারা 'লাইফ-বয়া'গুলোর দিকে নজর রাখবেন, কারণ অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন।" এখন আমাদের শুধু বলাবলি হচ্ছে 'একদিকে যাবেন না, যে-দিকে আছেন দাঁড়িয়ে থাকুন।' কে কার কথা শোনে, প্রায় মৃত্যু-যাতনা চলছে কিনা, তাই যার যত তল্পিতে নাম ছিল—কেউ হরি-নাম, কেউ দুর্গা-নাম, কেউ কালী, কেউ আল্লা, কেউ কানে আঙ্গুল দিয়ে নমাজ

---

* জীবন চক্রবর্ত্তী, দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী (৩), বিপুল চক্রবর্ত্তী, অজিত ভট্টাচার্য্য।

† "রেখা" লঞ্চ, নারায়ণগঞ্জ—রামচন্দ্রপুর।

পড়তে আরম্ভ করেছে—সাংঘাতিক দৃশ্য। আমরা ঠাকুরের সাথে সাথে আছি আর বলছি, "ডুবেই যাবে কিনা তুমিই জান।" ঠাকুর মুচকি মুচকি হাসছেন আর হঠাৎ হঠাৎ চীৎকার করছেন, "এই আমার ডালের বড়িগুলো যেন ভিজে না যায় দেখিস্।" এদিক্ দিয়ে ঠাকুরের পকেট থেকে এমন রং বেরুচ্ছে যেন কালির দোয়াত উল্টে গেছে, অবস্থা দেখে ঠাকুর তো নিজেই অবাক্, "এ কিরে! আমার কাপড় জামা দিয়ে কি চলছে?" সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর পকেটে হাত দিয়ে তুলে দেখলেন একটা নীলের পুঁটলি—অবাক্ হলেন, পরে বুঝলেন যে মাসীমাই দিয়ে দিয়েছেন; তারপর ওটাকে ফেলে দেওয়া হলো।......আর তিনি 'ডালের বড়ি, ডালের বড়ি' চীৎকার করছেন। আশেপাশে কয়েকজন লোক ঠাকুরকে নামে চিনতো, চেহারায় চিনতে পারেনি,—"জানপ্রাণ নিয়ে টানাটানি, আপনি 'ডালের বড়ি, ডালের বড়ি' করছেন।" ঠাকুর বলছেন, "আপনিও মশায় কম নয়? এর মধ্যে আবার রাগও করছেন। আপনি রাগের বুলি তো ঠিকই চালাচ্ছেন, তবে আমার 'ডালের বড়ি' বলতে আপত্তি কি? যা নাম জানা ছিল, সবাই তো বলতে আরম্ভ করেছে।" এর মধ্যে ঠাকুর রগড়ও করছেন, "আমি আর কোন্ নাম ধরবো?" এদিক্ দিয়ে সমজ্ঞান অবস্থা—আর ঐ লোকগুলো খুব চট্ছে, মলমূত্রাদির কোন ভেদাভেদের প্রয়োজন নেই, কাপড় ঠিক নেই—এক ভীতিতে কি চেহারা করে ফেলেছে। ঠাকুরই আমাদের আশ্বাস দিলেন, "তোমাদের লঞ্চ ডুববে না। যাও, লঞ্চ ডুববে না। একটু জল নেও, আমি ঝড় থামিয়ে দিচ্ছি।" তারপর 'আতখা' যেন ঝড়টা বন্ধ হয়ে গেল, ঝড়কে যেন চড় মেরে সরিয়ে দিলেন। তারপর তাঁর পরিচয় সবাই যখন পেলো অনেকেই এসে পায়ে পড়লো। তখন তাদের মধ্যে যার যার বীরত্বের আলাপ আরম্ভ হলো, ভুলে গেল তাদের আগের অবস্থা। এর মধ্যে ঠাকুরকে সবাই বলছেন,

"আপনি না থাকলে আমরা সবাই ডুবে মরতাম।" ঠাকুর তার দাম দিচ্ছেন না। ঠাকুর বলছেন, "তোমরা নাম জপ করছো প্রকারান্তরে এই এক জাতীয় কার্য্য হয়ে যাচ্ছে। একত্রিত হয়ে ডাকছো, ফলাফল তো একটু হবেই, এর মধ্যে আমিও একটু করেছি।" আর তিনি কোন কথা বললেন না, লঞ্চ গিয়ে পাড়ে ভিড়লো। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে নেমে গেলাম।

চুয়াল্লিশ

কিছুদিন সহরে থাকার পর আমরা* গ্রামে† এসেছি। একদিন দুপুরে ঠাকুর খেতে বসেছেন, কতকটা খাওয়ার পরই 'গেল, গেল, গেল' একটা অস্বাভাবিক শব্দ করে উঠলেন। আমরা সামনেই বসে ছিলাম। বাইরেও কয়েকজন ছিল, শব্দ শুনে সবাই এগিয়ে এলো। তিনি বললেন, "একজন জলে ডুবে যাচ্ছে, তার সাড়া আমি অনুভব করলাম, তাই ঐ জাতীয় শব্দ বেরিয়ে এসেছে—রক্ষা পেয়ে গেছে।" আমরা বসে বসে শুনলাম এবং ঠাকুর তখনই নাম‡ ঠিকানা দিয়ে সব খুলে আমাদের বললেন। তিনি খাওয়ার সাথে সাথে আলাপ করছিলেন, "সে কেবলই 'ঠাকুর ঠাকুর' স্মরণ করছিলো। এই যে সাড়া—এখানে যেমন পড়ে গেলে শব্দ পেলে সবাই বেরিয়ে আসে......।" এরপর ঠাকুর মুখ ধোয়ার জন্য উঠে গেলেন। খাওয়ার পরও আলাপ করছিলেন, "যেমন আমি 'গেল গেল' শব্দ করলাম, তাতে যেমন তোরা এগিয়ে এলি—এখানে না হয় চার হাত দূরে ছিলি, না হয় বিশ হাত দূরে ছিলি—এখান থেকে না হয় সেটা চল্লিশ মাইল দূরে ছিল—যন্ত্র যদি fit করা থাকে, ঐ ব্যবধানেও আসে যায় না। আজকাল বেতারের মত

---

* হরিদাস পাল, নগেন্দ্র দে, দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী (১), অনুকূল পাল, অজিত ভট্টাচার্য্য আরো অনেকে।

† কৃষ্ণনগর, ত্রিপুরা।

‡ হরি রায়।

যন্ত্র আছে বলেই শব্দ এসে ধরা পড়ে, কিন্তু সেই শব্দ সর্ব্বত্রই বিরাজ করছে, টেনে-নেওয়ার যন্ত্রটি যদি তৈরী করা যায়, তবেই সাড়া পাওয়া যায় এবং সে-অনুযায়ী প্রতিবিধানও করা যায়। তাই জলে সে যখন ক্রমশই নীচের দিকে যাচ্ছিলো তখন 'ঠাকুর ঠাকুর' স্মরণ করছিলো, ঠিক সাথে সাথে সাড়ার যন্ত্রেও সাড়া পড়েছিলো, সঙ্গে সঙ্গে আমিও সাড়া দিয়ে উঠেছিলাম। যন্ত্র তোমাদেরও আছে—এই যন্ত্রকেই সূক্ষ্মে পরিণত করতে হবে, তখন দূরত্ব-বোধকেও 'নিকটতম বোধ' বলে মনে হবে। যারা সাড়া পাবে, তারা যেমন এগিয়ে গিয়ে তাকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করবে—ব্যবধানেও যদি সাড়া পায়, প্রতিকারের বেলায়ও সেই অনুযায়ী ক্ষমতা তাদের ভেতর সঞ্চিত থাকে—যদি দশ দিনের রাস্তাও হয়, সাড়া যদি দশ হাতের মত পায়, তোমাতে 'দশ হাত'এর বিপদে রক্ষা করার যে শক্তি রয়েছে, দূরত্বেও ঠিক সেই অনুযায়ী শক্তি তোমাদের ভেতর বর্ত্তমান—সাড়ার ব্যবধানেও সাড়ার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। আজ তোমাদের কাছে যে, অবাক্ বলে মনে হচ্ছে, আশ্চর্য্য বলে মনে হচ্ছে, অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে—মনকে ঠিক এই জাতীয় অবস্থাতে একাগ্রতাতে পরিচয় দেওয়া হচ্ছে অথবা শক্তিকে প্রকাশিত করা হচ্ছে; অস্বাভাবিক অবস্থাটা মনেরই আর একটি একাগ্রতার অবস্থা যার নাম বিক্ষিপ্ততার মধ্যে পড়েছে, কারণ যে-কোন মনের যে-কোন কঠিনতম অবস্থায় পরিণত হওয়াটা মনেরই একাগ্রতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। নামাকরণ ভেদ যা'ই হউক না কেন, বাস্তবে যারই পরিচয় দেউক না কেন, প্রকারান্তরে মনেরই সঞ্চালনের অবস্থা; তাই তোমাদের কাছে 'অস্বাভাবিক', 'অদ্ভুত', 'অবাক্'—মনকে এভাবেই গড়িয়ে নিয়েছ এ জাতীয় প্রকাশে। মহানরা মনের অবস্থাকে আর এক জাতীয় ক'রে গড়িয়ে নেন, যে-কোন কঠিনতম কার্য্যকে সহজ বোধে এনে সহজতার পরিচয় দিয়ে

যেতে থাকেন ; বাস্তবে পরিচয় দিচ্ছে দুর্গমতার দিক্ দিয়ে, আর মহান্‌রা দিচ্ছেন সহজতার দিক্ দিয়ে, প্রকারান্তরে দুটোই একাগ্রতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে, তবে কঠিনতম অবস্থার রূপটি যে প্রকাশ করছে মন হতে, সেটা হলো—আবহাওয়া হতে কঠিনতমের পরিচয় দিয়ে কঠিনতমের মধ্যে যাতে মনের অবস্থা গিয়ে দাঁড়ায় সেই জাতীয় উপদেশও এসে সম্মুখীন হয় এবং সে-জাতীয় উপদেষ্টাও এসে বহু মিলে। তাই উপদেষ্টাদের এত উপদেশ পেয়ে পেয়েও ঐ কঠিনতমের পরিচয় দিয়ে দিয়ে ওটাই সহজতার মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে, এবং সহজজাত হলে যে সবই সহজ বলে মনে হয়, 'কঠিনতম' তারই একটি নিদর্শন মাত্র। আবার যে কোন সূক্ষ্ম বস্তুকে সহজে এনে সহজভাবে প্রকাশ করিয়ে দিয়ে যে একাগ্রতার পরিচয় দিচ্ছে, মহান্‌দের নিকট ঐ অবস্থাও একটি সহজাত অবস্থা ; তাই এই সংসারের আবহাওয়াতে 'কঠিনতম,' 'অবাক্' বা 'অস্বাভাবিক'—যা-কিছু বলে যাচ্ছে এবং 'সহজাত' ব'লে, 'বিক্ষিপ্ততা' ব'লে বলাবলি করছে ; এই জাতীয় অবস্থা—আবহাওয়া ও চতুর্দ্দিকের পরিবেষ্টনী হতে এই জাতীয় অবস্থার যে সৃষ্টি, ঠিক ভাষা-জাতীয় অবস্থার মত। শিশু যে পরিস্থিতিতে থাক না কেন, সেই পরিস্থিতিতে যেমন ভাষাকে সহজলভ্য করে নেয়, কোন বই-পুঁথির বা কোন গ্রন্থাদির দরকার হয় না—গ্রন্থাদির কার্য্য করে আবহাওয়া অথবা আবেষ্টনী। আবহাওয়া হতে ঐ পরিস্থিতির ভাষাকে আয়ত্ত ক'রে স্বভাবজাত শিশু কিন্তু একাগ্রতারই পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে, সাধনারই পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে—ভাষাকে দখল ক'রে নেওয়া তার সাধনার পরিচয়। এজাতীয় শক্তি জীবজগতের সৃষ্টির সবার ভেতরই রয়েছে, কেবল পরিবেষ্টন-অনুযায়ী যে-উপদেশ কার্য্যকরী হয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকের ভেতরে, সেই জাতীয় রূপই প্রকারান্তরে দিয়ে যাচ্ছে এবং সেটাকেই সহজ বলে বোধগম্য হচ্ছে—

প্রকারান্তরে সবই সহজ, সবই কঠিন। তাই এসমস্ত অসফলতা, বিক্ষিপ্ততা, কঠিনতমতা এও যেন একজাতীয় ভাষা-মাফিক কার্য্য ক'রে যাচ্ছে—ওটা যেন মনোজগতের ভাষা মাত্র; চতুর্দ্দিকের যে জাতীয় মনের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে এবং তারই influence তার ভেতরে কার্য্যকরী হয়ে যাচ্ছে; সাধনা এমনই জিনিষ, সব-কিছুই যে গ্রহণ ক'রে ক'রে সে-জাতীয় শক্তির প্রকাশ করে যাচ্ছে। আর যাঁরা সমস্ত পরিবেষ্টনীর শক্তিকে যে-কোন মুহূর্ত্তে আয়ত্তে এনে যে-কোন ব্যক্তিকে যে-কোন শক্তির অধিকারী ক'রে দিতে পারেন ঐ জাতীয় 'অধিকৃত' ক'রেই তাঁরা আবার বাস্তবে নানাজনের ভেতর দিয়ে আর এক শক্তির বিকাশ করে যাচ্ছেন। পরিবেষ্টনের কোন শক্তি তাঁদের সরিয়ে দিতে পারছে না, তাঁদের ইচ্ছাধীনে সমস্ত শক্তিকে আয়ত্ত ক'রে ইচ্ছামত বিকাশ করে যাচ্ছেন—সেটাও আবার আবহাওয়া হতেই এসেছে, প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী আসছে, প্রাকৃতিক সমস্ত শক্তি তাতে যে বিদ্যমান রয়েছে। তাঁরা এই বিশ্ব-প্রকৃতির যে-কোন বস্তুতে মনোনিবেশ ক'রে সেই বস্তুর তত্ত্বকে বুঝে নিতে পারেন—তাঁদের কেউ বলে সর্ব্বজ্ঞ, কেউ বলে অন্তর্য্যামী, কেউ বলে শক্তিমান্—সবাই যে একাগ্রতার পরিচয়ই দিয়ে যাচ্ছেন; তাই এমন শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে, যা দ্বারা সব বস্তুকে জানা যায়—সাধনা সেখানেই। মহান্‌রা ঐ জাতীয় অবস্থায় বিরাজ করেন বলেই পরিবেষ্টকরা তাঁদের দাম দিয়ে এসেছে, প্রকারান্তরে দাম কিন্তু সবারই রয়েছে, বিকাশ যে-দিক দিয়েই হউক না কেন, কেবল বুঝিয়ে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া—তবেই সঞ্চিত শক্তি প্রকাশিত হবে।" ঠাকুর এভাবে আমাদের বুঝালেন, তিনি আরো বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু লোকের ভিড় খুব বেশী হয়ে যাওয়াতে তিনি কথা সেখানেই বন্ধ করলেন।

পঁয়তাল্লিশ

একদিন দুপুরে ঠাকুরকে বাতাস দিচ্ছি*, আরো ভাইয়েরা† বসে‡ আছে। ঠাকুর মাঝে মাঝে দু'একটা কথা বলছেন, আবার চোখ বুজছেন— কি যেন ভাবছিলেন। এমন সময় দু'জন ভদ্রলোক§ এসে জিজ্ঞেস করছেন, "এখানে কোন মহাপুরুষ থাকেন কি ?" আমরা বললাম, "হ্যাঁ, আছেন।" তাঁরা ভেতরে এলেন এবং ভেতরে এসে হাত জোড় ক'রে প্রণাম করলেন। বসতে বলা হলো, তাঁরা বসলেন। একজনের বয়স আশীর কোঠায়, এসেই ঠাকুরের দিকে চেয়ে আছেন, আর একজন মাথা নত ক'রে বসে আছেন— কোনরকম কোন শব্দ নেই। ঠাকুর চোখ বুজে মুচকি মুচকি হাসছেন আর আমাদের বলছেন, "এরা যেন নদীতে জাল খেয়াচ্ছে, খেয়াতে খেয়াতে যদি বেঁধে পড়ে কিছু, তবেই এদের লাভ—সেভাবেই এরা চলছে।" ভাইদের মধ্যে দু'তিনজন লিখছে, আমি বাতাস দিচ্ছি। হঠাৎ ঠাকুর ওদের বলে উঠলেন, "হলো তো ? জালে কিছু পড়েছে, না 'আর্‌জালা'ই পেলে ?"—কোন শব্দ নেই। কতক্ষণ পরে বৃদ্ধ চীৎকার ক'রে উঠেছেন, "পেয়েছি, পেয়েছিরে, পেয়েছি !" সঙ্গে

---

* শান্তিদাস মজুমদার।

† আশু মজুমদার, গঙ্গাধর শাহা, বলাই পাল, সতীশ পাল, বি-এন্‌-রায়, রবি ঘোষ, নৃপেন রায়, ফণী ঘোষ, বারীন ঘোষ, অজিত ভট্টাচার্য্য।

‡ স্বামীবাগ, ঢাকা।

§ অশ্বিনী চ্যাটার্জ্জি, চিন্তাহরণ মাষ্টার।

সঙ্গে ঠাকুর আমাদের বললেন, "জানিস্ একটা যন্ত্র এনেছে সাথে, ঐ কাঁটাটি তখনই নড়ে, যখন কোন magnet থাকে। মনে হয় magnet কাঁটাকে টান দিয়েছে, তাই চীৎকার ক'রে উঠেছে—এইটুকু সে এত বয়সে লাভ করেছে। এখানে অনেককেই তো দেখলাম, এর মধ্যে কিছু ওর ভেতর উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। এখানকার ভাব-প্রবণতার কথা বলছিরে, তত্ত্ব-বিষয়ের দিকে দেখতে গেলে অন্য বুঝে আসতে হয়।" এ-কথাগুলো তিনি আমাদের বলছেন—ওরাও বুঝুক সেই হিসাবে যেন বলে যাচ্ছেন আমাদের দিকে চে'য়ে। তিনি সরলভাবে সব সময় সব-কিছু বলে যান, নিজের কথাও বলেন, অন্যের কথাও বলেন। এর পরই বলছেন, "দেখ, এই যে সরলভাবে বলছি, 'magnet টেনে নিচ্ছে কাঁটাটিকে'—এ বাজারে এ-কথা বিক্রি হয় না, 'অহং' ভাবের মনে ক'রে কিন্তু; সত্য জিনিষটাও আবহাওয়াতে লুকিয়ে রাখতে হয়। তাই এই যে 'magnet' বললাম, অন্যত্র হলে চুপ ক'রে থাকতে হতো। দেশের পরিস্থিতিতে সত্যকেও গোপন রাখতে হতো, তবে আবহাওয়ার সাথে সাথে সব-কিছু চালিয়ে নিতে হবে।" ঠাকুর প্রত্যেকটি ব্যাপারেই এক-একটি কথা বলতেন—সমাধান ক'রে দিতেন যাতে কারো কোন সমস্যা না উঠে। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতেন কার মনে কি সমস্যা হতো না হতো—টুক্ ক'রে বলে দিতেন। এরপর বৃদ্ধ পায়ে পড়লেন—তাঁরা দুজনেই পায়ে পড়লেন। আর যে একজন সাথী, উনি মনে হয় বৃদ্ধের ভক্ত, তিনি বৃদ্ধের উপর নির্ভর ক'রে আছেন। বৃদ্ধ যখন পায়ে পড়লেন, সাথীটি হয়ে গেলেন সাষ্টাঙ্গ। তারপর একথা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, উনি তাই বললেন। বৃদ্ধ ঠাকুরকে বললেন, "বাবা, তুমি সবই তো বুঝে নিয়েছ; আমার কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য যাহা বিবেচ্য মনে কর, তুমি তার ব্যবস্থা কর।" এই বৃদ্ধকে এক মহাপুরুষ* কোন-একটা মন্ত্রের অর্দ্ধেক দিয়ে যান এবং

* শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী।

তিনি বলে যান যে, পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরে এই মন্ত্রটি পূর্ণ করবেন একজন মহান্ ব্যক্তি এসে। ঠাকুর নিজেই বললেন, "তোর অর্দ্ধ-চন্দ্রকে পূর্ণ করবি কবে?" বৃদ্ধ বললেন, "সাগর যখন আছে, কিছু দিলেই তো পূর্ণ হয়ে যায়।" ঠাকুর বললেন, "যাও, স্নান ক'রে এসো।" দুজনে স্নান ক'রে এলেন, আমরা আসন, ফুল সাজিয়ে দিলাম, ঠাকুর তাদের দীক্ষিত করলেন। এরপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বৃদ্ধ গদ্‌গদ ভাবে আমাদের জানালেন যে ঠাকুর তাকে দীক্ষিত করার আগে 'সেই' অর্দ্ধেক মন্ত্র বলে দিয়ে তারপর পূর্ণমন্ত্র নিজেই দিয়ে দিয়েছেন। ঠাকুর এভাবে সব-কিছুই ক'রে যাচ্ছেন—প্রত্যেকটা অস্বাভাবিক বিষয়কে এমনভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, উপমা দিয়ে এমন সুন্দর সহজভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, '······আমি পাখার বাতাস দিচ্ছি'—এও বড় কম নয়; সমতুল্য ক'রে সব-কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছেন, "দেখ, আমি এটা করতে পারছি, তুই ওটা করতে পারছিস।" আমরাও মহাখুশিতে আছি, 'তবে তো অনেকটা এগিয়ে গেছি।'—যেমন আমাদের দেশে 'কানাহোলা'য় ধরতো—সারারাত পরিশ্রম হচ্ছে, নৌকাও চলছে, মনে করলাম অনেক দূর বুঝি এগিয়ে এসেছি—ভোরবেলায় দেখলাম একজায়গায়ই ঘুরছি। তিনি সহজ করলে কি হবে, ব্যাপারটা তো লক্ষ্য করে যাচ্ছি। তিনি কোন powerএরই দাম দিতেন না, সহজভাবে আমাদের নিয়ে নানা আলোচনা করতেন। বৃদ্ধ বললেন, "আমি তো কিছু নিয়ে আসিনি।" ফুলও আমরাই দিয়েছিলাম, শুধু যাওয়ার ভাড়া-মাত্র তাঁর সাথে ছিল, ফুল কিনতে হলে ফিরে যাওয়ার ভাড়াও থাকতো না। বৃদ্ধ দুঃখ করছেন, "আমি যে কিছু দিতে পারলাম না।" ঠাকুর রগড় করছেন, "তবে তো ভারী অসুবিধার কথা হলো, এখন কি করা যায়? আবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর, বল, 'মনরূপ দক্ষিণা আমি দিয়ে গেলাম।' পূজোতে আছে, 'মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ, কাঞ্চনাভাবে মনং দদ্যাৎ।' দেবতা যদি তাতেই খুশী হন, আমি

তোমার মনরূপ দক্ষিণা পেয়ে খুশী না হওয়ার কি?" বৃদ্ধ খুব খুশী হয়ে অশ্রুপাত ক'রে চলে গেলেন। তারপর আরো বহুলোক এসে পড়লো। ঠাকুর আবার তাদের নিয়ে আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

* * *

দৈনন্দিন এরকম বহু ঘটনাই চলছে, কত আর লেখা যায়, যতটা সম্ভব আমরা লিখে যাচ্ছি। এক ভদ্রমহিলা একটি বাচ্চা নিয়ে এক ভদ্রলোকের সাথে এসেছে*—বাচ্চাটিকে এনে ঠাকুরের পায়ে ফেলে দিয়েছে। একটা পাখীকে আগুনে সেকা দিয়ে তুলে আনলে যেমন চেহারা হয়, বাচ্চাটিকে দেখতে ঠিক তেমনি লাগছিলো। ঠাকুর একটু রগড় ক'রে বললেন, "এটা আছে তো—না নেই?" শিশুর বাপ-মা হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন, "একটি? না আরো আছে?" ঠাকুর সাধারণতঃ গুরুতর বিষয়কে একটু সহজ ক'রে বলতেন।

ওরা বললো, "এই প্রথম—বহু আকাঙ্খার পরে এটা হয়েছে।"

ঠাকুর বললেন, "এটাকে বাঁচাতে চাস্, না ভালভাবে চলে যাক—সেটা চাস্?"

ওরা একটু হাসিকান্নার ভাব নিয়ে বলল, "আমাদের আর কেউ নেই, ও মরে গেলে আমরাও মরে যাবো—ও বেঁচে উঠুক এটাই চাই।" অনেক অনুনয়বিনয়পূর্ণ কথা আরম্ভ করেছে। ঠাকুর বললেন, "এটাকে যে বাঁচাতে চাচ্ছিস, প্রকারান্তরে এটাকে মৃত্যুর পথেই যে এগিয়ে দিচ্ছিস্।

---

* বি-এল্-রায় ও তার স্ত্রী।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ :—বিশ্বেশ্বর দাশ, ভূপেন রায়, রবি ঘোষ, কালিদাস ব্যানার্জ্জি, অনিল ঘোষ, মনোরঞ্জন সেন, দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী(৩), অজিত ভট্টাচার্য্য, শান্তিদাস মজুমদার, মিলি রায়, ডলি রায়, চাঁপা রায়।

বড় হবে, বিয়ে দিবি—কত আকাঙ্খা দৈনন্দিন প্রবল হচ্ছে ওর উপর দিয়ে, যতই বছরের পর বছর চলে যাবে, ততই তো শ্মশানের দিকে এগিয়ে যাবে। তবে তো প্রকারান্তরে তুই ওর শ্মশানের কামনাই করছিস্, বাঁচাবার জন্য চাইলি কোথায়? আমি যদি সেই আশীর্ব্বাদ করি, তবে যে একই মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাওয়ার আশীর্ব্বাদ করছি—তবে কি এই চাস? বল্-যে, 'শ্মশানে যেন পঞ্চাশ-ষাট্ বৎসর পরে যায়, সেই আশীর্ব্বাদ করুন'—আমার 'রায়' তো সেইভাবে দিতে হবে।" সবার মধ্যে বেশ একটু হাসির রোল পড়ে গেল। ঠাকুর আমাদের একজনকে আদেশ দিলেন, "এক গামলা গরম জল নিয়ে আয়।" গরম জল আনা হলো বেশ ধোঁয়া উঠছে। ঠাকুর ওর মা'কে আদেশ করলেন, "গরম জলের মধ্যে শিশুটিকে ডুবিয়ে রাখ।" সবাই তাকিয়ে আছি, আশ্চর্য্য হইনি। মা শিশুটিকে তো নিলো, গরমজলে একটু আঙ্গুল দিয়ে দেখছে। ঠাকুর বলছেন, "তুমি রাখ।" তারপর ওর বাপকে বললেন, "ওকে গরম জলে ডুবিয়ে দাও।" বাপ বললো, "গরম জলে? দেব? দেব? দেব?"—তিনচারবার বলেছে। ঠাকুর বললেন, "তুমি রাখ।" তারপর আমাদের ভেতর থেকে একজনকে বললেন, "গরম জলে দিয়ে দাও।" আমরা একেবারে গরম জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছি। দূর হতে দেখলে 'কসাই' বলবে সন্দেহ নেই। ঠাকুরের বিভূতি দেখতে দেখতে আমাদের এমনি বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে দ্বিধাবোধ কোন কাজেই হতো না, তাই গরম জলে ওকে ডোবাতে চিন্তা হয়নি। জলে থেকে শিশুটি বেশ খেলা করছে। এদিকে জল থেকে ধোঁয়াও উঠছে—বাপ-মা হা ক'রে তাকিয়ে আছে। তারপর ঠাকুর বললেন, "তোমার সন্তান আর দুটি বছর ভুগবে, পরে ভাল হয়ে যাবে, তার কারণ, আমার কথা বলার সাথে সাথে একজন জল পরীক্ষা করতে গেছ, আর একজন পুনঃপুনঃ জিজ্ঞেস করে পরীক্ষা করেছ

জলে না দিয়ে পারা যায় কিনা। তোমাদের আর কিছুদিন ভোগাবে তারপর ভাল হয়ে যাবে।" ওরা আশীর্ব্বাদ নিয়ে খুশী হয়ে চলে গেল।

* * *

একদিন সন্ধ্যায় ঠাকুর একটি 'চক্র' সম্বন্ধে আলাপ করছিলেন—চক্রের প্রয়োজনীয়তা, তাতে মনোনিবেশ করলে কি হয়, যে শক্তি রয়েছে সে শক্তি কি ভাবে বিকশিত হয় চক্রের মধ্য দিয়ে। খুব তাড়াতাড়ি বলছিলেন ব'লে এ-প্রসঙ্গ আর আমরা লিখতে পারিনি, বুঝে নিয়েছিলেম। এর মধ্যে ঐ 'কঙ্কাল-সার' শিশুর বাপ-মা বহু ফলফুল নিয়ে উপস্থিত হলো। ঠাকুর সেগুলো স্পর্শ ক'রে দিলেন এবং সবার মধ্যে বিতরণ ক'রে দিতে বললেন, কয়েকটি ফুল কেবল হাতে রাখলেন। তারপর ওদের বললেন, "তোমরা তো ভয় পেয়েছিলে গরম জলে শিশুকে দিতে, তাতো স্বাভাবিক—তোমরা নূতন। দেখ, উত্তপ্ত জায়গায় যদি সমজাতীয় উত্তপ্ত শরীর হয়, সেই গরমকে বোধ করা যায় না, তার উপর হলে আবার শীতও বোধ হয়। উত্তাপ যখন স্বভাবজাত রয়েছে আমাদের ভেতরে, মনঃশক্তির ইচ্ছাতে ও তার স্পর্শে magnetএর মত কার্য্যকরী হয় অপরেতে—magnetএ লৌহ কিংবা ইস্পাত ঘষলে তা'ও magnetএ পরিণত হয়ে যায়। ঠিক যে-কোন শক্তিমানের ইচ্ছাধীনে যে-কোন সময় রূপ ও গুণকে পরিবর্ত্তনে আনা যেমন সম্ভব—কি উষ্ণ, কি শীতল, যে-কোন রূপের ও গুণের বেলায় একই অবস্থা, তাই হয়েছিল এই শিশুটির বেলায়। তোমাদের যখন জ্বর হয়, high temperature হয়, সেই অসুস্থতার ভেতর দিয়ে পাও—'গ্রীষ্মদেশে চৈত্রমাসের তাপকেও ঠাণ্ডায় পরিণত ক'রে ফেলে।' সুতরাং সেই অসুস্থতায় অসুস্থতার যে-forceটা তোমায় এমনি ক'রে দখল ক'রে ফেলেছে, সেই তাপের দিকেই সেই forceটা প্রযোজ্য হয়ে যাচ্ছে সেই স্বভাবজাত উত্তাপকে বৃদ্ধি করতে।

তাই যে-জিনিষ আছে কিংবা রয়েছে, মনঃশক্তিতে সর্ব্বাবস্থায় তা'ই বৃদ্ধি ক'রে সেই 'আছে'-শক্তির চরম বিকাশে পরিণত করতে হয়—এর বেলায়ও ঠিক তাই হয়েছে। সুতরাং গরম জল ওর নিকট ঠাণ্ডা জলে পরিণত হয়েছিল।" ঠাকুর ঐখানেই হঠাৎ থেমে গেলেন, তাঁর কয়েকজন আত্মীয়স্বজন আসাতে তাঁদের আদর-অভ্যর্থনার দিকে নজর দিলেন।

——

ছেচল্লিশ

গ্রামে* আছি। সেদিন নিজেরা নিজেরা একটা ছোটখাট উৎসবের মত করছিলাম। মাঝামাঝি রকম লোকজনের সমাবেশ হয়েছিলো। ঠাকুর গ্রামে যাওয়াতে চতুর্দ্দিকে 'তিনি এসেছেন' একটা রব পড়ে গিয়েছিলো। এর মধ্যে নৌকাযোগে একজন ভদ্রলোক† এসে উপস্থিত হলো, তার সঙ্গে আরো তিন-চারজন লোক‡ ছিলো। একজন পেটে হাত দিয়ে, বাঁকা হয়ে ঠাকুরের কাছে গিয়ে প্রণাম করে বসলো। ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, "কি হয়েছে?" সে সঙ্গে-সঙ্গে তার মনের কথা জানালো। বহুদিন যাবৎ সে ব্যথা-রোগে ভুগছে, বহু টাকা-পয়সা খরচ করেছে এর জন্য। কোনটাতেই কিছু সুবিধে হয়নি, তাই নাম শুনে এসেছে একটু প্রতিকার কিছু হয় কিনা। ঠাকুর বললেন, "তোমরা ঐ দিকে বস, আমি পরে ডাকছি।" অন্য কাজ যা বাকী ছিল সেরে নেওয়া হলো। তারপর তিনি বললেন, "দেখ, সাধারণতঃ এখানকার 'গুরু' 'মহান্‌রা' অনেকেই প্রতিকার করেন হোম, যাগযজ্ঞের ভেতর দিয়ে—এর বহু টাকা এভাবে ব্যয় হয়েছে, হতে পারে তাতে প্রতিকার, বস্তুতঃ এজন্য এসমস্ত মূল্যের প্রয়োজন হয় না।" তিনি আমাদের§ বললেন, "দেখি ওর সঙ্গে দর কষাকষি ক'রে কতটুকু ওঠানো যায়। ওর সঙ্গে বেশ

---

* বিক্রমপুর।

† সতীশ সাহা।

‡ শচীন্দ্র দাস, কালীপদ দে, জিতেন ঘোষ।

§ হরিদাস পাল, বিধু পাল, মনু দাস, অজিত ভট্টাচার্য্য আরো অনেকে।

একটু রগড়পূর্ণ কথা বলবো, দেখি কতটুকু ও নামে কথাতে।” ঠাকুর সাধারণতঃ গুরুগম্ভীরবিষয়গুলো খুব সহজ ক'রে ক'রে এবং একটু বেশ রগড় ক'রে ক'রে আমাদের বুঝিয়ে দিতেন—এর মধ্যে হাস্যও আছে, স্ফূর্ত্তিও আছে আবার গুরুত্বও আছে। তিনি স্বাভাবিক মতে সবার সঙ্গে মিশে মিশে, সবার মত চেহারা দেখিয়ে তাঁর কাজ করিয়ে নিতেন আমাদের দিয়ে—তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্য প্রতিষ্ঠা, সত্যে যে শক্তি রয়েছে, সে শক্তিকে বিকাশ। তিনি ঐ রোগীকে ডাকলেন, রোগী আবার প্রণাম করে বসলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি যে ভাল হতে চাও, কত টাকা খরচ করেছ আর কতটা খরচ করতে পারবে?” সে বললো, “আমি যদি সেরে যাই, যতটা প্রয়োজন দিতে চেষ্টা করবো।” ঠাকুর বললেন, “তুমি প্রতিকারের জন্য কি করেছ?” সে বললো, “সাধু-সন্ন্যাসী, পূজো-পার্ব্বণ, ডাক্তার সবই লাগিয়েছি—হাজার-হাজার টাকা বেরিয়ে গেছে।” ঠাকুর বললেন, “যদি ভাল হও, যত টাকা ব্যয় করেছ, তত টাকা দিতে পারবে?” সে একটু চিন্তা করে বললো, “আমি ভাল হলে দিতে পারবো, প্রায় নয়-দশ হাজার টাকা খরচ হয়েছে।” ঠাকুর বললেন, “আগে যদি কিছু প্রয়োজন হয় দিতে পারবে?” সে বললো, “দিয়েই যখন এসেছি, শেষ চিকিৎসা না হয় দেখবো।” ঠাকুর বললেন, “প্রথমতঃ বারো শত টাকার যদি প্রয়োজন হয়? পরে না হয় বাকিটা দিয়ে যেও।” সে একটু চিন্তা ক'রে রাজী হয়ে গেল। ঠাকুর আমাদের এক গ্লাস জল আনতে বললেন। আমাদের মধ্যে একজন এক গ্লাস জল নিয়ে এলো, ঠাকুর হাতের একটা আঙ্গুল জলে ডুবিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, “এ জলটুকু খেয়ে নেও, তবেই তুমি ভাল হয়ে যাবে।” সে গ্লাসের জল খেয়ে ফেললো, তারপর প্রণাম করে চলে গেল।

তারপর দিনই সে এসে উপস্থিত, ঠাকুরকে জানালো যে

বাড়ী যেতে যেতেই তার রোগ উপশম হয়ে গেছে। রোগী একটা 'চেক্' ঠাকুরের পায়ে দিয়ে প্রণাম করলো। 'চেক্'টা হাতে নিয়ে ঠাকুর বললেন, "দেখ তো, এ দেশীয় রোজগার! তবে আমি একটা কিছু তো করেছি, ফলও তো কিছু হয়েছে—প্রাপ্যের দিক্ দিয়ে আমি ঠিকই আছি, তবে এটা নেওয়াকে ছলনার মধ্যে গণ্য করি; তার কারণ, আমি আমার একাগ্রতা বা মনঃশক্তি ব্যয় করেছি এর ওপর; সাধারণতঃ যে বিক্ষিপ্ততার মধ্যে মন বিরাজ করতে থাকে তাতে যতটুকুনু ব্যয়, একজন শক্তিমানের পক্ষে এই জাতীয় উপশম করিয়ে দেওয়া ততটুকুই ব্যয়—তাঁর কাছে ইহাই সাধারণ, তবে এই নেওয়াটাই হলো ছল। অর্থের প্রয়োজন আমার যথেষ্ট আছে এখানে; তার মাত্রাকে বাড়িয়ে দিয়ে প্রবঞ্চনাকে অভ্যর্থনা করার কোন মানে নেই। আমি তার কাছে নতি স্বীকার করতে পারবো না, সুতরাং এই 'চেক্' আমি ছিঁড়ে ফেলে দিলাম।" ব'লে 'চেক্'টা ছিঁড়ে রোগীকে দিয়ে দিলেন। এই কথাগুলো শুনে রোগী অবাক্ হয়ে যাচ্ছিলো, এবং 'চেক্' ছেঁড়াতে অবাকের মাত্রা বেড়ে গিয়ে অতি আশ্চর্য্যে দাঁড়িয়েছিলো। ঠাকুর সেটা বুঝে তাকে বললেন, "তোমাকে সারিয়ে দিয়ে যেই তৃপ্তি পাচ্ছি, তার বিনিময়ে তুমি তো আমার অপকার করতে পার না।" তখন রোগী কম্পমান হয়ে বললো, "আমি কি কোন অপরাধ করেছি?" ঠাকুর বললেন, "তোমার 'চেক্' যদি গ্রহণ করি, তবে আমার অপরাধের জন্য তুমি-যে দায়ী—এজন্য তুমি অপরাধী, সুতরাং তোমার এ সহযোগিতা আমার অপকারে এনেছো—এটাই বুঝলাম। আমি তোমার সঙ্গে আগাগোড়া খেলা করছিলাম। ওদের আমি জানিয়ে দিলাম—বাস্তবে, সমাজে চতুরালি ব্যবহার করলে কতটা নামা যায় ও নামানো যায়, প্রকারান্তরে অর্থ-উপায়ের বন্দোবস্ত করা যায়, তা'ই দেখবার জন্য ঐ জাতীয় কথোপকথন তোমার সঙ্গে করেছিলাম।

আমি দেখলাম—সম্মানে 'গুরুতা'র দিক্ দিয়ে বজায় রাখা যায়, মনের দিক্ দিয়ে বজায় রেখে প্রকারান্তরে নিজের রোজগারকেও ঠিক রেখে বাজিমাত করে চালিয়ে নেওয়া যায়। আর ভালও যদি না করতে পারতাম তোমায়, বারো'শত টাকা তো নেওয়াই হতো, তারপর না হয় অভিশপ্ত ব'লে তোমায় ছেড়ে দেওয়া হতো—মন্দ কি এরকম যদি কিছু কিছু করা যায়, সব দিক্ দিয়েই ঠিক রয়ে গেল। যতটুকু আবহাওয়াতে বুঝলাম এরকম ক'রেও অনেকে রোজগার করে। আমার বক্তব্য, বুঝে শুনে আমার অভাব থাকা সত্ত্বেও আমি এ-কার্য্যে রত হলাম না, আমি কেন পারলাম না ? আমার conscience কেন আঘাত দিলো ? কোন অবস্থাতে তো আমি নিজেকে ব্যয়িত করতে পারলেম না, যত চেষ্টাই করি না কেন। একটা প্রবঞ্চনা বা ছলনার মাঝে মুখোশটা বড় হলে তো হবে না, নিজের কাছে নিজের ফাঁকিই যে ধরা পড়ে, তাই জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচারে শক্তি এসে প্রতিফলিত হয়ে আবর্জ্জনা জাতীয়কে দূরীভূত করে সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। শক্তির তার জন্যই প্রয়োজনীয়তা এবং সে-শক্তিকেই বাড়াতে হবে ; যখন সত্যে প্রতিষ্ঠিত হবে, তখনই সত্য বস্তুর তত্ত্বকে বুঝে নিতে পারবে।" রোগী ভদ্রলোক সমস্ত বুঝে, চোখের জল ফেলে ঠাকুরের কাছে ক্ষমা চেয়ে চলে গেল, বলে গেল, "আমি বহু ঘুরেছি, কিন্তু আমি ভাবিনি, দেখিনি, চিন্তা করতে পারিনি যে, এ পৃথিবীতে এরকম কেউ আছেন। তিনি আমার কাছে যা চাইতেন, তাঁকে আমি তাই দিতুম, তার কারণ, আমার কাছে রোগের অসহ্য যন্ত্রনার চেয়ে কিছুই-যে বড় নয়, তাই টাকা-পয়সা আমার কাছে নিতান্ত তুচ্ছ বলেই মনে হয়েছিলো, তাই রোগের উপশমের জন্য আমি সব-কিছুই দিতে রাজী হয়েছিলাম।" ঠাকুর বললেন, "দেখলি তো, এ দিক্‌কার অবস্থা !"

সাতচল্লিশ

নিজেদের একটা ছোটখাট উৎসব-উপলক্ষে আমরা* ঠাকুরকে এক জায়গায়† নিয়ে গেলাম। উৎসব শেষ হয়ে যাওয়ার পরও আমরা ঠাকুরকে নিয়ে সেখানেই কিছুদিন কাটালাম। ক'দিন ধরে তেমন বাইরের লোক নেই, তাই তিনি আমাদের নিয়ে বেশ একটু তত্ত্ব আলাপ করছেন। আমরাও সম্ভবমত লিখে যাচ্ছি এবং অনেক বিষয়ই শুধু বুঝে যাচ্ছি। অল্প বয়সেই ঠাকুরের এত প্রতিষ্ঠা হতে আরম্ভ হলো যে, তা অনেকেরই চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ালো, এবং সে-বয়স হতেই তিনি সব সমস্যার সমাধান করতেন ও শাস্ত্রের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। অনেকেরই গা জ্বালা করতে লাগলো এবং অল্প বয়সে এত যশ, এত নাম, এত সুনাম শুনে কোন কোন সম্প্রদায় তাঁর পেছনে লাগতে সুরু করলো এবং অনেক শত্রুও তাঁর পেছনে এমনিভাবে লাগলো। ঠাকুরের তখন অল্প বয়স হলেও হাবভাব তিনি সবই বুঝতেন। আমাদের বলতেন, "দেখ, আমার পেছনে শত্রু লেগেছে আমাকে নির্য্যাতন করার জন্য, আমাকে আক্রমণ করার জন্য।" একদিন ওদের তরফ থেকে কিছু লোকজন এসেছিলো। ঠাকুর

---

* জে-সি-দাশ, শান্তি দাস মজুমদার, অমরেন্দ্র দাশ, ভুপেন্দ্রলাল রায়, এন্ মল্লিক আরো অনেকে।

† নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

তাদের বললেন, "যদি যুদ্ধ করতে হয় বীরের মত যুদ্ধ সামনা-সামনি কর, পেছন থেকে আক্রমণ করাটা শত্রুতা উদ্ধার করা ছাড়া কিছুই নয়। নির্য্যাতন করতে হয়, সামনে এসো—সেটাই সুন্দর।" শত্রুপক্ষ বহুরকম শত্রুতা সাধন করার চেষ্টা করছিলো, তবে কিছুই করতে পারেনি, শেষ পর্য্যন্ত নিজেরাই ভাগাভাগি হয়ে বেশীর ভাগ ঠাকুরের নিকট এসে মাথা নত করলো। আমরা প্রায়ই বলতাম, "ঠাকুর, তোমার মতবাদটা লিখ, এতে সবারই কল্যাণ হবে, জগতেরও কল্যাণ হবে।" ঠাকুর বললেন, "কি লিখবো, আমার ভাষায় দখল নেই, লেখার অসুবিধে হবে। আমি যা বলবো, তাই তোরা বসে বসে ভাল ক'রে বুঝে নিস্, তবেই হবে; আর কিছু note তো করছিসই।" এর মধ্যে একজন পণ্ডিত-ব্যক্তি এসে উপস্থিত হলেন। ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর অনেক তর্কবিতর্ক হলো, ঠাকুর খুব মিঠিয়ে মিঠিয়ে আলাপ করলেন। ঐ পণ্ডিত শাস্ত্রগ্রন্থ হতে 'নানারকম' বলতে আরম্ভ করলেন, অনর্গল শ্লোক বলে যাচ্ছেন, ঠাকুরও তাঁর প্রত্যেকটির উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। পণ্ডিত খুব নারায়ণের ভক্ত, তিনি তাঁর আরাধ্য দেবতার সম্বন্ধে খুব আলাপ করছেন; প্রথমে যে আরাধ্যের দরকার হয় সে-সম্বন্ধে বার বার বলছেন, এবং ঠাকুরের মতবাদ শুনে উনি জিজ্ঞেস করছেন, "প্রথম অবস্থায় তা কি সম্ভব?" ঠাকুর তাঁর উত্তর দিলেন, "আপনার আরাধ্য বস্তু সম্বন্ধে যে-সমস্ত আলাপ করলেন, সাধনাতে ব্যাঘাত কোনটাতেই হয় না; তবে ব্যাঘাত সেখানেই হচ্ছে, যেখানে শিলা কেবল শিলাই রয়ে যাচ্ছে। আপনি যে-সমস্ত আলাপ করলেন, সেগুলো ঠিক সেই জাতীয়ই—প্রাণ নেই। যদি বস্তুতঃ শিলাকে প্রাণ দিয়ে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন, অথবা সে-বস্তুর তত্ত্বকে বুঝে নিতে পারতেন, তবে আপনিও আপনাকে বুঝতে পারতেন।

শিলাটি আপনার কি কার্য্য করছে? Mirrorএর কার্য্য করছে—তখনই তো miraculous change; ভেতরে যখন আয়না থাকে, ওর দিকে চেয়ে আপনিই তো সজ্জিত হন, শালগ্রামের ভেতর যে বিশ্বরূপ কল্পনা করছেন, যে বিরাট রূপকে কল্পনা করছেন, তা আপনার ভেতর প্রতিষ্ঠা করবার জন্যই তো? না, শালগ্রামকে মুছে মুছে 'শিলাত্ব'কে কেবল অস্তিত্বহীন করতে চেষ্টা করছেন; এর যে পূজো এবং পদ্ধতি এবং যা-কিছু কার্য্যকলাপ, নিজেকে গড়বার জন্য নিজেকে বুঝবার জন্য তো। কিন্তু আপনার হাবভাবে তো তা প্রকাশ পাচ্ছে না—আপনি ঐ 'দেখা' হতে যে বঞ্চিত হয়ে আছেন; শিলা যেমন wallএর কাজ করে, আপনিও আপনার ভেতর সেই জাতীয় সৃষ্টি ক'রে আটক অবস্থায় রয়েছেন, তাই বন্ধ ঘরে চীৎকার করার মত যে চীৎকার করছেন, সে চীৎকারও তো মনে হয় নিজে শুনতে পাচ্ছেন না—আপনি তো গুলিয়ে যাচ্ছেন; বন্ধ ঘরে চীৎকার—নিজের আওয়াজ, নিজের কথাবার্ত্তা নিজের কাছেই বিকট বলে মনে হচ্ছে। আর আপনার কার্য্যকলাপে আপনিই-যে আপনার কাছে ধরা পড়ে রয়েছেন—ধরা পড়ছেন এবং গুলিয়ে যাচ্ছেন, আবার মুক্ত বায়ু সেবনের জন্য হাহাকারও করছেন; আর বিশ্বরূপকে পূজো করতে গিয়ে যে-রূপ বেরুচ্ছে আপনার ভেতর হতে, তার প্রাথমিক পরিচয় দিচ্ছেন বাইরের আবরণে,—কণ্ঠে মালা, শিখা, তিলক—এতদিনের সাধনার পর এই কী তার প্রকাশ! প্রয়োজন তার যথেষ্ট রয়েছে, সাবধানতা যতদিন আছে; কিন্তু এও যখন সহজ হয়ে যাবে, তখন সাবধান স্বয়ং 'সাবধানহীন' হয়ে যাবে, তখন গতিও সেই অনুযায়ী হয়ে যাবে, 'বেহুঁশ' তখন এসে occupy করবে। এই যে পরিচয়, একি বেহুঁশতা, না সাবধানতা? জানেন তো রক্ষক যদি ভক্ষক হয়, তবে বড় মারাত্মক হয়। উপমায় আছে—সরিষা দিয়ে ভূত খেদায়; সরিষাই যদি ভূত হয়ে বসে, তখন-

যে মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। আজ আপনার গতিবিধি কথাবার্ত্তা এমন একটা অভিনয়ের মধ্যে এসে দাঁড়াচ্ছে, যেন তার পেছনে 'গার্ড' নেই আর—আর 'গার্ড' থাকলেও আপনারই ইন্ধন যোগাচ্ছে। তাই আপনি সহজভাবে এই কণ্ঠি এবং 'আনুষঙ্গিক' রাখা সত্ত্বেও নির্ভীকচিত্তে এদেরে ব্যবহার করে যাচ্ছেন। ব্যবহারগুলো হচ্ছে এই, অনুষ্ঠান আপনাকে honestyর আবরণে ঢেকে রাখছে—এ-যে একটা coatingএর মত, তিক্ততা কিন্তু ভেতরে রয়েছে ; যশ, মান, অভিমান মিথ্যা, ছল, এরা-যে অবাধে চলাফেরা করছে, শাসন নিজেই এদের সুযোগ দিচ্ছে সরবরাহ করবার জন্য, আর প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটি কার্য্যের অর্থ যদি আপনি আপনার কার্য্যকরী হিসাবে মনে করে নিতেন, হুঁশ আপনার ঠিক থেকে যেতো। কণ্ঠি আপনাকে সতর্ক করে দিতো, 'মিছে কথা বলো না, আমি এখানে রয়েছি' ; তিলক আপনাকে হুঁসিয়ার ক'রে দিতো, 'একনিষ্ঠ হও'। প্রতিটি আপনার বাইরের আবরণে—প্রত্যেকটি আপনাকে হুঁশ করে দিতো সত্যের পথে চলার জন্য। উপকারিতার দিক্ দিয়ে nil মনে করছেন কিনা, তাই বেশভূষায় পরিণত হচ্ছে—সেখানেই বিচার-সাপেক্ষ, সেজন্যই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে—জ্ঞানের সাধনা সেখানেই। যত সমস্ত 'রূপ' রয়েছে, দেবদেবীর মূর্ত্তি রয়েছে, প্রত্যেকটির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে নিজেকে গড়বার জন্য ; এবং এই বিরাট বোধকে অবগতে আনার জন্য এই সমস্ত রূপ ; তার পরে এ বিশ্বসৃষ্টি যখন রূপে এসে দাঁড়ায়, তখন সবরূপই-যে তার রূপ, নিজেও-যে সে-রূপের মধ্যে একটি, তাও সে বুঝে নেয় ; তখন সাধনাতে আর বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না, তখন নিজের চিন্তাতে নিজেকে...নিজের সাধনাতে, নিজের তন্ময়তাতে নিজেই ডুবে যায়—'সমাধি-অবস্থা' তারই অবস্থাকে বলে, এবং সর্ব্ব-অবস্থাই একজাতীয় সমাধি-অবস্থা—বিভিন্ন বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন সমাধির নামাকরণ করেছেন মাত্র। তাই অতটুকু সময়

মনোনিবেশ ক'রে যে-কোন বস্তু সম্বন্ধে যখন বুঝা যায়, তার উপর যদি হাজার-হাজার গুণ চিন্তার মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া যায়, সূক্ষ্মতার পরিচয়েও সেই মাত্রা বুঝে নেওয়া যায়—শুধু চিন্তার মাত্রাকে বাড়িয়ে যাওয়া। মনের একাগ্রতা এবং মনের কার্য্য সমস্ত অবস্থাতে, সমস্ত ব্যাপারে যে প্রয়োগ হচ্ছে, যতটুকু সফলতা বা অসফলতার দিকে যাচ্ছে, মাত্রা বাড়িয়ে দিলে প্রত্যেকটি মাত্রাকে অবগত হওয়া যায়। আজ আপনার ভেতর 'যে-সমস্ত' উঁকি-ঝুঁকি মারছে, এদের যত প্রশ্রয় দেওয়া যাবে, 'এ-সকলের' মাত্রা ততই বাড়বে। আবহাওয়াতে যখন নিজে গিয়ে পৌঁছছেন, নিজের মূল তত্ত্বতে যখন বিস্মরণ-অবস্থায় বিরাজ করছেন, তখন ঐ সমস্ত জিনিষগুলোই বেশ বেড়ে গিয়ে আপনার মনের ভেতর এমনি ক'রে influence করছে, সময়ের উপযোগীতে কি মান, কি প্রতিষ্ঠা, কি যশ নেবার উদ্দেশ্যে; তখন প্রকৃত স্বরূপ হতে বঞ্চিত হওয়ার জন্য, সেই স্বরূপের পরিচয় দেওয়ার জন্য অভিনয় এসে সম্মুখে খেলা করে। বৃত্তিগুলো ঠিকই আছে—আপনি রয়েছেন বহু দূরে, আর ব্যতিব্যস্ত হচ্ছেন শয়তানের উপদ্রবে। এই তিক্ততাকে ঢেকে যে পরিচয় দিচ্ছেন honesty-রূপ আধারে, আর এ আধারটুকুনু পেয়েই আধারের সন্ধানে যারা যাচ্ছে সম্মুখীন পেয়ে পেয়ে আপনাদের, এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আধারের নীচে যে বড়শি, তা গিল্লেই মারা যাবার উপক্রম হয়ে দাঁড়ায়। আজ এই জাতীয় সংস্কার—এই জাতীয় বৃত্তির মধ্যে এখন একটা আধারযুক্ত coating রয়েছে, প্রকৃত 'অন্বেষণীরা' এগিয়ে যাচ্ছে এই আধারকে গ্রাস করার জন্য, যদি কিছু মিলে যায়। কিন্তু সংস্কার বড়শিযুক্ত ক্রিয়া করছে, সেই স্বাদে যখন গিলে ফেলে, প্রবেশটি তো আপনি হয়ে যায়, গিলিত অবস্থাটি সহজভাবেই হয়ে যায়, কিন্তু যখন টান পড়ে, তখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম

হয়ে যায়। আজ এই জাতীয় অবস্থা, এই সংস্কার, এই 'সমস্ততে' কি অবস্থার সৃষ্টি যে করে রেখেছ, প্রত্যেকটি 'মুহূর্ত্ত' যেন টানযুক্ত অবস্থা, টানের মত লাগছে। 'অপারেশন' না করা পর্য্যন্ত এর উপশম নেই, তাই 'অপারেশন' যারা করতে যাচ্ছে, তারা বঞ্চিত হয়ে ফিরে আসছে, বিমুখ-জাতীয় অবস্থা হয়ে সবার গালি, অপমান, লাঞ্ছনা, সব-কিছু নিয়ে ফিরে আসছে—শত্রুতা সেখানেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তার কারণ, বড়শিতে যে 'বেশীর ভাগই' রয়ে যাচ্ছে, যে ছুটাতে যাচ্ছে, সে ঘা খেয়ে ফিরে আসছে। কিন্তু যারা একটু ওস্তাদগোছের, তারা ঘা'তে পিছায় না, তারা তাদের কার্য্য করেই যাবে। তাই আজ কয়েকাদন যাবৎ কিছু শত্রুর উপদ্রব হচ্ছে, বেশ কিছু কড়া doseএ ঔষধ পড়ছে বলে—বিকার তো তখন হবেই। কিছুটা ক্লেদকে যদি বের ক'রে দেওয়া যায়, তবে কিছুটা symptoms বের হবেই, তারই কিছুটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে।" এভাবে পণ্ডিতের সাথে আলাপ করার পর পণ্ডিত খুশী হয়ে চলে গেলেন। তারপর ঠাকুর আমাদের বললেন, "সর্পের একটি ব্যাপার তোমাদের জানাবো—শত্রুতা কতটা চরমে পৌছলে এরূপ করতে পারে।"

—

আটচল্লিশ

আমরা* একদিন বসে† আছি। ঠাকুর কয়েকজনের সাথে আলাপ করছেন তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে। এমন সময় 'পিয়ন' এসে একটি চিঠি দিয়ে গেল। তিনি চিঠিখানা পড়লেন এবং চিঠির কয়েকটি কথা হেসে হেসে আমাদের জানালেন। তিনি বললেন, "দেখ, চিঠিতে লিখেছে, একজন তান্ত্রিক সাধু তাকে‡ নানারকম ব'লে, গ্রহদোষ ইত্যাদি ব'লে ওকে একটা স্বস্ত্যয়ন করার জন্য বলেছে। সেই লোকটি তান্ত্রিক সাধুকে বলেছে, 'আমি ঠাকুরের নিকট পত্র লিখে অনুমতি নিয়ে নি। তিনি যদি আপত্তি না করেন তবে আমার ইচ্ছা আছে।' তান্ত্রিক সাধু বলেছে, 'বেশ তো, পত্র লিখে জেনে নেও।'" ঠাকুর তখনই পত্রের উত্তর দিলেন এবং তিনি চিঠিতে যা লিখলেন, তাও চিঠিটি ডাকে দেওয়ার আগে আমাদের জানালেন,—

"তোমার পত্র পেলাম। তুমি যে-বিষয়ে অনুমতি চেয়ে পত্র লিখেছ, সে বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত মতামত-সম্পর্কে তুমি তো নিশ্চয়ই জান, না জানলেও আমি তোমায় জানাচ্ছি। শান্তি-স্বস্ত্যয়নের উপকারিতা—অনুষ্ঠানের আড়ম্বরের দ্বারা যতটুকু তৃপ্তি ঐ পর্য্যন্তই

---

* অনিল সেনগুপ্ত, জগদীশ দাশ, বিশ্বেশ্বর দাশ, অজিত ভট্টাচার্য্য, শান্তি দাস মজুমদার ইত্যাদি।

† স্বামীবাগ, ঢাকা।

‡ কানাই ভূষণ নাগ।

ওর সীমা, তা কতটুকু আর উপকারে আসে। যদি বিপদই কাটতো আর অশান্তি দূরীভূত হতো, তবে রাজা-মহারাজারা আর বিপদে পড়তো না। তুমি যদি করতে চাও self satisfactionএর জন্য, তবে আমার আর নিষেধ করার কি আছে। আমার ব্যক্তিগত মতামত জিজ্ঞেস করলে—অত টাকা ছাইয়ে পরিণত ক'রে কপালে একটু ফোঁটা দেওয়ার উপকারিতা আমি তেমন কিছু দেখি না, বুঝি ও না। তুমি যজ্ঞ কর আপত্তি নেই—হোমে ঘৃত আহুতি দেওয়া সঙ্গত, তাতে উপকারিতা যথেষ্ট আছে যদি যজ্ঞের প্রকৃত রূপ সম্পর্কে জেনে নেওয়া যায়। যজ্ঞ হচ্ছে—সংসার রূপ যে অনল তাতে আহুতি দেওয়া, আর আহুতি দেওয়া উদর-রূপ অনলে; সেই আহুতিতে প্রকৃত ফলের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। প্রায় আটশত টাকার ফর্দ্দ তোমায় দিয়েছে, তুমি যদি চারপাঁচ শত টাকার ঘৃত এনে সংসারে তৈলের পরিবর্ত্তে ব্যবহার কর, তবে উপকার আশা করি নিশ্চয়ই পাবে। আর তোমাকে যে-ভাবে তার capacityর দ্বারা মত করিয়েছে, qualities তার মধ্যে থাক বা না থাক, তোমাকে তো convince করেছে, তাতে তার efficiency আছে সন্দেহ নেই; তাকে না হয় হাতে ধরে কয়েকটি টাকা দিয়ে এলে। আর অনেক ভিক্ষুকও রাস্তায় বিচরণ করে—শীতের দিন—তাদের বাচ্চাদের পরিধানের ব্যবস্থা করলে, সুতরাং আনন্দ না হওয়ার কারণ কি, তৃপ্তি না পাওরার কারণ কি—এসব তো অনলেই দেওয়া হচ্ছে।" চিঠি ছেড়ে দিলেন এবং পরে এ-সম্বন্ধে সবার সাথে আলাপ করছেন, "দেখ, এই বর্ত্তমানের পরিস্থিতি, চিন্তাধারা, দারিদ্র্য, অশান্তি—সবাই চাচ্ছে মূলে শান্তি, অশান্তির নিবৃত্তি; মনের পঙ্কিলতা দূরীভূত করার জন্যই নানাভাবে অনুষ্ঠানের দ্বারা নিজের মনকে ঐ পঙ্কিলতাবিহীন করতে চাইছে। তার জন্যই এ সমস্ত পূজো-পার্ব্বণ, সংস্কার ইত্যাদি একটার পর

একটা অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ করে যাচ্ছে। সুতরাং যখন জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন আর অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না—অন্তরেই তাহা সমাধান হবে। বস্তুতঃ অন্তরেই সমাধান করছে, নিজে self create ক'রে ক'রে নিজেকে self satisfied করিয়ে নিচ্ছে by circumstantial activities। সেটা যদি জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচারের দ্বারা সেই কার্য্যকলাপের মাত্রাতে মনের ভেতর চিন্তা ক'রে ক'রে নিজের মনকে যদি সেভাবে তৈরী ক'রে নেয়,—ফল ত একই। তবে প্রথম অবস্থার জন্য তত্ত্ববিদ্‌রা বলে গেছেন, একটা কিছু নিয়ে মনকে স্থাপন করতে হয়, কিন্তু সেটা আর বলা না বলার প্রয়োজন হয় না। বিশ্বরূপই যে মনস্থাপন ও সংযমের পাত্র-বিশেষের কাজ করে যাচ্ছে, প্রকারান্তরে এই বিশ্বরূপই প্রত্যেকের সাহায্যে আসছে; আলাদা আর একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে কার্য্য করলেও সেই রূপের মধ্যেই এসে পড়ছে, নূতনত্ব কিছু নয়, যা রয়েছে তাতেই খেলা। বাংলায় ছত্রিশটি অক্ষর—এ দিয়েই নাড়াচাড়া ক'রে সাহিত্য, কবিত্ব—যার যত বিস্তার জাহির এর ভেতর দিয়েই তো করছে। তাই তোমাদের বহু আগেও তো বলেছি, কয়েকটি অক্ষর নিয়ে যেমন একটি শব্দ, এবং কতগুলো শব্দের সমষ্টি নিয়ে বাক্য, এবং কতগুলো বাক্যের সম্মিলনে যেমন ভাষা—এভাবে মিলিত হতে হতেই ভাব দিচ্ছে, ভাষা দিচ্ছে, রূপ দিচ্ছে—এই ভাবেই চলছে, তোমার বেলায়ও তাই, বিশ্বের বেলায়ও তাই। তুমি নিজে একজন, বিভিন্ন নামে যেমন তুমি —হাত, পা, নাক, চোখ, কর্ণ, মাথা, কেশ, জিহ্বা—কতগুলো নাম সম্মিলিত হয়ে তোমার নাম। এই মিলিত শক্তিকে নিয়েই শক্তির বিকাশ হচ্ছে, আবার প্রত্যেকটির একটির ভেতরও সেই শক্তি সম্মিলিত রয়েছে। সৃষ্টির প্রথম অবস্থাতে দেখা যায়, এই পৃথিবী উত্তপ্ত অবস্থায়, গলিত অবস্থায় ছিল। এই গলিত অবস্থার

গতিতে গতিতে নানা ভাব হলো, গলিত অবস্থা হতে বাষ্পময় হয়ে বারির সৃষ্টি হয় এবং নানা জাতীয় সৃষ্টি হয়; বারির সৃষ্টি হয়ে দেখা যাচ্ছে, একটা আলোড়নের মত অবস্থায় একটা রূপ দিয়ে যাচ্ছে, তার প্রথম অবস্থায় সৃষ্টির ভেতর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—একটি শিশু তার সমস্ত কিছু থাকা সত্ত্বেও—কোনটাই আবার তার ভেতর নেই, তবে একজাতীয় সাড়া দিয়ে যাচ্ছে, অথচ কোনটাই concrete formএ আসে নি, সবই যেন শিথিল হয়ে রয়েছে, সমস্ত শক্তিই রয়েছে, কোনটাই সাড়া দিচ্ছে না, অথচ এক জাতীয় সাড়া পাওয়া যাচ্ছে সাড়াহীনের সাড়ার মত। Environment ও circumstanceএর চাপে চাপে প্রয়োজনের তাগিদে, যে-কোন অবস্থাতে ঐ 'সাড়া'-জিনিষটুকু সাড়া দিয়ে দিয়ে solidটা maintain করছে। শিশু চোখে দেখছে, তবুও দৃষ্টিতে একটা অর্থহীনতার পরিচয় দিচ্ছে, কর্ণে শুনে কম্পিত হচ্ছে, কিন্তু একই অবস্থা। হাসছে সে—কেন হাসছে? হাসিতে সাড়া নেই, সাড়াহীন হাসি, ঠিক যেন পৃথিবীর প্রথম অবস্থার—conditionএর মত, প্রত্যেকটি সাড়া তথায় বিরাজিত অবস্থায় রয়ে যাচ্ছে, প্রত্যেকটি জিনিষেই দেখা যাচ্ছে এলোমেলো ভাব। এই যে এলোমেলোটা maintained হয়ে আসছে ঐ solidটিকে রূপ দেওয়ার জন্যই, প্রত্যেকটি প্রত্যেকটি রূপ দিয়ে যাচ্ছে নব নব আকারে, শিশুর দেহের দিক্ দিয়েও সেরূপ, দেহ থাকা সত্ত্বেও শক্তি হতে সে যেন বঞ্চিত অবস্থার মত হয়ে রয়েছে, শক্তি কিন্তু maintained হচ্ছেই। এই শিশু একদিন তিনমণ weight lifting করবে; কিন্তু রক্ষিত রয়েছে যে-শক্তি তাই বিকাশ হচ্ছে। সেই জিনিষগুলো ক্রমশঃ ধাপে ধাপে প্রত্যেকটির সাথে মিশ্রিত হয়ে একটা solid আকারের, কঠিন আকারের রূপ দিয়ে যাচ্ছে—এ জাতীয়........* কি ভাষা,

* বাদ পড়েছে।

কি ছন্দ, কি অক্ষর—একে অন্যের বুঝবার জন্য ও বুঝাবার জন্য। তোমার প্রয়োজনে যেমন তোমার protection রয়েছে সব sideএ, যেমন দন্ত, জিহ্বা, নখ, কেশ, ভ্রূ ইত্যাদি যে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য, সেই সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দ্বারা সূক্ষ্মতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে, এ-প্রয়োজনে যখন সে conscious ; তোমাতে আমাতে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য, প্রয়োজনের তাগিদে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য হলো ভাষা, তাও একটা অঙ্গ-বিশেষের মত রূপ দিয়ে যাচ্ছে, আশ্চর্য্য হবার মত কিছু নেই, স্বভাবজাত যা ছিল, ভাবের প্রকাশ ভাবেই ছিল। বিশ্বরূপ যখন প্রত্যেকের প্রত্যেকের এক-একটি রূপ-বিশেষের রূপের সাহায্য করছে, ঠিক self এক-একজন এক-একটি অক্ষর হয়ে হয়ে, আর একজনের নিকটে গিয়ে, সংযুক্ত হয়ে শব্দ, ভাব বুঝাবুঝি—সব-কিছু বিনিময় তার মধ্যেই রয়ে যাচ্ছে। সৃষ্টি হতেই—সব-কিছু নিয়েই যখন সৃষ্টি, সুতরাং কোন কিছু হওয়াটা আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নয়।" হঠাৎ এর মধ্যে অনেক লোকজন এসে পড়লো, কথাটা তাই স্থগিত হয়ে গেল। প্রসঙ্গটা এইখানেই বন্ধ রইলো।

——

ঊনপঞ্চাশ

আমরা* ঠাকুরের নিকট বসে† আছি। তিনি আমাদের যোগ-সম্পর্কে ও নানাবিষয়ে বুঝাচ্ছেন। এমন সময় ঠাকুরের এক ছোটবেলার সাথী তার মা-ভাই প্রভৃতি সহ উপস্থিত হলো। তাদের দেখে ঠাকুর বললেন, "কেমন আছ?" এবং অন্যান্য সাংসারিক বার্ত্তা জিজ্ঞেস করলেন। এরপর হঠাৎ তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "গতকাল যে স্বপ্নটা দেখেছো তার মধ্যে কোনটাকে চাও?" সে অবাক্ হয়ে ঠাকুরের মুখের দিকে চেয়ে রইলো, ঠাকুর একটু হেসে বললেন, "বা রে বা! লক্ষ্মী দেখলে, কার্ত্তিক দেখলে, কোনটাকে চাও?" সে এবার আশ্চর্য্য হয়ে বসে পড়লো। ঠাকুর বললেন, "তোমার সামনের......‡ তারিখে....§ সময় তোমার ছেলে হবে।" তারিখটা তারা টুকে নিলো, তারপর কথাবার্ত্তা ব'লে কিছুক্ষণ পরে তারা চলে গেল। আমরা তখন ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা ঠাকুর! যে স্বপ্ন 'ও' দেখেছে, সেটা কি ক'রে বলা সম্ভব?" তখন তিনি বললেন, "কঠিনই-বা কি।" "না—তোমার কাছে কঠিন না, তোমার কাছে তো সবই সহজ; কিন্তু আমরা তা কি ভাবে সহজ বলি?" তখন তিনি আমাদের কয়েকটি কথায় বুঝিয়ে দিলেন, "দেখ, যখন সে স্বপ্ন

---

* অনিল ভট্টাচার্য্য, বারীন ঘোষ, গীতা চক্রবর্ত্তী, অজিত ভট্টাচার্য্য, মহম্মদ্ আলি আরো অনেকে।

† কৃষ্ণনগর, ত্রিপুরা।

‡ উল্লেখ করা হলো না।

§ উল্লেখ করা হলো না।

দেখে, তারপর দিন সে চিন্তা ক'রে ক'রে মনে আনে, আগের দিন খেয়ে তা মনে ক'রে যেমন তার পরদিন স্মরণে আনতে হয়, এখন যতটা সে বলতে পারছে, তার প্রত্যক্ষতা বা অনুভূতির মধ্যে ছিল বলেই তো। ঠিক তার মনের যে গতি, temperature, ঠিক সেই অনুযায়ী তুমি যদি তার উপর মন স্থাপন কর, তবে তোমার মনও সেই অনুযায়ীতে ওর যা-কিছু আছে তোমাতে উদ্ভব হবে তাতে যেমন উদ্ভব হয়। রেকর্ডে গানটি করা থাকে, সব রেকর্ডের চেহারা একই, রেখাগুলোও একই, makerও এক, কিন্তু পিনের খোঁচায় যার যার বক্তব্য প্রকাশ করে। ঠিক তুমি যদি ওরকম একটা পিন্ প্রয়োগ ক'রে এক-একটি রেকর্ডের উপরে—রেকর্ড মানে হচ্ছে দেহেতে মনরূপ যে-রেকর্ড, আর তোমার চিন্তারূপ যে-পিন্ তা'তে প্রয়োগ করলেই তার স্বরূপেরও তত্ত্বগুলো বেরিয়ে আসবে, তখন তুমি শ্রোতা হয়ে বুঝে নিলে ; তখন আর জানতে আপত্তি নেই, জানাতেও আপত্তি নেই।" আমরা জিজ্ঞেস করলাম, "ঠাকুর, পিন্‌টা কি ভাবে প্রয়োগ করবো ? অনেক সময় ভাবি, 'ও কি ভাবে, সে কি ভাবে ?' কিন্তু তাতো আর বুঝে উঠি না।" ঠাকুর বললেন, "কিছু তো বোঝ তার, হাবভাবে চাল-চলনে কি চায়, কি দরকার, কিসের প্রয়োজন, দুঃখে আছে কি শোকে আছে, না সুখে আছে, কোন অবস্থা তার চলছে, তার অনেকটা প্রকাশ হয় তার ভাবগতির মধ্য দিয়ে। ততটুকুর জন্য তো তোমার মনোনিবেশ করতে হয়, তা' হতে যতটুকু বুঝে নিতে পারছো, তার চেয়ে যদি 'ডবল-ডবল' মাত্রায় মনকে ওর উপর নিবিষ্ট করা যায়, তবে আরো বেশী-যে বেরিয়ে আসবে। সাধারণ কথা যে মনকে আরো একটু এগিয়ে দিলে আরো একটু বেরিয়ে আসবে ; আর ইহা স্বাভাবিক কথা যে বুঝবার মত পথ যখন রয়েছে, এগিয়ে যাওয়ার মত সব-কিছু

ধারাবাহিক নিয়ম রয়েছে, এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা—আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই, ভাববারও কিছু নেই। সফলতার একটু যদি সন্ধান সত্যতাতে আসে, এবং সেই সত্যতার দিকে যদি এগিয়ে যাওয়া যায়, তবে সত্যকেই সব সময় পাওয়া যাবে তা নিশ্চিত। তাই প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী যাহা gift তাতে যে-যে সাড়াগুলো আছে, এই বুঝেতে পারা না পারা, চিন্তাদারা সফলতা অসফলতা যাই হোক যে-কোন ভাবগতি যা-কিছু আছে, যাকে বলে inborn quality, সবার ভেতর যা প্রযোজ্য তার যে কোন একটি দিয়ে যদি এগিয়ে যাওয়া যায় বা মনোনিবেশ করা যায়, তারই গূঢ় রহস্য ও তত্ত্ব পরিষ্কারভাবে, সম্পূর্ণ রূপে এসে তার কাছে ধরা দেয়, তার জন্যই এই দেহের ইন্দ্রিয়াদির ভেতর দিয়ে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির ভেতর দিয়ে এই সমস্ত শক্তির বিকাশ এবং যাঁরা এই বাস্তবেতে বড় হয়েছে, এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির যে-কোন গতিবিধিতে একাগ্রতা দ্বারা সাধনার দ্বারা বড় হয়েছে—কি গায়ক, কি কবি, কি সাহিত্যিক আরো অনেকে রয়েছেন, সবাই একাগ্রতার পরিচয় দিয়েছেন। মহান্‌রাও ঠিক সেই মহান্ চিন্তা দ্বারাই মহত্ত্বের তত্ত্বকেও বুঝে নিয়েছেন, তাই সব-কিছু যে তোমাতে রয়েছে তা তোমাতেই প্রকাশ।'' এর মধ্যে বহুলোক এসে জড় হয়েছে, তারা ঠাকুর-দর্শনার্থে অপেক্ষা করছে। ঠাকুরের আলাপটা আমরা মোটামুটি বুঝে নিলাম, তিনি আমাদের বললেন, "পরে তোমাদের details বুঝিয়ে দেব, আমাকে সময় মত খেয়াল করিয়ে দিও।" যারা এসেছিলো তাদের মধ্যে অনেকেই ফলফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা* পথ

* সুরেন্দ্র নম, জগদীশ নম, রমেশ চক্রবর্ত্তী, নবদ্বীপ দাস, ননী গোপাল দে, মহিলাল ভট্টাচার্য্য, নিকুঞ্জ দাস, নিরোদ সাহা, কেষ্ট নম, অজিত ভট্টাচার্য্য আরো অনেকে।

পরিষ্কার ক'রে দিলাম, সবাই প্রণাম ক'রে যাচ্ছে, আবার কেহ কেহ এর মধ্যেই ঠাকুরকে ফলফুল দিচ্ছে। ঠাকুর একজনকে* বললেন, "তুমি পারক-হিসাবে যা পারবে তাই দেবে, তুমি লুকিয়ে কেন এ ফলগুলো নিয়ে এলে?" তখন সেই ব্যক্তি অবাক্ হয়ে ঠাকুরের দিকে চেয়ে রইলো, যেন ঠিক বুঝতে পারেনি। ঠাকুর বললেন, "ও বেচারার ডালা হতে তুমি ফল দূরে সরিয়ে রেখেছিলে; আমাকে দেওয়ার মধ্যে তোমার আগ্রহ থাকতে পারে, এ-জাতীয় আগ্রহের ভেতর ভেজাল রয়ে যাচ্ছে। একটা জিনিষ গলাধকরণ করলেই হলো না, তার মধ্যে ভেজালযুক্ত হলে ক্ষতি-কারক অবশ্যম্ভাবী।" সেই লোকটি ঠাকুরের নিকট সকল স্বীকার করলো এবং ফল নিয়ে চলে গেল।

---

* ভরত দাস।

পঞ্চাশ

ঠাকুর সহরে* আছেন। বহুলোক বিকেলবেলা অপেক্ষা করছিলো। তিনি এসে সবাইকে দর্শন দিলেন, একটি উন্মাদিনী মেয়েও এর ভেতর রয়েছে। মেয়েটি অবিবাহিতা, বছর কুড়ি বয়স হবে। সবাই এসে প্রণাম ক'রে দূরে বসছে। তারপর দু'তিনজনে মিলে সে-মেয়েটিকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে এলো। তিনি ওর দিকে তাকিয়ে আছেন, কতক্ষণ পরে দেখা গেল সে মূর্চ্ছিত হয়ে প'ড়লো। ঐ অবস্থায় হাত-পা ছুড়ছে। তার সাথে সাথে সাতআটজন লোক এসেছে, তারাও বেশ ভদ্র। ঠাকুর ওকেই লক্ষ্য করছেন। বহু সাধু, সন্ন্যাসী, ফকির ওকে নাকি দেখেছে, প্রতিকারের চেষ্টাও করেছে। ঠাকুর বললেন, "একটা কাজ কর, ওকে পাশের ঘরে অপেক্ষা করতে বল, আমি এদের বিদায় করে আসি।" ওরা পাশের ঘরে গেল। আস্তে আস্তে ঠাকুর সবাইকে বিদায় করে দিলেন। তারপর আমরা† কয়েকজন ঠাকুরের সাথে গিয়ে পাশের ঘরে বসলাম। তখন ঐ মূর্চ্ছিত অবস্থায় মেয়েটিকে ধরাধরি ক'রে ঐ ঘরে নিয়ে গেল। ঠাকুর গিয়ে দেখেন ঐ অবস্থায়ই আছে, আর হাত-পা ছোড়াছুড়ি করছে। তিনি ওর আত্মীয়স্বজনদের বললেন, "তোমরা একটু দূরে দাঁড়াও।"

---

* নারায়ণগঞ্জ।

† দ্বিজেন্দ্রপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, মনোরঞ্জন সেন, পান্নালাল বোস, পরেশ রায়, ইন্দ্র সেন, শান্তি দাস মজুমদার।

ওরা একটু সরে দাঁড়ালো, ঠাকুর অমনি বলে উঠলেন, "ওর সর্ব্বনাশ হয়ে গেল—গেল—গেল।" অমনি ওদের ভেতর থেকে দু'তিনজন লোক ছুটে এলো। যে কেউ ওকে ধরে, অমনি আগের মত হাত ছোড়াছুড়ি করে—বাপ-মা তো কাছেই আসতে পারে না, ভাইও কাছে আসতে পারে না। ঠাকুর আবার বললেন, "এটা তো ঠিক পাগলামি না, এটা sexual disease, ও যা চায় তা পাচ্ছে না environmentsএর জন্য, তাই চিন্তা করতে করতে ওর এ অবস্থা দাঁড় করিয়েছে, কিন্তু conscious আছে।" যে দু'তিনজন দৌড়ে এসেছিলো, তাদের ভেতর যাকে একটু চঞ্চল দেখা গিয়েছিলো, ঠাকুর তারও পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। ঠাকুর বললেন, "Symptom তো বেরিয়ে গেল।" এর পর সেই ছেলেটি তার নাম ও পরিচয় বললো, এবং দেখা গেল যে ওদের সাথে ছেলেটির কোন সম্পর্ক নেই। মেয়েটি ডাক-মাসীর মেয়ে। তখন ঠাকুর ছেলেটিকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, "ঔষধ তো তুমিই দেখছি। তোমাকে বেঁধে দিলেই তো অসুখ সেরে যায়।" ওখানে মেয়ের বাবা দাঁড়িয়ে ছিলেন, সব কথা শুনে তিনি ঘাড় নাড়াছলেন। তার ঘাড় নাড়ার মধ্যে বেশ বোঝা যাচ্ছিলো যে, 'ব্যাপারটা এখন বুঝলাম!' ঠাকুর তারপরই ওর বাপকে ডেকে বললেন, "ওকে কি বাঁচাতে চাও?" মেয়ের বাবা বললেন, "বাঁচাতেই চাই।" ঠাকুর বললেন, "তবে ওর সাথে বিয়ে দিতে আপত্তি আছে কি? যদি না থাকে, তবে বিয়ে দিয়ে দেবে।" ঠাকুর একথা বলাতে ছেলেটি যেন অবাক্ হয়ে গেল। ছেলেটি এমনভাব প্রকাশ করলো যে 'আপনি বলেন কি!' কারণ, সে এতদিন পর্য্যন্ত মনে হয় ওদের বাড়ীতে খুব চরিত্রবান্ বলে পরিচয় দিয়ে এসেছে এবং ঐ মেয়েটিকে আপন বোনের মতই দেখেছে। কিন্তু ঠাকুর ওর ভাব বুঝতে পেরেই বললেন, "আমি ঠিকই বলেছি।" ঠাকুরের

কথায় ছেলেটি আরো বেশী অবাক্ হয়ে বললো, "আমি ?" তখন মেয়েটি বলে উঠলো, "তুমি, তুমিই—তুমিই একমাত্র ঔষধ।" ঠাকুর বললেন, "এর মধ্যে আবার প্রবঞ্চনারও চেহারা, ভারী ওস্তাদ হয়ে গেছ দেখছি।" তখন হঠাৎ মেয়েটি বলতে বলতে উঠে বসলো, "তুমি তাঁর কাছে মিছে কথা বলছো কেন তিনি যখন সব বুঝে ফেলেছেন ?" তখন ছেলেটি আর যায় কোথায়, সে সব স্বীকার করলো ও ঠাকুরের কাছে ক্ষমা চাইলো। ঠাকুর ক্ষমা যেন আগেই ক'রে রেখেছিলেন। তিনি বললেন, "যাক যা বলেছ বলেছ, আর কোনদিন বলো না।"

ওখানে যারা ছিলো, তারা অনেকেই এ ব্যাপারে বেশ একটু অবাক্ হয়েছিলো। কিন্তু আমাদের অবাক্ হওয়ার কিছুই ছিলো না, কারণ অবাক্ হতে হতে 'অবাকে'র চড়া পড়ে গিয়েছিলো।

একাত্ম

আমরা* ঠাকুরের সঙ্গে আছি। একদিন কয়েকজন ভদ্রলোক এসে বলে গেলেন যে তাঁরা বিকেলে ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করতে আসবেন।

বিকেলে তাঁরা এসে উপস্থিত হলেন। একজন বড় তার্কিকও এদের সঙ্গে আছেন। ঠাকুরের নিকটেও বহুলোক উপদেশ শোনার জন্য বসে আছে। আমরা পণ্ডিতকে সম্ভাষণ জানিয়ে বসালাম। পণ্ডিত বসেই ঠাকুরকে বললেন, "আপনার সাথে দু'চারটে আলাপ করবো।" ঠাকুর বললেন, "বেশ তো, আনন্দের বিষয়, সুখের বিষয়।" দু'জনে মুখোমুখি বসে আলাপ করছেন। আমরা সবাই আগ্রহসহকারে তাকিয়ে আছি। ঠাকুর বললেন, "আপনার সাথে আলাপ করার আগে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন; কারণ, জ্ঞানের সমালোচনাতে আতিথ্য কিংবা ভদ্রতা আসে না, এখানে হচ্ছে উভয়ের সমস্যার সমাধান করা—এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন-বোধে দু'একটি মাত্রা ছাড়িয়ে কথা বলার প্রয়োজন হলে বলতে কিন্তু কার্পণ্য করবো না, তাতে মনঃক্ষুণ্ণ হলে এই আলোচ্য বিষয়কে উপহাস করা হবে; তার কারণ, বিষয়বস্তু যখন 'ব্রহ্মতত্ত্ব' নিয়ে, 'বিরাটতত্ত্ব' নিয়ে, তখন আলোচনাগুলোও যে যে জাতীয় বুঝবার জন্য যা যা প্রয়োজন, তা তা প্রয়োগ করা বিধেয়; তাই

---

* দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী (২), বিপুল চক্রবর্ত্তী, সুভাস চক্রবর্ত্তী, প্রাণশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, বারীন ঘোষ, অজিত ভট্টাচার্য্য, শান্তিদাস মজুমদার আরো অনেকে।

স্থান—স্বামিবাগ, ঢাকা।

আলোচনার আগে বলার প্রয়োজনে বলে নিলাম।" প্রথমতঃ পণ্ডিত তাঁর কথা বলে যাচ্ছেন—পণ্ডিতের ভাষা খুব মার্জ্জিত এবং সমস্ত পুঁথিগত বিদ্যা নিয়েই ঠাকুরের সাথে আলাপ করছেন। ঠাকুর মন দিয়ে শুনছেন। তাঁর আলাপ শেষ হলে ঠাকুর বলতে আরম্ভ করলেন, "আপনি যে সমস্ত বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করলেন, আলোচনার আলোচ্য বিষয়গুলো সবই মহৎ এবং ভাষার দিক্ দিয়ে আপনি বেশ মুখরোচক ও কমনীয়তার পরিচয় দিয়েছেন, ভাবের দিক্ দিয়ে দেখছি কণ্টকযুক্ত। কি কি আপনার ভাব হতে আমি অবগত হয়েছি, তা আপনাকে জানিয়ে আমার 'অবগত'কে আপনার নিকট clear করছি। আপনি আপনার উপযুক্ততায় সব বুঝিয়ে দিন্।" পণ্ডিত তখন বললেন, "বেশ বলুন।" ঠাকুর বললেন, "আপনার আলোচ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে পেলাম দাম্ভিকতা, আর তর্ক করার প্রবৃত্তি হচ্ছে জব্দ করার tendency; জানবার কিংবা জানাবার—দুটোরই দেখছি অভাব, কয়েকটি ছড়া শিখে 'বোড়ে'র মত গুটি চালিয়েই যাচ্ছেন, তাতে কূটনীতির পরিচয়ই তার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে, সরলতার কাছ দিয়েও আপনাকে দেখা যাচ্ছে না। আপনার বিষয়বস্তুর সাথে আপনার অনেক পার্থক্য দেখছি। বাইরের আচরণ, আবরণ এবং আপনার ভাবের যে পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন, যা-কিছু আপনার বক্তব্যের মধ্যে....যা কিছু বলেছেন এবং বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেছেন, আপনাতে ও ঐ বস্তুতে কতটুকুনু পার্থক্য আপনি নিজেই চিন্তা করলে তা ধরে নিতে পারবেন। আপনি আপনার পরিচয় দেওয়াতে যে পরিচয় পেয়েছি, আপনি আবার এ পরিচয় সম্পর্কে নিজে অবগত থাকা সত্ত্বেও সহজভাব করে নেওয়ার জন্য মূল বিষয়টি এভাবে প্রকাশ করেছেন যেন আপনি মূলেই রয়েছেন। ব্রহ্মকথার মূলে সবাই রয়েছে—সে আলাদা এক জাতীয় ব্যাপারে গিয়ে দাঁড়ায়;

কিন্তু যে বিষয়বস্তুর সম্পর্কে আপনার সঙ্গে আলোচনা, সে-বিষয়বস্তু নিয়ে চলছে ভাবাভাবি। আপনার যে ভাব প্রকাশ করলেন, সেই ভাবে যে কতরকম গলদযুক্ত অবস্থা বিরাজ করছে তা আমি একটি-একটি করে ধরে দিচ্ছি। স্বীকার করুন বা না করুন, সে হলো আপনার বিচার্য্য বিষয়, আপনার প্রতি মুহূর্ত্তে সম্মানবোধ, আপনার অহংবোধ এমনি আপনাকে ঘিরে রেখেছে যে, আপনি সে-বোধ হতে বেরিয়ে যেতে পারছেন না, তাই প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হোঁচট খেতে খেতে এমনি কড়াযুক্ত ক'রে ফেলেছেন যে হোঁচটকেও সহজবোধে এনে ফেলেছেন; তাই এই যে ভাব আপনি প্রকাশ করলেন, সেই ভাবে আপনি হুঁশ হচ্ছেন না, কিন্তু হোঁচট উপলব্ধি করছেন। আমি যে বলছি, সে-আঘাত আপনি টের পাচ্ছেন; আমি যে wound দিচ্ছি তাতে আপনার পরিবর্ত্তন হচ্ছে না; অবস্থাগুলো আপনার সরিয়ে দেওয়া দরকার, তার কারণ, কড়াপূর্ণে হোঁচট খেলে সহজেই সেটাকে মানিয়ে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু হোঁচট খেতে খেতে যে জায়গাটা কড়াযুক্ত নয়, সেই জায়গায় যদি এমন হোঁচট খান, সেখানে রক্তপাত অনিবার্য্য; তাই আগে থেকেই আপনার সমস্ত অবস্থার সঙ্গে balance নিয়ে আপনার চলা প্রয়োজন। যে সমস্ত কথোপকথন আপনি করলেন, তাতে আপনার স্বরূপ হতে যা-কিছু পেলাম, সেরেফ একটি প্রতারণাকেই নিজের মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রে মূল বস্তুকে coating হিসাবে ছাড়ছেন—একটু চাটলেই সেই তিক্ত স্বাদটুকু পাওয়া যায়; সুতরাং উপরে যতই মিষ্টিযুক্ত চেহারা দেখান-না কেন, একটু-একটু চেটে যখন দেখা গেল তিক্তময়, তখন পরিচয় আপনার অমনি সব পাওয়া গেল।" তখন পণ্ডিত ঠাকুরকে বললেন, "আপনার কথা হয়েছে ?" ঠাকুর বললেন, "কথা হয় নাই, অনেক বাকি আছে, আপনার যদি কিছু বলার থাকে, বলুন।" পণ্ডিত বলছেন, "আপনার

এখানে এসেছি বলে যা-তা বলছেন, অন্যত্র হলে কেউ বলতে পারতো না।" ঠাকুর বললেন, "যা-তা কেন বলবো, তবে জাঁতায় ফেলে পিষে দেখতে চেষ্টা করি, তেল বেরোয় না কাঁকর বেরোয়।" পণ্ডিত বললেন, "আপনার কথায় দাম্ভিকতা প্রকাশ পাচ্ছে; নিজের কথার উপরে বড়াই করছেন।" পণ্ডিত ব্যক্তি হঠাৎ খুব চটে গেলেন। ঠাকুর এই উগ্রমূর্ত্তি দেখে পণ্ডিত ব্যক্তির হাত ধরে বললেন, "না, না, আপনি মনে কিছু করবেন না, বসুন, যা হবার হয়ে গেছে।" পণ্ডিত তখন আরো চটে গেছেন এবং বলছেন, "শুনে এসেছিলাম আপনি একরকম, এখন দেখি অন্যরকম।" ঠাকুর তখন তাঁকে হাত ধরে জোর ক'রে টেনে বসালেন ও বললেন, "আপনার সঙ্গে যে সমস্ত আলোচনা করেছি, যে সমস্ত অপমানমূলক কথা বলেছি তা আমি ইচ্ছে করেই বলেছি, তার কারণ, যে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করতে এসেছেন তার ভার আপনি কতটা বহন করতে পারেন, তাই কয়েকটি অপমান-সূচক কথা বলে দেখছি আপনার ভেতর কি কার্য্যকরী হয়; দেখলাম —ঔষধ দেওয়ার সাথে সাথেই রোগের প্রকাশ। এসেছেন বিরাটের আলাপ করতে, এতটুকু অপমানের কথায়ই যদি রেগে উঠেন—যে মূর্ত্তি ধরেছিলেন, মনে হলো বুঝি প্রলয় আরম্ভ করবেন, তাই অবস্থাকে আয়ত্তে আনার জন্য, আলাপ করার আগেই আপনাকে ঠাণ্ডা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেলাম। আমার যে মাঝে মাঝে একটু 'ঘোস্ঘোসানি' 'ফোঁসফোঁসানি'—তা আপনাকে দংশন করার জন্য নয়, আপনার কি আছে তা দেখবার জন্য। যখন আমি অপমানসূচক কথা আপনার উপর প্রয়োগ করলাম—আমি নিজেই প্রস্তুত ছিলাম কখন আমার উপর উল্টো চোট আসে। তারপর আবার মনে মনে চিন্তা করলাম যে, বিষয়বস্তু যখন বিরাট, এ কয়টা আলাপ তো বিরাটেই মিশে যাবে; দেখলাম যে, ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে—একেবারে লম্বা wall দেওয়া, তাই আলাপ না করেই যখন আপনার পরিচয় পেয়ে গেলাম যে,

ফাঁকির উপরই আপনি প্রতিষ্ঠিত; তাই আলোচনা করে সময় নষ্ট করার তো প্রয়োজন নেই।" তখন পণ্ডিত বেশ সাম্যভাবে ঠাকুরের সাথে আলাপ করতে আরম্ভ করলেন। ঠাকুর বললেন, "এই যে, এখনকার আপনার 'সাম্যতা' আঘাতেই কিন্তু তার প্রকাশ—আঘাত দেওয়াতেই যে তা বের হলো।" তখন আবার পণ্ডিত একটু চটে বললেন, "কেন, আঘাতে হবে কেন?" ঠাকুর আবার বলছেন, "ভুলে যাচ্ছেন কেন, এও যে ঠিক আগেরই মত পরীক্ষামূলক কথা—আমার স্বভাবটাই এরকম, খুশিতেও পরীক্ষা করি, প্রায় অবস্থাতেই যে পরীক্ষা করি, সুতরাং ভদ্রতা অভদ্রতার জন্য অপেক্ষা করি না; কে কোনভাবে আছে dose দিয়েই বুঝে নি। আপনি ভেবেছিলেন বুঝি, 'আলাপ তো শেষ করেই ফেলেছি এখন সাংসারিক কথা হবে' ভাবছেন যে, অভিনয় শেষ করা হয়েছে, এখন যার যার business চলছে—আমি business করছি সবসময়, এর মধ্যেই দেখছি ভুলে গেছেন—এসেছেন একটু নম্রভাবে আমার সাথে compromiseএ, তার মধ্যে একটু দিয়েছি, তাতেই আবার চটে গেছেন। মজা সেখানেই, রূপ যদি স্বরূপে না থাকে, গোল তখনই এসে দাঁড়ায় সম্মুখে। বাস্তবে একটা গল্প শুনেছি—"সাংঘাতিক 'রায়ট' লেগেছে। একটি মুসলমান হিন্দুপট্টিতে রয়েছে। মাথা ন্যাড়া ক'রে, শিখা রেখে, গলায় কণ্ঠির মালা দিয়ে 'রাম' নাম করতে করতে চলছে। ওকে ধরে বলছে, 'আপনি হিন্দু না মুসলমান দেখবো।' তখন সে বলছে, 'আল্লার কিরা বাবু আমি হিন্দু।' ঐ লাঠির আক্রমণ-সম্ভাবনায় ভীতিতে প্রাণ প্রায় যায়-যায় অবস্থা, সুতরাং তখন সত্য রূপটি বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। তার জন্য 'সত্য' অপেক্ষা না ক'রে নিজেই গুম্‌রে বলে উঠলো, 'আল্লার কিরা দিয়ে বলছি আমি হিন্দু।'—লাঠি কেন ছাড়বে, মিথ্যাকে মেরে ফেলেছে। আপনার কিন্তু সেই

আমার মর্য্যাদাও নিজের ভেতরেই যেন ভদ্রতার মত হয়ে দাঁড়িয়েছে।" এইভাবে নানারকম দুঃখ করলেন। ঠাকুর তখন বললেন, "থাক্, আপনার আর বলতে হবে না। আমি আনন্দ-বোধ করলাম যে, এই উপদেশ আপনার ভেতর কার্য্যকরী হয়েছে। সত্যকে সত্যরূপে জানলেই আনন্দ—সেখানে আনন্দ নিরানন্দের প্রশ্ন নেই—এগুলো বাইরের ভদ্রতামূলক কথা।"

———

বাহান্ন

মাঘ মাস। খুব শীত পড়েছে। ঠাকুর সহরে* আছেন। বহুলোক† বসে উপদেশ শুনছে; বহুরকম উপদেশ তিনি দিয়ে যাচ্ছেন। এর মধ্যে ঠাকুর power-সম্পর্কে বেশ জোর দিয়ে বলছেন; বিশেষ ক'রে বিভূতি-সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে আলাপ করতে করতে ক্রমশঃ ক্রমশঃ এত লাল হয়ে যাচ্ছিলেন যে তাকাতে চক্ষু ঝল্‌সে যাচ্ছিল। ঠাকুর কথায় কথায় বললেন, "দেখ, আজ পূর্ণিমা—মনের ইচ্ছাশক্তিতে প্রবল বৃষ্টিও হতে পারে, তার কারণ, যেই যেই কারণে বৃষ্টি হয়, সেই সেই জাতীয় কারণ যদি মনে উদ্ভব ক'রে আবহাওয়াতে সে-জাতীয় ক'রে নেওয়া যায়; সেই মাত্রাতে বৃষ্টি হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি। অধিক

---

* স্বামিবাগ, ঢাকা।

† নগেন ঘোষ, অমূল্য বোস, প্রাণশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, অমিয় চক্রবর্ত্তী, রবি ঘোষ, রাজেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সত্যভূষণ রায়, অজিত মুখার্জ্জি, টনু নিয়োগী, মণীষ রায়, সত্যেন রায়, গোপাল ঘোষ, কিরণ চৌধুরী, অহীন্দ্র ঘোষ, সুবোধ চৌধুরী, ভূপেন্দ্র নাথ রায়, অশ্বিনী চাটার্জ্জি, ননী সেন, যদু নাথ রায়, চারুলতা ঘোষ, কমলা রায়, স্নেহলতা রায় চৌধুরী, ঊষারাণী দত্ত, গৌরী চক্রবর্ত্তী, গীতা চক্রবর্ত্তী, রাণী রায়, বনলতা গুহ, কল্যাণী চৌধুরী, ডলি দত্ত, মহম্মদ্ আলী, আলতাফ্ উদ্দিন, তাসাদ্দক্ হোসেন, জগদীশ দাশ, বিশ্বেশ্বর দাশ, অমরেন্দ্র দাশ, পরমেশ দাশ, অনিল ঘোষ, নীহার দাশ, দুর্গাময়ী দাশ, বারীন্দ্র (বারীন) ঘোষ, অজিত ভট্টাচার্য্য শান্তিদাস মজুমদার আরো অনেকে।

উত্তাপে জল বাষ্প,—উপরে ঠাণ্ডা, তারপর rainfall ; ঝড় তাহা হতেই উদ্ভব—উত্তাপেরই এক জাতীয় পরিচয় দিচ্ছে, সেই উত্তাপ তোমাতে আমাতে সর্ব্বজীবে রয়েছে। ঠিক ৯৮ ডিগ্রী যে উত্তাপ, কোন অসুস্থতায় ১০০ ডিগ্রীতে পৌঁছতে পারে, তবে ১১০ ডিগ্রী উত্তাপ ভেতরে সঞ্চিত অবস্থায় আছে, যে-কোন মুহূর্ত্তে সুযোগ পেলেই উপরে উঠতে পারে। আজ আমি বোধের বোধে এ-বোধকে যদি আমার আবহাওয়ার সাথে এক বোধে আনি, এই বোধের তাপের সাথে যদি আমার তাপকে এগিয়ে দেই, সহযোগিতা ক'রে নিত.........* এক হয়ে আবহাওয়ার তাপই। আমার তাপ ১১০ ডিগ্রী এবং control যে আমার হাতেই, ১১০ ডিগ্রী জ্বর হলে দেহেতেই তাহা অবস্থিত, আবহাওয়ার তাপ আমাতে তোমাতেই অবস্থিত থাকবে, যদি তাকে acquire করার মত গুছিয়ে নেওয়া যায়, তার নামই হলো 'সাধনা', তার নামই হলো 'যোগ'। সেই আয়ত্ত যখন একত্ব হবে তোমাতে আর বিশ্বেতে, তখন বেগেতেই—ঠিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিতে যেমন বেগের সাথে সাথে ত্যাগের চিন্তা হয়, তেমনি আবহাওয়াতে তোমার চিন্তার সাথে সাথে হয় ঝড়, হয় বৃষ্টি, হয় উত্তাপ—ঠিক দেহের বেগের নিবৃত্তির মত। বৃষ্টি হলো—যেমন তুমি অশ্রুপাত করলে, ঠিক ঘর্ম্ম যেমন একটু হলো ঐ জাতীয় প্রস্রাবের বেগকে যেমন নিবৃত্তি ক'রে তৃপ্তি পেলে—এই সমস্ত শক্তি সর্ব্বজীবে বিদ্যমান্ রয়েছে। এই শক্তিকেই উদ্ভব করতে হবে 'উদ্ভবত্ব-বস্তু' দ্বারাই, এবং সম্মুখীন যা বৃত্তি-প্রকাশ, তার সাহায্য নিয়েই ; তাই আজ পূর্ণিমা মনের সাথে সাথে, চিন্তার সাথে সাথে আবহাওয়াকে যখন গুছিয়ে নেওয়া হবে, বৃষ্টি অনিবার্য্য।" ফুট্ ফুটে জ্যোৎস্না—মনে হয় একটা ছুঁচকেও তুলে নেওয়া যায়।

* বাদ পড়েছে।

ঠাকুরের আলাপের সাথে সাথে কোথা হতে একখণ্ড মেঘ এসে পূর্ণচন্দ্রকে আবৃত ক'রে ফেললো, ঝড়ের আবির্ভাব হলো এবং বৃষ্টিও আরম্ভ হলো। আমরা সবাই তাকিয়ে আছি, কিন্তু আশ্চর্য্য হইনি; মনে হলো যেন আমরাই করছি। ঠাকুর কখনও জেদে বা অনুরোধে বিভূতি কাউকে দেখান্ না, কথায় কথায় feelingsএ feelingsএ যতটকু হয়ে যায় এবং তার মধ্যে যা-যা আসে, তাতেই যা হয়। তিনি এ সব ব্যাপারে খুব strict। তাঁকে কেউ কটু কথা বা অমান্যজনক কোন কিছু বললে আমরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছি, মনে মনে ভেবেছি, 'Force থাকলেই মেরে বসতাম'; আর forceএর stockist যিনি, তিনি হাসিমুখে সব সহ্য করে যাচ্ছেন, আর আমাদের বলছেন, "হাতীকে ডেকে লাথি দেখালে, হাতীর চটাই যে নিজেকে insult করা ছাড়া কিছু নয়।" বৃষ্টি হচ্ছে প্রবল। স্বাভাবিক চেহারায় তিনি সবাইকে বুঝাচ্ছেন। তিনি বুঝিয়ে যাচ্ছেন আর আমাদের বলছেন, "তোমরাই পার।" আমরা মাঝে মাঝে খালি মাঠে গিয়ে দিনের বেলায় ইচ্ছেমত force মারতাম যে কিছু আসে কিনা, কিন্তু খালি কোঁদন ছাড়া আর কিছুই পাইনি। তবে আশা রাখি, আমরা যে পূর্ণতেই আছি, না বললে যে বকুনি খাব, তাই আমরা মনেপ্রাণে স্বীকার ক'রে যাচ্ছি। আমরা ঠিক আছি, হো'ক বা না হো'ক, জোর করে তো স্বীকারই যাচ্ছি—দুটোই পূর্ণ বিকাশ। আমরা এসে ঠাকুরকে জানাচ্ছি যে আমরা কৃতকার্য্য হতে পারছি না। ঠাকুর একটু হেসে বললেন, "শক্তির বিকাশ তো ঠিকই রয়েছে, ঘাবড়াস্ কেন?" হাত গুটিয়ে বসে পড়লাম, চেহারায় দেখালাম 'কেন ঘাবড়াব?' তারপর ও নিয়ে একটু আমরা হাসাহাসি করলাম, এরূপ আমরা মাঝে মাঝেই করতাম। তিনি খুবই সামাজিক, কিন্তু কারো ব্যক্তিগত নাম দিয়ে সমালোচনা খুব

কম করেন। মাঝে মাঝে এমন সমালোচনা করতেন, আমরা চিন্তা করতাম, কার উপর দিয়ে চালাচ্ছেন। একদিন নিজের কথাই বলে যাচ্ছেন, নিজেরে বানচাল বানাতে সুরু করেছেন, এমনভাবে বানচাল বানাচ্ছেন যে একেবারে চরমে নিয়ে দাঁড় করাচ্ছেন, ওস্তাদ খেলোয়াড় তো, ঠিক শেষে গিয়ে বাণে টান দিয়ে বসছেন, লক্ষ্য করে তীর বিদ্ধ করবেন, বুঝতে পারছি যে এবার বিদ্ধ করবেন, ঐ বধিরকেই বিদ্ধ করলেন—'বধির আলো দে অজ্ঞানকে'। যেন অজ্ঞান, বাচালতা এই জাতীয় কর্ণে যে কম শোনে ঐ জাতীয় অবস্থা তাতে মনে হয় অজ্ঞানকেই তীর বিদ্ধ করলেন লক্ষ্য ক'রে। তিনি বললেন, "দেখ্‌রে বাপু,—'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা', তুমি যখন জলে ডুববে তখন বাপ্‌কেও ক্ষমা করবে না, যাকে পাবে তাকেই আঁক্‌ড়ে ধরবে নিজে বাঁচবার জন্য। নিজে যদি আলোর মাঝে যেতে চাও,—তোমরা যে আলোতেই উদ্ভব, আলোই যে তোমাদের আলয়, নিজের সব গলদগুলো বলে ফেলা কিসের জন্য জান? তোমাদের হুঁশ করিয়ে দিচ্ছি, নিজেরে বানচাল........* যা বলে দিলাম, দু'ই হুঁশ হচ্ছি—আমিও হুঁশ তুমিও হুঁশ। তোমরা আমার গার্ড হলে আমি যে 'আকাম' করতে পারবো না, তোমরাও পারবে না—আমি দেখবো তোমাকে, তিনি দেখবেন তাকে, এভাবে সবাই সবাইকে দেখবে, কেউ এড়িয়ে যেতে পারবে না—Administration এভাবেই চলছে, প্রত্যেককে প্রত্যেকের পিছনে লাগিয়ে দেওয়াই administration। তবে মাঝে মাঝে.......† লাগাতে হবে, তবেই বুঝবে, বানচাল হলাম কি না হলাম তাতে কিছু নেই, নিজের সত্যটুকু ঠিক রাখবার জন্য সব-কিছু করা যায়;

* বাদ পড়েছে।

† বাদ পড়েছে।

আমার দাম্ভিকতা, আমার অহঙ্কার, আমার ক্রোধ, আমার মোহ, আমার ষড়্‌রিপুর যে জ্বালা—যদি জ্বলতে হয়, তবে জ্বালার নিবারণ করতেই হবে; আর ঐ জ্বালাতে যদি সাহায্য করতে হয় তবে জ্বালা বাড়িয়ে দিতে হবে। কোন কোন অসুখে জ্বালার মাঝেও জ্বালা দিতে হয়, আগুনে পুড়ে গেলে আবার আগুনেই হাত রাখতে হয়—এই জাতীয় treatmentও আছে। এখন জ্বালাই চলছে।" এভাবে ঠাকুর আমাদের সবাইকে সব-কিছু বুঝালেন।

তিপ্পান্ন

ঠাকুরের কাছে বসে* আলাপ শুনছি। ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলাম যে, মনকে কি ভাবে রাখা উচিত এবং সাধন-পদ্ধতি কি রকম হওয়া উচিত। আমাদের† প্রশ্ন করার সাথে সাথে ঠাকুর যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং বললেন, "তোমরা বরাবরই এক কথা বলছো, এক প্রশ্ন করছো, যতবারই বলি না কেন, তবু একই কথা। বিরাট যে কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে, তার fundamental principle একই, কল্পনা-রাজত্বে গেলে বহু মধুর story দেওয়া যায়, তাতে চাক্‌চিক্যই হয়—লোলা দিয়ে ছেলে ভুলানোর মতই-যে, তার মধ্যে সত্যতা কতটা রয়েছে সন্দেহ, তাই সত্য রূপের বেশী বর্ণনা প্রয়োজন হয় না; যেখানে 'হ্যাঁ' এবং 'না'র মধ্যে প্রশ্ন সমাধান সেখানে রসকষের বেশী স্থান নেই, তোমরা বলাতে চাচ্ছ যেন স্বর্গের মাহাত্ম্য-প্রকাশ—অমুক মাহাত্ম্য, সেই হরপার্ব্বতীর ব্যাপার, সেই শিবকালীর ব্যাপার, ঐ সমস্ত দেব-দেবীর আলোচনার মধ্যে তোমরা নিজেরা জড়াতে চাচ্ছ তাদের

---

* স্বামিবাগ, ঢাকা।

† রাজেন্দ্র লাল চক্রবর্ত্তী, অমৃত ব্যানার্জ্জি, শান্তি ব্যানার্জ্জি, ভূপেন ঘোষ, শচীন গুহ, প্রাণশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, গৌরী চক্রবর্ত্তী, মণ্টু রায়, অনিলচন্দ্র ঘোষ, ঊষারাণী দত্ত, ডাঃ ইউ-দাশগুপ্ত, সুধীর সোম, উপেন সেন, শ্যাম বিনোদ ঘোষ, অজিত মুখার্জ্জি, যদু নাথ রায়, ভূপেন্দ্র লাল রায়, ভূপেন রায়, অজিত ভট্টাচার্য্য, শান্তিদাস মজুমদার, বারীন ঘোষ আরো অনেকে।

বিষয়-সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে—সেই পার্ব্বতী কি করলেন ? শিব কি করলেন ? কালী কি করলেন ?—এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে story লেখা খুব সহজ—নানা মাহাত্ম্য ব'লে তোমাদের সামনে এগিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যিনি বললেন, তিনি শুধু গল্পই-যে বললেন, আমি বলছি বলে যে তাঁদের ঘটনা দেখেছি, ওদিক্ দিয়ে যে nil। ব্যক্তিগতভাবে ঐ সমস্ত নাড়াচাড়া ক'রে তাঁদের বিষয় নিয়ে তোমাদের কাছে বলাবলি, সেই রসপূর্ণ আলাপ আমার দ্বারা সম্ভব হবে না ; পুঁথি-গ্রন্থাদি পড়ে তাঁদের জীবন-চরিত পড়ে, তাঁদের কার্য্যকলাপের কথা পড়ে যে-ভাব আমি নিয়ে তোমাদের জানাবো, সে পরিশ্রমের মধ্যে নিজেকে জড়ানো সম্ভব হবে না। সুতরাং তাঁদের জীবনে কে কোন্ ভাবে সাধনা, জপ্, তপ্ করে গেছেন ; কে কি ভাবে ভগবৎ-অবস্থা প্রাপ্ত হলেন, বা 'ভগবৎ' হলেন, তাঁদের সম্বন্ধে পুঁথিশাস্ত্রাদি পড়ে জেনে নিও। তা অল্প কিছু খরচ করলেই তোমরা নিজেদের বোধে এনে নিতে পারবে, তার জন্য সরকারী বন্দোবস্ত যখন রয়েছে, একটু পরিশ্রম করলেই জেনে নিতে পারবে। আমার মুখে শুনলে যে বিশেষ কিছু হবে তা নয়, কারণ অভাবজনিত অবস্থার মধ্যে ভাব দেখাতে আমি ঘৃণা বোধ করি। সেদিন একজন সাধক এসেছিলেন। আমার সঙ্গে বেশ আলাপ হলো, তিনি অনেক তত্ত্ব বিষয়ে আলাপ করলেন ; অনেক দেবদেবী-সম্বন্ধে আলাপ হলো—চণ্ডী, ভগবৎ, গীতা, মহাভারত ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি ভাল করে আলাপ করলেন। শুনতে ভালই লাগলো, প্রতি মুহূর্ত্তে এমন গদ্গদভাবে আলাপ করছেন, প্রতি বিষয়ে 'আ-হা-হা, ই-হি-হি, উ-হু-হু,' আর সেই নেত্র—উর্দ্ধনেত্র ক'রে ঐ সমস্ত দেবদেবীর মাহাত্ম্য, জীবনচরিত, সাধনার পথপদ্ধতি তাঁদের সব-কিছু আলাপ করেছেন প্রায় চার ঘণ্টার মত। আমি কর্ণ পেতে শুনে উপভোগ করলাম, মন্দ লাগলো না। তারপর আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম,

'আপনি ঐ সমস্ত গ্রন্থ পড়ে যে অবস্থা প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে করছেন—কেন এ অবস্থাগুলো করছেন?' তিনি বললেন, 'আমি তাঁদের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলি এবং তখন আমি আর আমার ভেতর থাকি না; যখনই যাঁকে ধারণা করি, তখনই তিনি এসে আমাতে অধিষ্ঠিত হন।' আমি বললাম, 'শাস্ত্রগত ভাব, সেই সত্যের ভাব, সাম্য ভাব—সে-সমস্ত ভাব যদি মনের ভেতর রেখে প্রকাশ করতে পারেন তবে মন্দ কি, সত্যই যে প্রতিষ্ঠিত হবে; কিন্তু আরোপ হয়ে গেলেই ভয় কিনা—সর্পেতে রজ্জুভ্রম, মারাত্মক-যে সেখানেই; ছলে যে সত্যের আরোপ, অ-ভাবে যে ভাবের আরোপ—ভয় তো সেখানেই। সারা জীবনের শাস্ত্রের পরিশ্রম যদি এই অভিনয়ে এসে উপস্থিত হয়, পরিশ্রম ও সাধনাকে সেখানেই অমর্য্যাদা করা হয় কিনা।' তাই আমি সাধককে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার এক সন্দিগ্ধতা উপস্থিত হয়েছে, আপনার আলোচনাতে মিটিয়ে দিন্। যেখানে সত্যের সাধনা, জ্ঞানের সাধনা, সেখানে এই জাতীয় অবস্থার, নিজের উচ্ছ্বাসের যে প্রকাশ—এই অবস্থাকে কি অবস্থা বলে?' তিনি বললেন, 'ভাব এলে যে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারি না, সেই ভাবের মাঝে তন্ময় হয়ে যাই।' আমি বললাম, 'এই জাতীয় উচ্ছ্বাস কি সংযমতার পরিচয়? যারা ঘুড়ি উড়ায় ছাদের উপরে, তারা আনন্দে আত্মহারা হতে হতে যদি দিশেহারা হয়ে পড়ে, পদস্খলনের ভয় তখনই যে হয়, তাই প্রতি কাজে balance রক্ষা করে চলাটা কি সমীচীন নয়?—জ্ঞানের মর্য্যাদা সেথায়ই, ভক্তি সেখানেই বাঁধা থাকবে, ভাব সেখানেই এসে ধরা দেবে, প্রকাশ যে এক জায়গা হতেই।' তখন সাধক বেশ একটু মনমরা হয়ে পড়লেন এবং কথায় যেন একটু বিরক্তভাবও প্রকাশ করলেন। আমি বললাম, 'আমি এজন্যই আপনাকে বলেছিলাম, যেখানে অল্পেতেই

উচ্ছ্বাস সেখানে অল্পেতেই বিরাগ—যে পরিমানে আপনি গদ্‌গদ্‌ ভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন সে পরিমানে ব্যথাও পেয়েছেন ; যদি কঠিনতম অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াতেন তবে শত ঘাতেও আঘাত পেতেন না, তবে আগুন জ্বলে ফিরে আসতো ; কাঁচা মাটির গাঁথনিতে ঝড়ের ভয় যে প্রতি মুহূর্ত্তে থেকে যায়, যে বাঁধুনির পরিচয় আপনি দিচ্ছেন,— একটু আগেই যে পরিচয় দিলেন, এর পরই যে আর একটির পরিচয় দিলেন, দুটোকে একত্র করলে দুটোর চেহারায় যে অনেক পার্থক্য, কারণ নিজের উপর যখন নিজের confidence থাকে তখন যে যাই বলুক না কেন, সে তা হাসিমুখে উড়িয়ে দেয়, নিজের দৃঢ় বিশ্বাসকে চিন্তা করে খুশী মনে এগিয়ে যেতে থাকে। একজন ডিগ্রিধারী-ইংরেজী-শিক্ষিত লোক, ইংরেজী না-জানাদের মাঝে গিয়ে যদি ইংরেজী আলাপ করে, তারা যতই গালি দেউক না কেন, 'এ লোকটি কেন এত 'হিজি বিজি কিচিমিচি' করছে।' তাদের উপর রাগ হবে দূরের কথা হাসিমুখে নিজেকে এড়িয়ে নিয়ে চলে যাওয়া ছাড়া আর কিছু থাকে না। আপনার গদগদের উপর যদি সম্পূর্ণ confidence থাকতো, আমার একটুখানি ভাষণে ঐ চেহারায় পরিণত হ'তো না।' তখন সাধক বলছেন, 'রাগ কেন করবো, তবে শাস্ত্রে আছে যে, দেব-নিন্দা যেখানে হয় সেখানে কর্ণে অঙ্গুলি দিয়েই বসে থাকা উচিত, আমিও ঠিক তাই করছিলাম।' আমি বললাম, 'আপনার যন্ত্র কি খুব শঙ্কিত অবস্থায় আছে নাকি ? চোরডাকাতকে বুঝি খুব ভয় করে, এত ভীত হওয়ার কারণ কি ?—সন্দেহ যে সেখানেই দাঁড়াচ্ছে আপনার কথায়, এ তো নালানর্দ্দমার জল নয় যে এড়িয়ে এড়িয়ে সবার থেকে বেরিয়ে যাবে। সাগরের আর ভয় কি, সে তো বিরাট হয়ে পড়ে আছে সবার জন্য— সেখানে তার অঙ্গুলি কর্ণে দেওয়াই-বা কি আর না দেওয়াই-বা কি। অজস্র জিনিষ তার উপর দিয়ে ভেসে যাবে, তাতে তার কি আসে যায়, এতো আর ঠুন্‌কো জিনিষ নয় যে ভেঙ্গে যাবে, আর নিন্দার

বা কি হয়েছে, আলোচ্য বিষয়ের সমালোচনা বা জানবার স্পৃহা কি নিন্দামূলক ? আপনার সম্পর্কে আপনাকে বলে প্রতিটি কার্য্য জেনে নেওয়া—তা কি অন্যায় ? তাই আপনার অবস্থাকেই জানবার জন্য সব-কিছু বলা, আমি জানতে চেয়ে ছিলাম যে, শাস্ত্র যা-কিছু পড়েছেন তা কি হজমের অবস্থা না বদহজমের অবস্থা—সেটুকুই আমার জানা ; কিন্তু আপনার যা 'অবস্থা দেখলাম, তাতে মনে হলো বদহজমের অবস্থাই হয়েছে। বস্তুতঃ যদি হজমের অবস্থা হতো তবে একটা তৃপ্ততার বাণী আপনার থেকে বের হতো, কিন্তু আপনিও যেন কোন সন্ধিক্ষণে হালকা বৈরাগ্য তৈরী ক'রে দেবদেবীর দুঃখ, দৈন্য, দারিদ্র্য, হাবভাব তৈরী করে—কে কোন্ ব্যথা পেলো, কোথায় আঘাত পেয়েছে, কে আঘাত পেয়েছে, নানারকম দুঃখের কাহিনী চিন্তা ক'রে, বাস্তবেরই সুখ-দুঃখের মত এ জাতীয় রূপ ঐ জাতীয়তে প্রয়োগ ক'রে হাসিকান্নার অবস্থাতে পরিণত করছেন নিশ্চয়ই ; কারণ, আবেগ কিংবা এই ভাব কোত্থেকে আসছে আর প্রতি মুহূর্ত্তে নিজের চাঞ্চল্যের উপর নিজে সজাগ রয়েছেন—আপনাদের শাস্ত্রানুযায়ী যেই বৃত্তিতে যে বিক্ষিপ্ততাতে তাঁর দর্শন মিলে না, তাঁর নিকটে পৌছান যায় না, তার পরিচয় তো আপনি দিচ্ছেন, তা তো আপনাতেই আছে, আপনার গতিবিধিতেই তার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন।' তখন সাধক বললেন, 'আমার মনে চঞ্চলতা ও বিক্ষিপ্ততা দুটোই রয়েছে।' আমি বললাম, 'বলুন, আপনি বহু দুরে রয়েছেন।' তিনি স্বীকার করলেন যে গ্রন্থ-গণ্ডিতেই আবদ্ধ আছেন, তবে মন-সংযম করতে চেষ্টা করছেন। আমি বললাম, 'তবে এ জাতীয় অবস্থা কেন করছেন ? —নিশ্চয়ই ঐ আবেগটাকে সহজ করে রাখবার জন্য, ঐ জাতীয় স্মরণ রক্ষার্থে।' তিনি বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার ঐ বৈরাগ্যের ভাবটিকে সহজভাবে রাখার জন্যই এ ভাবগুলো প্রকাশ করি।' আমি বললাম, 'তারপর দেখা যাবে ভাব আর নেই, জাপানী মেসিনের মত হাত

নাড়ানাড়ি থাকবে, তখন ওটা springএর মত কার্য্যকরী হবে, তারপরে springগুলো হবে কি জানেন ? ঐ সমস্ত আবহাওয়া, যশ, মান, প্রতিষ্ঠা—এই সমস্ত ভেতরে গিয়ে এই সব লম্ফঝম্ফগুলো ঐ balance রাখবার জন্য স্বাভাবিক মতে বেরিয়ে আসবে, তখন ভাবের যা—তা'ই। এখনও যে আপনার সে সমস্ত না আসছে তা বলা যায় না, আপনার পরিচয়েতে আমার ধারণা—আপনাকে যশে মানে ঘিরিয়ে ধরেছে ; আপনি যদি বাস্তবিকই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হন, তবে সত্যই প্রকাশ করবেন—এই কাম্য। আমার বাক্য শ্রুতিকটু হলেও আপনাকে অপমান করা হিসাবে কিছু বলছি না, উভয়ের ভেতর সমাধান ক'রে নিচ্ছি। আপনি চিন্তা করে দেখুন আপনার অবস্থাগুলো,—যে ঊর্দ্ধনেত্রে প্রতি কথার জবাব দিচ্ছেন, কেন আপনি এত অঙ্গ বিকৃত করছেন ? এই বিকৃতির কারণ কি—এক সংস্কারে আপনাকে নিশ্চয়ই ঘিরে ধরেছে যে, এই সমস্ত ধ্যান, ধারণা, পাঠ ইত্যাদি না করলে ভক্ত বা সাধক বলে বলবে না। ঠিক সেই অনুযায়ী আপনার পরিধেয় বস্ত্র এবং আনুষঙ্গিক ঠিক সেইরূপ করতে বাধ্য করছে ; হতে পারে আপনি ত্যাগের ভেতর যাচ্ছেন, কিন্তু এটা যে এক জাতীয় ভোগ নয়, তা কি আপনি বলতে পারেন ? আমি যদি বলি এক জাতীয় ভোগ, এবং সে ভোগটা হলো—সাধক-চেহারা দেখাবার জন্য বা ভক্ত-চেহারা দেখাবার জন্য ঐ জাতীয় সাজে আপনি সেজেছেন। আপনাকে আমি আঘাতপূর্ণ কথা বলছি না, যদিও কথাগুলো আঘাত পূর্ণের মত, বলছি শুধু clear করবার জন্য ; আপনি জবাব দিন্।' সাধক তখন বললেন, 'তবে মাঝে মাঝে ও ভাবটা যে কিছুটা না আসে, তা নয় ; তবে চেষ্টা করছি, আর আমি তো খুব বেশী দূর অগ্রসর হতে পারিনি।' তার এই কিছুটা স্বীকৃতির মাঝেও আত্মসম্মান বজায় রাখবার একটা গুপ্ত প্রচেষ্টা রইলো—সে কিছুতেই সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করতে পারছে না।

তখন আমি বললাম, 'এ যে আপনার বিনয়ের অবস্থা, এতেও একটা অভিনয় ভেতরে রয়েছে। একটা ক্রোধের ভাব—আমি যে আঘাতের মত দিচ্ছি, তাতে যে রাগের ভাব—সহজাত ভাবে সেটাকে delivery দিচ্ছেন, আপনার উর্দ্ধনেত্রে এখন বৈষম্য ঘটছে, এখন কথায় কথায় নেত্র কিন্তু উর্দ্ধে যাচ্ছে না, নেত্র বড় হয়ে যাচ্ছে, রাগের প্রকাশ সূক্ষ্মেতে বেরিয়ে যাচ্ছে। আপনি ভুলে গিয়েছেন যে, আপনার নেত্র উর্দ্ধে নিতে হবে, এবং ভাবকে অবলম্বন করতে হবে, এখন নেত্রে বেশ আক্রোশপূর্ণ ভাব, কিন্তু delivery দিচ্ছেন বিনয়, নম্রতা ; সাম্যতার এই যে ছল, এক জাতীয় ভাব আপনার ভেতর যে চলছে—সাজবার জন্যই তো ? আপনি চিন্তা করে দেখুন।' সাধক কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ হয়ে চোখ বুজে সোজা হয়ে বসে রইলো। তারপরই তিনি বলতে লাগলেন, 'আপনি কথাগুলো ঠিকই বলেছেন। বৃত্তিগুলো আমার সবই ঠিক আছে, তবে বাইরে যা-কিছু করছি শুধু এটাকে সহজ করে নেওয়ার জন্য, লোকের কাছে এতেই বাহবা পাচ্ছি। তবে সত্যি কথা বলতে গেলে শাস্ত্র পড়াটা শুধু নিজের পাণ্ডিত্যকে জাহির করা ছাড়া আর কিছু নয়।' কথার পরই সাধক কেঁদে ফেললেন, তাঁর দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো, এভাবে তিনি সব-কিছু আমার নিকট স্বীকার করলেন। তাঁর এই সহজ এবং সরল স্বীকারোক্তির জন্য আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগলাম, 'আপনার না হওয়ার তো কিছু নয়, এতদিন শাস্ত্র পড়েছেন, পড়াশুনো করেছেন। সত্য বলার যে সাহস জন্মে গেল, এই সত্যকেই আপনি প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং নিজের বিষয় নিয়ে নিজে চিন্তা করুন, তখন শাস্ত্রগুলো আপনাকে স্বাভাবিক মতে সাহায্য করবে ; আপনার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার এবং এদিকে শাস্ত্রের উপদেশ সংমিশ্রণে আপনি এগিয়ে যেতে থাকুন—হতে বাধ্য, আমার আঘাত দেওয়া শুধু এরই জন্য ; কারণ, দু'টো বকা খাওয়া ভাল যদি নিজেকে নিজে একটু

বুঝে নেয়। যদি একটু বুঝি এখানে ফোড়া হয়েছে, তবে 'অপারেশন' করতে আমি ছাড়ছি না, তাই জোর করে 'অপারেশন' করছি বকাকে রোগীর বকা মনে ক'রে; 'অপারেশন' করার আগে ইতিহাস নিচ্ছি এটা 'ফোড়া' না 'টিউমার', কাটার প্রয়োজন আছে কি নেই, না কাটলে কোন অসুবিধা আছে কিনা, তাই আপনাকে এই ব্যতিব্যস্ত করলাম; দেখলাম ফোড়া, এবং পেকেছে, বেশী দিন হলে septic হওয়ার ভয় আছে, তাই আমি 'অপারেশনে' নেমে গিয়েছিলাম। কথাগুলো 'অহং' ভাবের বা আমি অহঙ্কার করছি—সেভাবেও আপনি নিয়েছেন, তা বলে তো আমি সত্যকে প্রকাশ করতে ছাড়িনি, বিনয়ের পরিচয়ও দেইনি, পরিচয় দিয়েছি সত্যের, সত্যকেই প্রকাশ করছি, অন্য চীৎকারে ভুললে তো চলবে না। রোগীর বহু চীৎকার আছে, আমি balance হারাতে পারি না, আপনি যে প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে balance হারিয়ে ফেলেছেন, আমাকে আপনি রোগী হিসাবেও তো ভাবতে পারতেন। তা আপনি পারলেন না, তাই আপনাকে অন্তরঙ্গ হিসাবে যতটুকু পারছি, যাওয়ার পথে বলে দিয়ে যাচ্ছি, এ যে আমি বলছি কিংবা আপনি বলছেন আমাকে, এটা শুধু ভাষার 'মারপ্যাঁচ'। বস্তুতঃ অভাব আসলেই তার পূর্ণতা এসে দাঁড়ায়। আপনার বোধ আমার বোধে এসে যে বোধের উদ্ভব করলো, সেই বোধে যে অ-ভাবকে বোধগম্য করা হলো, সেই ভাবটি বোধগম্য করে দেওয়ার জন্য যে অ-ভাববোধে নিয়মানুযায়ী 'নিবৃত্ততা'র মধ্যে যে গেলাম, এই ভাবে এই ভাবে উভয়ের উভয়ের পরিপূর্ণতার মধ্যেই পূর্ণতা কার্য্যকরী করে যাচ্ছে। আপনি জানালেন আপনার অভাব, আমি সেই অভাব নিয়ে অভাব বোধ করছি—কিসের অভাব বোধ করছি?—জানিয়ে দেওয়ার অভাব, এবং আদানপ্রদান যে আইনে গাঁথা আইনে বাঁধা, বস্তুতঃ আমিও নয়, আপনিও নয়, প্রয়োজনের

তাগিদেই এ চলছে প্রত্যেকের চাহিদাকে পূর্ণ করতে।' তারপর সাধক খুব খুশী মনে চলে গেলেন, এবং তিনি খুব আনন্দ পেয়েছেন বলে গেলেন—আমিও বেশ আনন্দ পেলাম। সেখানেই কথা হলো—গল্প বললে তো চলবে না, শিক্ষণীয় বস্তুকে শিখতে হবে, জানতে হবে এবং সেই শিক্ষণীয় বস্তুকে গেঁথে গেঁথে আনতে হবে, পরিচয় দিতে হবে। ঐ সমস্ত গল্প এবং আলাপ করার অবকাশ করে উঠতে পারছি না, প্রকারান্তরে ঐ জাতীয় আলাপ করবার পেছনেই এক জাতীয় তৃপ্তি রয়েছে, তার কারণ হচ্ছে ওর মধ্যে বেশ একটু গল্প, সাংসারিক কথাবার্ত্তা, মুখরোচক ঐ জাতীয় সাময়িক তৃপ্তি দিয়ে—তারপর আবার নেই। ও যে শ্মশান-বৈরাগ্য, ভাবের দরজায় আঘাত খেয়ে অভাবকে আঁক্‌ড়ে ধরে ওর মাঝেই খেই হারিয়ে, নিজের ভাবটি অভাববোধে নিয়ে, ভাবের খাতায় nil লিখিয়ে, বৈরাগ্যের বেলায় zero। ঐ বৈরাগ্যই যে হয় 'ডোমের' সামিল, সমালোচনার বেলায় হয় কাহিল। শাস্ত্রের গ্রন্থাদির বেলায়ও ঠিক ঐ জাতীয় পড়তে পড়তে পড়ার দিক্ দিয়ে পড়ে গেছে, কথায় কথায় শাস্ত্র, কথায় কথায় 'বুলি', বৈরাগ্যের বেলায় 'ডোম'—তখন মরার বাজনায় ডোমের নৃত্য বাড়ে। ঠিক শাস্ত্রের যে মারামারি, ফলে গিয়ে দাঁড়ায় যে কাটাকাটি, জয়পরাজয়ের ব্যাপারে হয় ঠোকাঠুকি—এতে যে যাকে মেরে আসতে পারে, বাড়ীতে এসে বেশ একটু বাহাদুরি নিলো; মারামারি কাটাকাটিতে যে মেরে আসতে পারে আনন্দ তার মধ্যে দাঁড়ায়, তখন হলো বোড়ের মারপ্যাচ্। কে কোন পাতার শ্লোক আওড়াবে, পাতার reference টেনে কার উপর আরোপ করবে, আনন্দ গিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে; আর যশ-মান-প্রতিষ্ঠা গিয়ে springএর কাজ করে, তখন হয় হাত ছোড়াছুড়ি, বংশমর্য্যাদার গালাগালি—ভাবের ঘরে ফাঁকি, বেশীর ভাগ তাই দেখা যাচ্ছে, সবার উপর এ-জাতীয় প্রয়োজ্য, তা তো নয়, তোমাদের তরফ হতে এখন

যা পাচ্ছি তা এ-জাতীয়ই পাচ্ছি। সুতরাং এই বিরাটের formula এবং যে formulaতে আমরা রয়েছি, সেটা বেশী বড় হতে পারে না fundamental principleএর উপর base ক'রে আমরা চলতে থাকবো, সেই fundamental principle তোমাদের জানা প্রয়োজন, এতো আর ছেলেমেয়ের গল্প নয় যে, শাখা-প্রশাখা বাড়িয়ে চললাম—প্রথম প্রেম, তারপর মেয়ের character, মেয়ের সাথে আর একজনেরও ভাব ছিল তার character, মেয়েয় বাপ ছেলের বাপ, তাদের আবার character,—এভাবে চলতে চলতে অনেক দূর চলে যাওয়া যায়, তারপর মাঝখানে কোন এক সন্ন্যাসীর সাথে সাক্ষাৎ, তারপর নদী. নালা, খাল, বিল তো পড়েই আছে, গল্পও ইচ্ছামত চলছে, তারপর ভাষাও ছন্দ যদি থাকে ঠিক, তবে তো হয়েই গেল। ঐ জাতীয় রসপূর্ণ ব্যাপার সাহিত্যে খাটতে পারে, তবে শিক্ষণীয় সবটাতেই রয়েছে। জীবনের যাত্রাপথে সেই সব ভাব তোমরা নিজেরা বসে বসে ভেবে ভেবে সাজিয়ে নেবে। তাই 'এক' হতে 'নয়' পর্য্যন্ত যে সংখ্যা—যেমন জেনে গেলে, বাড়ীতে যেয়ে 'কোটি' বসিয়ে নেওয়া—সেটা তোমাদের খেলা। বাংলায় ছত্রিশটি অক্ষর; এদের নাড়াচাড়া করেই যে ভাষার সৃষ্টি করা হয়, ভাবের তারতম্যতা তার ভেতর দিয়েই প্রকাশ হয়, নিজের 'ব্যক্ততা' প্রকাশ সেখানেই, তাই ব্যয় যে তোমার হাতেই—অক্ষরগুলো শুধু দিয়ে দেওয়া। প্রথম গাঁথনির প্রথম অবস্থার পরিচয় শুধু দিয়ে দেওয়া হলো, তারপর ইচ্ছামত তালার উপর তালা বসিয়ে নেও—আপত্তি নেই, পোক্ত তো রয়েছেই, সেই কার্য্যই যে spiritual guideএর।"

এরপর ঠাকুর প্রসঙ্গটা এখানেই শেষ করে উঠে পড়লেন।

চুয়ান্ন

খুব গরম প'ড়েছে। আমরা* কয়েকজন আছি†। ঠাকুরকে বাতাস করছি। মাঝে মাঝে তিনি দু'একটি ঘরোয়ালী কথা বলছেন। তিনি সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করছেন কে কেমন আছে। তিনি একটু পরিশ্রান্ত ছিলেন, কারণ আগের দিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বহুলোকের সমাগম হয়ে ছিল। এমন সময় দুজন ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হলো। তারা এসেই হাত গুটিয়ে কোনরকম সম্ভাষণ না জানিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায়ই ঠাকুরকে বলতে লাগলো, "দুটো কথা বলতে চাই, আপনি কি জবাব দিতে পারবেন?" তারা মনে হয় একটু রগচটা ধরণের লোক ছিল—সাধু-সন্ন্যাসীর নামেই ঐ রগদু'টো যেন মোটা। ঐ মোটা রগ দুটোর জন্যই সাধারণ ভদ্রতাও ভুলে গিয়েছিলো; যদিও ঠাকুরের নিকটা এ ধরণের কিছুই অস্বাভাবিক ছিল না; তাই তিনি হাসি-মুখে বললেন, "আপনারা বসুন, এসেছেন একটু বিশ্রাম করুন, তারপর আপনাদের যা বক্তব্য আছে বলুন।" ঠাকুর তখন আমাদের একজনকে বললেন, "দেখ্, ওদের একটু বাতাস দে।" তাই আমাদের মধ্যে একজন ঐ দু'ব্যক্তিকে বাতাস দিতে আরম্ভ করলো। বাতাস না পেয়েই মনে হয় রগদুটো টন্‌টন্ করছিলো,

---

* রবি ঘোষ, বি-এন্-রায়, নৃপেন রায়, শান্তি দাস মজুমদার, গোপাল ঘোষ, অহীন্দ্র ঘোষ, অজিত ভট্টাচার্য্য আরো অনেক।

† স্বামিবাগ, ঢাকা।

এরপরেই হয় তো বলতো, 'আপনি একা বাতাস খাচ্ছেন, আমাদেরও তো দেখা উচিত।' এ অবস্থাটা ঠাকুর বুঝতে পেরেই আগে থেকে উত্তরটা দিয়ে দিলেন। ঠাকুর একটু মুচকি মুচকি হাসছেন, আর ঐ ভদ্রলোক ছু'টিকে একটু রগড় ক'রে বলছেন, "আমি একটু লজ্জিত, আপনাদের flowটাকে বন্ধ ক'রে দেওয়ার জন্য; আপনাদের বলতে সুযোগ দেওয়াই উচিত ছিল, তবে তৃপ্তিও পেতেন, আমাকে অনুযোগও দিতে পারতেন।" তখন তারা বললো, "কেন, কি ব্যাপার?" ঠাকুর বললেন, "ব্যাপার কিছুই না, তবে এখনই বলতে যাচ্ছিলেন, 'বেশ তো মজা, আপনি পাখার বাতাস খাচ্ছেন, আমরা যে গরমে আছি তাতো খেয়াল করছেন না!' আমি দেখলাম, কথা শুনানোটাই যখন ভদ্রতা, আর পাখা চালালেই যখন সমাধান, সে চাওয়াতে না যেয়ে একটু খোঁচা মেরে কথা ব'লে নিজের জ্বালাটা মেটাতে চাইছিলেন; এই যখন ভদ্রতা, চাওয়া-পাওয়া-সম্পর্কে কতটুকু দৌড় এই থেকেই বোঝা যায়।" শুনে ওরা যেন একটু অবাক্ হলো। ঠাকুর তখন বললেন, "অবাক্ হচ্ছেন কেন? সহজজাত মন না করলে, সহজ ভাবে যদি চাওয়া না শেখা যায়, সহজভাবে জিনিষ মিলে না। গরম হলেই যখন ঠাণ্ডার দরকার বোধ করছেন, একটু মুখ ফুটে বললেই তো সব চুকে যেতো। তা না করে বক্রতার দিকে চলে যাচ্ছেন, এই ভাবে বক্রতা যদি সর্ব্ব জায়গায় applicable হয়ে থাকে, সর্ব্ব জায়গায় বেঁকে বেঁকে দাঁড়িয়ে থাকে—তার আর একজন যে দাঁড়াবে বেঁকে তাতে আর বিশেষ কি; সুতরাং মূলে রগড়ু'টো ফুলবে এতে আর দোষ কি। যাক্ আপনাদের বক্তব্য কি বলুন।" দেখা গেল তারা চুপ করে একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে, আমরা বহু লোক বসে বসে কথা শুনছি। হঠাৎ ঠাকুর বলে উঠলেন, "আমার কাছে একটা ঔষধ

আছে, খেয়ে নিন, তবে আপনার কথা বলতে একটু সহজ হবে।" ভদ্রলোক বললো, "কেন, কেন, কি হয়েছে?" ঠাকুর বললেন, "সৃষ্টিতেই যদি গোল হয়, তবে সবই গোলমাল হয়ে যায়, সব বিগ্‌ড়ে যায়। সেই প্রথম থেকে যখন বীজের উদ্ভব হলো, বীজ দিয়েই তো গাছ—সেই 'বীচি'তেই যদি গোলমাল হয় তবে সেখানেই পড়ে থাকবে—খোসা ছাড়া আর কি থাকবে, সারহীন অবস্থা খোসা মাত্র। আপনি যে কথাবার্ত্তা এখন বলবেন তা খোসা-জাতীয় তো? সুতরাং আপনি ঔষধটা নিন, তারপর কথা বলুন।" ভদ্রলোক মনে হয় কিছু বুঝতে পারেনি। আর আমরা সবাই ভাবছি, 'কি ব্যাপার!' ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলো, "আপনি আমায় বার বার ঔষধ খেতে বলছেন কেন?" তিনি বললেন, "ব্যবস্থা আমার আছে, ব্যবস্থায় যদি আসেন, তবে প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হবে।" তখন ভদ্রলোক বললো, "আচ্ছা, আমাকে এসব কথা কেন বলছেন?" ঠাকুর বললেন, "না, বলছি অণ্ডকোষে খুব ব্যথা আরম্ভ হয়েছে কিনা, এই অণ্ডকোষেই শুক্রকীটের সৃষ্টি হয়, তাকে 'বীজ' নামে গণ্য করলাম, কাজেই অণ্ডকোষ না থাকলে তো সৃষ্টি হতে পারে না; সুতরাং এটাই বীজের সৃষ্টি করছে, সেই সৃষ্টির অগ্রেই যদি গোল থাকে, তবে সৃষ্টি হবে কি করে? তাই বার বার বলছি বীজের দরকার। বীজের মূলঘাটি যদি পোক্ত ক'রে না দেওয়া হয়, তবে সৃষ্টিই-যে বৃথা।" ঠাকুর আরো বললেন, "ওদের বোধ হয় রগের টানে টান পড়ে ছিঁড়েই গেছে, ছিঁড়ে যাওয়ার আগে দু'একটা বাড়ি খাওয়াতে 'তুঁহু 'তুঁহু' আওয়াজের মত বলছে, মানে, 'তুমি' তুমিই সব—হাম্বা ডাক ভুলে গিয়েছে, একই গাভীর নাড়ে প্রথম 'হাম্বা'; সেই নাড়েতেই 'তুঁহু' মৃত্যু-অবস্থায়, ওদের মনে হয় সেই অবস্থা।" তখন আভিজাত্য, দাম্ভিকতা, বহু দিনের সঞ্চিত অভিমানমিশ্রিত গুরুগম্ভীর ধ্বনিতে লোকটি বলে উঠলো,

"আমার কি উপায় হতে পারে?" ঠাকুর বললেন, "অস্ত্র তো আছেই, 'অপারেশন' করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।" সে বললো, "যদি মনে করেন সেরে যাবে, তবে করুন।" ভদ্রলোক কিন্তু এর ভেতরই অন্য রকম হয়ে গেছে, তার আর আগের অবস্থাটি নেই। ঠাকুর বললেন' "যাও, স্নান করে এসো।" তারা সবাই স্নান ক'রে এলো। তিনি তাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

পঞ্চান্ন

একদিন আমরা* সব বসে আছি†, ঠাকুরের নিকট বহু লোকের সমাগম হচ্ছে। কেহ বসে আলাপ শুনছে, কেউ প্রণাম ক'রে চলে যাচ্ছে। আলোচ্য বিষয় ছিল 'বিভূতিবাদ'। ঠাকুর বললেন, "দেখ, এই যে বিভূতি একজনে দেখাচ্ছে বা একজনের দ্বারা হচ্ছে, এই বিষয়বস্তু যে আর একজনে বুঝবে বা বুঝাবার জন্য সেটা সহজভাবে বোধগম্যতে আনবে, তাহাও ভাববারই বিষয়। বিষয়-বস্তু যদি একটু তলিয়ে চিন্তা করে, তবে খুবই সহজ বিষয়। যে জিনিষ কখনও দেখেনি বা শোনেনি, তার কাছে ঐ জিনিষটা একটু আশ্চর্য্যকরই হয়ে দাঁড়ায়। বিদেশে সত্তর-আশী-নব্বই তালা 'বিল্ডিং' রয়েছে—একতালা 'বিল্ডিং' দেখে যার অভ্যাস, বা যে দেখেনি কুঁড়ে ঘরে যার শুধু বাস, তার পক্ষে ঐ জাতীয় কথা— অবাক্ হবারই যে। আবার একটু চিন্তা করলেই জিনিষটা বোধ-গম্যে এনে নেওয়া যায়। একতালা যে দেখেছে, এবং চিন্তা দ্বারা স্বাভাবিক মতে পোক্ত ক'রে ক'রে তার উপর যে বহু তালা স্থাপন করা যেতে পারে, সেটা একটু গভীর চিন্তা করলেই সমাধানে আসে। কুঁড়ে ঘরে বাস, তাকে বুঝিয়ে দিলে সে বুঝে নিবে যে

---

* প্রাণশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, হরিপদ দেব, হরিবন্ধু রায়, গোপাল ঘোষ, ভুপেন রায়, রবি ঘোষ, অঞ্জলি রায় চোধুরী, প্রমীলা রায়; গৌর পাল, চুনী বসাক, গুরুদাস বসাক, জগদীশ দাশ, শান্তিদাস মজুমদার, বারীন ঘোষ আরো অনেকে।

† স্বামিবাগ, ঢাকা।

হতেও পারে। যে-কোন এক বিষয় মন্তব্য করবার আগে জিনিষটা জানবার জন্য আগ্রহ থাকা দরকার। সাধারণতঃ এখানকার বেশীর ভাগ লোক হঠাৎ একটা কিছু শুনে, অবাক্ হবার সময় না নিয়ে, অবিশ্বাসের খাতায় নাম লিখিয়ে উড়িয়ে দেওয়াটা যেন বিধেয় মনে করে। কল্পনার খাতায়ও যদি একটু চিন্তা রাখে, তবু এটাকে বাস্তবে একটু রূপ দিয়ে, নিজের মনের সাথে সমঝিয়ে সমঝিয়ে একটা বর্ণনার মাঝে সেটাকে নিয়ে পৌঁছিয়ে মনকে সাময়িক এক জাতীয় আস্থাপূর্ণ অবস্থায় নিতে পারবে। চিরস্থায়ী না হয় পরে করুক, স্থায়িত্বপূর্ণ চিন্তা যখন মনে প্রতিষ্ঠিত হবে—তাই জ্ঞানবান ব্যক্তি বা চিন্তাশীল ব্যক্তি যে-কোন কথা, যে-কোন বার্ত্তা, যা'ই শুনুক বা তার গোচরে আসুক, হঠাৎ কোন মন্তব্য না ক'রে, একটুখানি সময় নিয়ে, সে সমস্ত বস্তুর চিন্তাতে মগ্ন হয়ে তার প্রকৃত রূপকে নিতে বা ভেতরে আনতে চেষ্টা করে; তারপর যার যার যে বিষয় অবগতে এসেছে বা দেখেছে বা শুনেছে, তাদের সংখ্যা গণনা ক'রে তাদের প্রত্যেকের মর্য্যাদা চিন্তা করে—কে কোন পর্য্যায়ে বিরাজ করছেন, বা অধ্যায়ে বিরাজ করছেন, বক্তব্যের কতটুকু তাদের জোর—তাদের সেভাবে study ক'রে তারা যখন বলছে, কোন প্রয়োজনে বলছে, তার মানে কি, তাদের উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব কিনা, সম্ভব না হলে তাদের বক্তব্য বস্তুগুলো চিন্তার মধ্যে এনে বের করতে চেষ্টা করতে হবে, প্রকৃত রূপকে বের করার চিন্তা করতে হবে যদি তাদের চিন্তার পেছনে কোন স্বার্থ না থাকে—বলার জন্য বলা, শেখাবার জন্য বলা—মিছে কিংবা ফাঁকির যদি সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য না থাকে, ঐ জাতীয় বলার ভেতর কত সংখ্যা, একই জাতীয় বলাকে এসে বলছে, তা জেনে, বুঝে, শুনে ঐ জাতীয় একটা চিন্তার খোরাক মনে ক'রে প্রকৃত সত্য বস্তুর সন্ধানে যাওয়া প্রত্যেকের কর্ত্তব্য; আর যে যাই বলুক, প্রকৃত চিন্তা ক'রে প্রত্যেকটির

উত্তর দেওয়া উচিত। হঠাৎ মন্তব্যে ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না, সেটা 'হালকা'রই পরিচয়। আজ তোমরা যে সমস্ত বিভূতি আমার দেখছো কিংবা এ জাতীয় বিভূতি যদি আমার না দেখতে, তোমাদের বেলায়ও কি যে হতো ভাববার বিষয়। তাই আজ যা যা দেখেছো বা বহু লোকে দেখেছে, প্রত্যেকটি powerএর যে খেলা—আমি তার কোনটাই দাম দিচ্ছি না, আমার রূপ দেওয়া হচ্ছে প্রত্যেকটি ব্যাপারে মনের একাগ্রতায় কতটুকু যে দাঁড়াতে পারে বা শক্তির কতটুকু যে প্রকাশ হতে পারে, আমার দ্বারা যদি হয়ে যায়, তবে তাহা শুধু শিক্ষণীয় ব্যাপারে; আমার বক্তব্যের ভেতর প্রত্যেকটি বিচারশক্তির দ্বারা তোমাদের বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করছি, এবং কোন অবস্থাতে যশ, মান, প্রতিষ্ঠা নিয়ে নেওয়াটাও অযৌক্তিক ও অবিচার মনে করি—প্রকৃত শক্তি-বিকশিত ব্যক্তিগণ ঐ জাতীয় অবস্থাটা সেই শক্তির দ্বারা যে আসে না, তাহাই বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করে। শক্তিমান্ ব্যক্তি যাঁরা, যাঁরা সর্ব্ব-অবস্থায় বিরাজিত, তাঁদের সর্ব্ব ধাপে ধাপে সমতুল্য অবস্থায় নিয়ে নিতে পারেন এবং সমস্ত বৃত্তি ইত্যাদি 'আমিত্ব'তে এনে তার মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, সুতরাং বৃত্তির কোন শিথিলতা আসতে পারে না—শুধু শক্তির দ্বারাই সম্ভব। শক্তিমান ব্যক্তি যিনি, তাঁকে না জানিয়ে তাঁর মন কোন অবস্থায়ই বিচলিত হতে পারে না—ইহাই শক্তিমান্ ব্যক্তির রীতি এবং নীতি। বাস্তবে বহু জাতীয় কথোপকথন হয়, এবং তোমাদের মুখেও সেই জাতীয় শুনে, কি মহানের*......মহানের.......†
এ সম্বন্ধেও আমার বক্তব্য আছে। যাঁরা মহান্ ক্লাসে দাঁড়িয়েছেন, মহান্‌রূপে শক্তির দিকে বিরাজিত, পতনের দিক্

* বাদ পড়েছে।

† বাদ পড়েছে।

দিয়েও তাঁরা বেশ হুঁশিয়ার, উত্থানপতন-সম্বন্ধে তাঁরা অবগত, সুতরাং তাঁরা যে-কোন কার্য্য যে-কোন অবস্থায় করেন, তাহা শক্তির দ্বারাই করে থাকেন। তাঁদের ব্যক্তিগত কতটুকু ক্ষতি হচ্ছে বা না হচ্ছে তাঁরা নিজেরা খুব 'হুঁশ'। এই শক্তির বিকাশ শক্তির দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যই—হাবভাবে গতিবিধিতে কতটুকু তাঁকে আট্‌কাতে পারি, আট্‌কাবারই-বা কি আছে, যা-কিছু গতিবিধি সমস্ত, সব-কিছুই শক্তি বৃদ্ধির জন্য, এগিয়ে যাওয়ার জন্যই তো এই বাস্তবতা—সেই গতিবিধিতে উঠিয়েও দিতে পারে। শক্তি যখন ক্রমশঃ ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে, এই ভাবে এই ভাবেই সৃষ্টি নিজে শক্তিমানেরই পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে—সবই তো এই শক্তির বিকশিত অবস্থার জন্য। শক্তিমান হতে যখন সৃষ্টি, সৃষ্টি যখন নিজে শক্তিমান, আজ যে অবাক্ বা আশ্চর্য্য বা অবিশ্বাস্য—এসব জানবার জন্যই এ সমস্ত উদ্ভব; অনুসন্ধিৎসা, আগমন ঐ সমস্ত অবস্থা হতেই হয় উদ্ভব। তবে ঐ জাতীয়েরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এগিয়ে যাওয়ার জন্য, balance create ক'রে নিজের গতিবিধিগুলো যেন চালিয়ে নিতে পারে, তার অবস্থার জন্যই প্রাথমিক শিক্ষা, তাই কথাগুলো বলা। তোমরা যে বিভূতি দেখছো কিংবা কাউকে গিয়ে বলছো, তাতে তোমরা সময়ে আঘাতও পেয়ে আসতে পার কিংবা বিদ্রূপের মাঝে গিয়েও তোমাদের পড়তে হতে পারে। যে জাতীয় শক্তি তোমরা দেখছো আমার কর্ত্তব্য হচ্ছে তোমাদের জানিয়ে দেওয়া, বুঝিয়ে দেওয়া। শক্তি-সম্বন্ধে confirmed হয়েছো এবং হবে বলে যে ভেবে নিয়েছ, তাতেই এক জাতীয় তৃপ্তি আমার। আজ তোমরা বলাবলি করছো কিংবা আর একজনকে বলছো কিংবা যেভাব ছড়িয়ে পড়ছে, অনেকে আমার সঙ্গে শুনে এসেও আলাপ করছে। এক জাতীয় চিন্তাধারা তাদের ভেতর জানিয়ে দিচ্ছে আমার বিভূতি-সম্পর্কে; আমি নিজে ইচ্ছুক নই, আবহাওয়ায় আমাকে বলা নিষেধ করে দিচ্ছে, সহজ কিংবা সরল কিংবা চিন্তা করার মত যদি বেশীর

ভাগ পেতাম, তবে আমার সরল উক্তি ফুটে উঠতো, যা রয়েছে আমাতে। আজ সরলতার ব্যাঘাত তারাই করছে, তাদের সঙ্গে মিশেই এক জাতীয় রং দিয়ে যাচ্ছি, তারা বিশ্বাস করুক বা অবিশ্বাস করুক সে-বিষয়ে আমার বক্তব্য নেই ; বক্তব্য হচ্ছে আমার শক্তিগুলো যারা দেখেছে বা আলোচনা করেছে—স্বপ্নে যেমন সম্ভব একজনের উড়ে যাওয়া, vanish হওয়া কিংবা বহু ঘটনার মাঝে যে অদ্ভুত পরিচয় পাচ্ছে স্বপ্নে, বাস্তবে সে-শক্তিসম্পর্কে আলোচনা ক'রে আমি এই বাস্তবে এই বিভূতিসম্পর্কে কল্পনার মাঝে স্বপ্নবৎ অবস্থা তাদের দিয়ে যাচ্ছি এবং জানিয়ে দিচ্ছি যে, আমার শক্তি তারা যেন প্রথমতঃ এই অবস্থাকে স্বপ্নবৎ ব'লে মেনে নেয়, তারা যেন সেই স্বপ্নকে চিন্তা ক'রে ক'রে দেখবার ও জানবার প্রয়াস যেন করে—ব্যাপারটা-সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য, যখন কার্য্যকরীতে তারা আসবে, যদি একটুখানি রেশ তারা পায়, তবেই হবে সেখানে স্বপ্নের সফলতা ; তখন আমার এ সমস্ত বক্তব্য বা শক্তির বিকাশ যা দেখেছো ও বলছো, তখন স্বপ্ন আর স্বপ্ন থাকবে না, কল্পনা থাকবে না, বাস্তবে তা সত্যতার রূপ দেবে। তাই তোমরা যখন একজনের সাথে আলোচনা করবে, সমালোচনা করবে তখন তোমরা ঐ জাতীয় অবস্থায় বুঝে নিতে চেষ্টা করবে—বিদ্রূপ তোমাদের শুনতেই হবে, উপদ্রবের মাঝে এই জাতীয় সমালোচনা হবেই, সুতরাং তোমাদের দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই সেখানে। দেশের আবহাওয়া, পরিস্থিতি, কার্য্যকলাপ যখন কোন অবস্থায় চলতে থাকে, তোমাদের সত্য রূপটিকেও সত্য ভাবে বলবে ; এই বলবে, 'আপনারা একবার চিন্তা ক'রে কার্য্য ক'রে মন্তব্য করবেন'। এ ছাড়া তোমাদের বলার কি আছে ?—তোমাদের দায় পড়েনি যে বিশ্বাস করাতেই হবে। তোমরা এ-সম্পর্কে নিজেরা conscious হয়েছ, বুঝে নিয়েছ—এতেই তোমাদের তৃপ্তি।" তারপর বহুলোকের ভিড় হয়ে যাওয়াতে আলাপটা এখানেই বন্ধ হয়ে গেল, তিনি আরো বলতে

চেয়েছিলেন কিন্তু আর বলা হয়নি, কারণ একটা রোগী* এসে কান্নাকাটি করছিলো এবং কান্নাকাটি করাতে তিনি ইচ্ছে করেই এই আলাপ বন্ধ করে দিয়ে সেই রোগীকে আশ্বাস দিলেন, "তুমি ভাল হয়ে যাবে" এবং সঙ্গে সঙ্গে আশীর্ব্বাদ-ফুল দিয়ে দিলেন, এবং বললেন "ছয়দিনের মধ্যে ভাল হয়ে যাবে, ছয়দিন পরে তুমি আমার কাছে ফিরে আসবে।" ঠিক ছয়দিন পরে ভাল হয়ে সে দীক্ষা নিয়ে গিয়েছে। আমরা যতটা পেরেছি লিখেছি, কিন্তু এ বিষয়বস্তু-সম্পর্কে তাড়াতাড়ি লেখা যায় না, যতটা পেরেছি প্রাণপণ চেষ্টা করে লিখেছি।

---

* প্রাণ বল্লভ দাস।

ছাপ্পান্ন

পৌষ মাস। কন্‌কনে ঠাণ্ডা পড়েছে। বিহঙ্গকুলের প্রভাতী কাকলি তখনও আরম্ভ হয়নি। বিছানায় বসে আছি ঠাকুরের ডাকের অপেক্ষায়। এমন সময় ঠাকুর বললেন, "শান্তু*, তুই-না কাল কি একটা বলবি বলেছিলি ?" আমি বললাম, "ঠাকুর, 'বিক্ষিপ্ততা' সম্বন্ধে সেদিন যে বললেন সেটা খুব ভাল করে বুঝতে পারিনি, সেটা যদি আর একটু সহজ করে বলে দেন, তবে বড় ভাল হয়।" ঠাকুর বললেন, "আচ্ছা তবে শোন্‌,—মনের 'বিক্ষিপ্ততা' বলে যে এখানকার আখ্যা দেওয়া হয়েছে, সেই 'বিক্ষিপ্ততা' হতে আমরা কি কি পাচ্ছি—শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি, যার যার ব্যক্তিগত প্রকাশ, যাকে বলে instinct। আরো চমৎকার ! এই বিক্ষিপ্ততা হতেই কতকটা percent একত্র হলে আমারই মত আর একটি রূপের বিকাশ, আর বহু percent বিক্ষিপ্ততা তাতে রয়েছে, তাতে আবার সৃষ্টি করছে বহু কিছু, একই timeএ আমার মত আর একটি রূপের বিকাশ হওয়ার অবস্থাতে— ভয়, ভীতি, আতঙ্ক, আত্মমর্য্যাদা, প্রেমের উচ্ছ্বাস, উত্তেজনা-বৃত্তির নিবৃত্তি, আগে পাছে এই সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচ্য বিষয়ে মনোনিবেশ করা, কতগুলো দিনের মনের ব্যয়িত অবস্থা হয়ে একটি অবস্থা স্খলিত অবস্থায় যেমন পরিণত হয়, তা'ই সৃষ্টিতে পরিণত হয়ে ঠিক আমারই মত আর একটিকে রূপ দিচ্ছে। সেই বিক্ষিপ্ততায় রয়েছে নৈরাশ্য,

---

* শান্তি দাস মজুমদার (ঠাকুর 'শান্তু' বলে ডাকেন)।

স্থান :—স্বামিবাগ, ঢাকা।

হতাশা—মনের যত আকুলতা-চঞ্চলতা কোনটাই কমছে না, কিন্তু রূপদান করতেও কার্পণ্য হচ্ছে না ; instinct সর্ব্বত্র সর্ব্ব জায়গায় প্রযোজ্য—স্রষ্টা সৃষ্টি করছে, আবার প্রত্যেকের মধ্যেই স্রষ্টা নিজে উদ্ভব হচ্ছে, সৃষ্টি করছে আর একটি স্রষ্টাকে। ঠিক যে জাতীয় যে জাতীয় হতে উদ্ভব, ঠিক সেই সেই জাতীয় জাতীয়তার অবস্থাতে দেহ, মন ঐ ঐ জাতীয়তাতে যাওয়ার জন্য শক্তিগুলোও যেই যেই ভাবে আগমন, আবার ফিরে যাওয়ার বেলাতেও তাই। যা আজ বিক্ষিপ্ততায় রয়েছে, instinct বলে বলছে, তা দিয়েই অন্যান্য সৃষ্টির মত স্রষ্টা হয়ে সৃষ্টি ক'রে ক'রে সেই মূলে এই সকল নিয়েই যেতে হবে এবং যাওয়ার রাস্তাতে এমনি ক'রে পিণ্ড হতে ডালপালা বের হয়ে হয়ে হাত-পা-অঙ্গাদির মত ক্রমশঃ ক্রমশঃ শৈশব হ'তে বার্দ্ধক্যের চরম অবস্থা পর্য্যন্ত এমনি করে দেহের অঙ্গাদি পরিবর্ত্তিত হয়ে আসছে—এমনি করে 'পরিবর্ত্তিত' হতেই, সৃষ্টির ভেতর দিয়ে দিয়ে ঐ মনোজগতের বা শক্তিজগতের বিভিন্নতার ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হবে। বিভিন্নতার অবস্থার দ্বারা যেমন সেই উদ্ভব হতে আজ যে মনের অবস্থা চলছে 'বিক্ষিপ্ততা', তার মধ্যে নৈরাশ্য, বিফলতা, সফলতা, দুঃখ, দৈন্য, দারিদ্র্য, জ্বালা, যন্ত্রণা—এইগুলো শক্তিরই বিকাশ এবং এ-সমস্ত mixture হতেই mixture তৈরী ক'রে ক'রে যার যার medicine প্রয়োজনে প্রয়োজনে বেরিয়ে যাচ্ছে—রোগের উপশম সেখানেই এবং এই সমস্ত শক্তি নিয়েই যখন সব শক্তি সমভাবে focus করবে, তখন প্রত্যেকটি জিনিষ আমাদের অবগতে আসবে সেই সঞ্চিত শক্তি হতে। যে-কোন মনস্তত্ত্ব বা ভূত-ভবিষ্যৎ বলা, জন্মের সূত্রপাত হতে যেমন ডালপালা বেরিয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচয় দিচ্ছে, তেমনি বিক্ষিপ্ততা হতে এই শক্তিগুলো ক্রমশঃ ক্রমশঃ বেরিয়ে এই শক্তির পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে, যেমন,—বহুপ্রকার

তূলা mixing roomএ একত্র করে খুনে খুনে Blow-roomএ নিয়ে পিজে পিজে lap তৈরী করে, lapকে Cardingএ নিয়ে তারপর আস্তে আস্তে Inter, Slubbing ও Rovingএর ভেতর দিয়ে spinningএ নিয়ে একেবারে সূক্ষ্ম সুতায় পরিণত করে—এখানেই হলো finishing, এটাই হলো kind of vanishing; End যেখানে হচ্ছে, সেখানে vanishing শক্তিগুলোও প্রথম সৃষ্টি; movements কার্য্যকলাপের সাথে সাথে তত্ত্ববিদ্‌রা ক্রমশঃ ক্রমশঃ সৃষ্টির মধ্যে মনোনিবেশ করে—সেই বস্তু সূক্ষ্মতার সাথে উদ্ভব হয়েই শক্তির পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে।"

—

সাতান্ন

আমরা* একদিন গ্রামের† দিকে গেলাম। কোন এক ভক্ত‡ ঠাকুরকে নিয়ে গেল। সঙ্গে আছি আমরা কয়েকজন। নিতান্ত প্রয়োজন না পড়লে সাধারণতঃ তিনি ভক্তদের বাড়ী যেতেন না। একজন ভদ্রমহিলার অসুস্থতার জন্য গ্রামে যাওয়ার প্রয়োজন হয়, কোন spirit নাকি তার উপর ভর করে, তখন তার চেহারা চালচলনও ভীষণাকার ধারণ করে—সাধারণ মহিলাটিকে ছয়সাতজনেও ধরে রাখতে পারেনা। তার সুস্থতার জন্য ঠাকুরকে নিয়ে গেল। গ্রামে আরো অনেকে দীক্ষা নেবে—সেই উপলক্ষেই তিনি গ্রামে গেলেন। ঠাকুরের আত্মীয় বাড়ীও সেই গ্রামে আছে, তিনি প্রথম সেই বাড়ীতে উঠলেন। তারপর ঐ ভদ্রমহিলাটিকে দেখবার জন্য গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখেন ঐ মহিলাটি ভাবে বিভোর হয়ে আছে—চুল উস্কখুস্ক, যাকে কাছে পায়, তাকেই গালাগালি করে। বাড়ীতে দেখলেন বহু ওঝা, ফকির রয়েছে, যার যত কেরামতি আছে তার উপর ঝাড়ছে, কোনটাতেই ধরছে না। ঠাকুর গেলেন, গিয়ে ঐ চেহারা দেখলেন। তারপর ঠাকুরকে বসতে দিলো, তিনি বসলেন। বহুলোক এসেছে, ঠাকুর ঐ মহিলাটির হাবভাব লক্ষ্য করছেন। আমরা দুইতিনজন সেখানে

---

* সতীশ চন্দ্র সাহা, অমূল্য বসু, শচীন দাস, বিনয় পাল, অজিত ভট্টাচার্য্য।

† বিক্রমপুর।

‡ সতীশ চন্দ্র সাহা।

আছি। ঠাকুর মুচকি মুচকি হাসছেন আর আমাদের বলছেন, "তাল-বেতালের রোগ দেখছি, ঔষধে কি ক'রে সারবে, রোগই যে ঐ ধাঁচের, যত ঔষধই প্রয়োগ করুক না কেন, সে-যে কিছুতেই সারবে না, যাকে বলে এক কথায় 'জেগে ঘুমানোর মত'— কিছুতেই সে উঠবে না, জাগবে না।" তিনি বললেন, "তাবিজ কবচ যা আছে সব খুলে রেখে দেও, ওঝা ফকিরদের সব দূরে সারয়ে দাও।"—তাই করা হলো। তারপর ঠাকুর বললেন, "এক গ্লাস জল আন তো।" এক গ্লাস জল আনা হলো, তিনি অঙ্গুলিদ্বারা স্পর্শ করলেন, তারপর ওকে খাইয়ে দিতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর বললেন, "দেখ, এই জল খাওয়ার সাথে সাথে তোমার সেই 'spirit' চলে যাবে; আর যদি spirit শক্তিশালী হয়ে থাকে, আর বাস্তবিকই যদি তোমাকে ধরে থাকে, তবে এই জলে তাহা কার্য্যকরী হবে, নতুবা 'ভেক্' বলে বুঝা যাবে।" ভদ্রমহিলাকে এই কথা বলার পর ঠাকুর একটু বাইরে যেতে চাইলেন, যে ভক্তটি নিয়ে এসেছিল, সে ঠাকুরকে বাইরে নিয়ে এলো, আমরাও সাথে সাথে বেরিয়ে এলাম।

ঠাকুরের নিকট আমরা ঐ মহিলাটির সম্বন্ধে জানতে চাইলে ঠাকুর বললেন, "ও কি করবে চিন্তা করছে, কারণ বেশ কিছু দিনের prestige, status গুছিয়ে আছে এবং কেউ তাকে সারাতে পারছে না--এও একটা সূক্ষ্মে গৌরব তার মধ্যে রয়েছে এবং সবাইকে যে সে নাকাল বানিয়ে দিচ্ছে, এও সে একটা অহঙ্কার মনে করছে এবং এমনভাবে তার গতিবিধি movementsএর পরিচয় দিয়েছে যে হঠাৎ করে চলে যাওয়াটাও ফাঁকি মনে করবে; ওঝা বৈদ্যেরা কথোপকথনে আরো পাকা ক'রে দিয়েছে। ওঝারাও তাদের নিজেদের অক্ষমতার জন্য এমন কিছু বলতে বাধ্য হয়েছে, 'এমন জিনিষই এসেছে, একমাত্র মহাদেব স্বয়ং না এলে এই spirit ছাড়ানো কারুর পক্ষে সম্ভব নয়';

সুতরাং ওঝা ফকিররাও এক জাতীয় prestige অসামর্থ্যের মধ্যেও নিয়ে গেল—এদের পরই মহাদেব, সুতরাং সাংঘাতিক কথা। আর যার রোগ সে আরো পাকাপোক্ত করতে সুবিধাও পেয়েছে, আবার সে-অনুযায়ী পূজোপার্ব্বন, খাওয়া-দাওয়া, হৈ-চৈও চলছে। তাই জল খেয়ে কি করবে, কি করতে হবে, চিন্তা করতে আরম্ভ করছে।" কথা বলতে বলতে ঠাকুর হঠাৎ থেমে গেলেন ও ঘরে প্রবেশ করলেন, আমরাও তার সাথে সাথে গেলাম; দেখলাম, স্ত্রীলোকটি যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর ঠাকুর সেটা তৎক্ষণাৎ বুঝে একটা ছোট্ট 'ডোজ' মারলেন, "জলটা খাওয়ার সাথে সাথেই সে একেবারে সংজ্ঞাহীন হয়ে শুয়ে পড়বে। তারপর কতক্ষণ পরে উঠে ঐ যে ডালাতে ফুলগুলো আছে, সেই ফুলগুলো নিজের গায়ে ছিটিয়ে দেবে এবং হাসিতে বুঝিয়ে দেবে-যে, 'আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় এসেছি।' তারপর আবার সংজ্ঞাহীনের মত হয়ে পড়ে থাকবে, তার কিছুক্ষণ পরে স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হয়ে জিজ্ঞেস করবে, 'এত লোক কেন, কি হয়েছে?' তারপর স্বভাবজাত লজ্জা দেখা দেবে, যা environmentকে বজায় রাখার জন্য সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলো—environment যখন আবার চলে যাবে পুনঃ লজ্জা এসে তাকে occupy করবে, সুতরাং সে তখন স্বাভাবিক।" সেই কথার সাথে সাথে যেন মহিলার এই activitiesগুলো চলতে আরম্ভ করলো, আমরা অবাক্ হয়ে তাকিয়ে এই treatment দেখছি। কায়ার সাথে সাথে যেমন ছায়া চলে, ঠিক কথার সাথে সাথেই ওর movements চলতে আরম্ভ করলো। পরে সুস্থ হলো, এবং তারা সবাই ঠাকুরের নিকট দীক্ষিত হলো। তারপর ঠাকুরকে নিয়ে আমরা চলে এলাম। ফিরে এসে এই সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়েই আলোচনা আরম্ভ করলেন, এবং আমরাও লিখছিলাম। ঠাকুর বললেন, "এরকম 'ভেক্'ধারী লোকও সাধু-মহানে পরিণত হয়ে গেছে,

'বাবাজী' ডাক শুনে, 'প্রভুজী' ডাক শুনে তার গতিবিধি বাহ্যতঃ পরিবর্ত্তন করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু ভেতরে Satanic work—বলবৎ; সুতরাং অনিচ্ছায় চক্ষু মুদ্রিত করা, অনিচ্ছায় ধ্যানে বসে থাকা, নিজেকে সাধু বা মহান্ পরিচয় দেওয়ার জন্য সে তার বাইরের আবরণ এমনভাবে maintain ক'রে চলছে, তার একেবারে গলদ-ঘর্ম্ম অবস্থা, ইচ্ছামত তাকাতে পারে না, যাতায়াত করতে পারে না, তার উপর যেন ১৪৪ ধারা জারি করা—মহানের movements maintain করার জন্য এটা এক জাতীয় শাস্তি-বিশেষ; কিন্তু এ জাতীয়ও অনেক চলছে—আমার সাথে এরকম বহু লোকের দেখা হয়েছে, এবং অনেকে আমার কাছে স্বীকারও করেছে নিজেদের দুর্ব্বলতা ইত্যাদি। দেখ্, যদিও মানুষের কোন accident বা অসুখবিসুখ কোন মহান্ বা মহাপুরুষের দ্বারা সেরে যায়, বস্তুতঃ যে ভাল হয়েছে একটা tacticsএর দ্বারা,—এটা kind of psychological treatment, এক জাতীয় power, no doubt। তথাকথিত মহাপুরুষ যারা, এ জাতীয় tactfully উপশম করিয়ে নানারকম বাহাদুরি করছে প্রকারান্তরে—রোগ টেনে নিচ্ছে, রোগ চালান দিচ্ছে এবং এই সুযোগ-সুবিধে নিয়ে ব্যবসায়ের ফাঁকফন্দি গুছিয়ে নিয়েছে; tactful যে treatment, tactfullyই যেমন cured হচ্ছে, surity তেমন কিছু নেই যে হতেই হবে। যেহেতু হয়ে গেল, সেও আবার tactfully তার positionটা নিয়ে নিচ্ছে 'মহান্' নামেতে 'সিদ্ধিমুক্তি' নামেতে—'ভগবান' সাজতেও বালাই নেই, সে নিজেকে উঠিয়ে নিচ্ছে। It is a kind of power no doubt, intelligence দ্বারা ইহা প্রয়োগ হচ্ছে, সব-কিছু powerএর উপরে তার এই intelligenceটা confidenceএ আনতে পারছে না, তার intelligence যাই করবে তা যদি genuine হতো তখন intelligence যে self power এটা

'will be'র মধ্যে গিয়ে যে stand করতো, তখন intelligenceটা imaginaryর মধ্যে আর থাকবে না, তখন intelligenceই self genuine হয়ে যাবে—এটার নামই will-force। সে-জাতীয় intelligenceএ সব-কিছুই সাজে, সব-কিছুই প্রযোজ্য হয়, কারণ genuineness আছে কিনা তাই তাদের tactfulnessটাও অবশ্যম্ভাবীর মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায়। ছড়ি যে ঘুরাতে জানে, ঘুরাতে ঘুরাতে শূন্যে ছেড়ে দিয়েও কয়েক পাক ঘূর্ণি খাইয়ে ঠিক মত আঁকড়ে আবার ধ'রে ছড়ির প্যাঁচ সে দেখাতে থাকে; ছড়ি এমনি ক'রে ঘুরাতে থাকে, সমস্ত শরীরের উপরে আবরণের মত ক'রে ফেলে, 'বুলেট্'কে বলে, 'ওদিকে থাক্।'—একপ্রকার ঢালেরই কার্য্য করে যাচ্ছে; কিন্তু প্যাঁচে—যাকে বলে খুব প্যাঁচ মারছে, সেখানে কথাটি খুব উপহাসজনক—লোকটি খুব প্যাঁচ মারছে। কিন্তু confidence তাতে আছে বলে প্যাঁচও তার কাছে সোজা থাকে, সে নিজে প্যাঁচে পড়ে না।" ঠাকুর এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করলেন।

* * *

ঠাকুর সহরে* এলেন, আমরা+ কয়েকজনও সাথে আছি। এত ভিড় যে আমরা ঠাকুরের সাথে আলাপ করবার সময়ই পাই না। দলে দলে লোক এসে দীক্ষা নিচ্ছে। আমাদের কাজ—শুধু আসন পাতা আর ফুল রাখা; দীক্ষার আর তো কোন বালাই নেই, তাই সবাই শূন্য হস্তে 'পূর্ণ' নিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে একদিন এক গাড়ী এসে উপস্থিত, আগে থেকে নির্দ্দিষ্ট সময় দেওয়া ছিল। ঠাকুর কথা দিলে সব সময় কথা রক্ষা করেন। তখনই ঠাকুর চাদর গায়ে দিয়ে লোকজনদের বললেন, "তোমরা বস কিংবা যাদের চলে যাওয়ার

* স্বামিবাগ, ঢাকা।

\+ অমূল্য বসু, শচীন দাস, অজিত ভট্টাচার্য্য।

যেও।" গাড়ীতে আছে একজন, আমরা চেষ্টা করছি ফাঁকে যাওয়া যায় কিনা, কিন্তু ভরসা নেই। ঠাকুর আমাদের ডাকলেন, কোন মতে তিনজনকে ভেতরে নিলেন, একজনকে গাড়ীর পেছনে রাখলেন, আর একজনকে গাড়োয়ানের সাথে বসিয়ে দিলেন। আমরা* সে বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে গিয়ে ঠাকুর দেখলেন— বহু ভক্তের সমাবেশ 'মাতৃ-আবেশে'র জন্য। তারপর তিনি একজন নিতান্ত নিরীহ ব্যক্তির মত আস্তে আস্তে ভিড়ের ভেতরে প্রবেশ করলেন। তিনি আগেই গাড়ীর ভেতরে বলেছিলেন, 'কেহ কিছু বলবে না, দর্শক-হিসাবে আমরা যাবো কেউ আমার পরিচয় কারুর নিকট দেবে না।' তিনি চাদরটা রেখে সাধারণ ভদ্রবেশে সকলের ভেতর দাঁড়িয়ে রইলেন। সবাই যেমন দেখছে, তিনিও তেমন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন। সেখানে একটি মেয়ে বিছানায় শুয়ে আছে, আর মেয়েরা উলুধ্বনি করছে, ধূপধুনা দিচ্ছে আর 'মা মা' বলে চীৎকার করছে। ঐ মেয়েটির মধ্যে মা'র আবির্ভাব হয়েছে—তা প্রকাশ করছে ; কোন সময় জিহ্বা বের ক'রে মাতৃ চেহারার প্রকাশ করছে, চতুর্ব্বাহুর ভাব দ্বিভুজে প্রকাশ করছে এবং 'ত্রিনেত্রের ভাব' দিনরাত্রি অহরহ করবার চেষ্টা করছে, সাথে সাথে নানারকম 'ঢুলুঢুলু' ভাব চলছে, মাঝে মাঝে মনে হয় 'শ্রীকৃষ্ণ' আসছেন। ঠাকুর এর মধ্যে আমাদের বলছেন, "ঐ যে ভাবটি দেখছিস্ কিনা, ওটি শ্রীকৃষ্ণের—ওটি কি জানিস্? নারদ দেবর্ষি এসে খবর দিলো, শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে নিয়ে ব্যস্ত। তখন আয়ান ঘোষ এক লাঠি নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে মারতে চলেছে। শ্রীকৃষ্ণ টের পেয়ে কালীমূর্ত্তি ধারণ করেছেন, রাধা তখন কালী পূজো করছেন। আয়ান ঘোষ কালী-ভক্ত

---

* রবি ঘোষ, ভুপেন রায়, অজিত ভট্টাচার্য্য, বারীন ঘোষ, শান্তি দাস মজুমদার।

ছিল, তাই রাধার কালী-ভক্তি দেখে ভাবের পরিবর্ত্তন হলো—রাধাকে ভাল দেখে চলে গেল।

ঠিক এই যে মাঝে মাঝে কালীর ভাব, আবার কৃষ্ণের ভাব, এটা কিসের ভয়ে? এটা ভয়ে? এটা শুধু ভয়ে না, ভয় ও যশে মিশ্রিত; সুতরাং ভগবানের আবিভূ ত-চেহারা দেখিয়ে যশ নেওয়ার জন্য এই সমস্ত অস্বাভাবিক যন্ত্রণাকেও সহ্য করে, স্বাভাবিক অবস্থাতে সহজ ক'রে নিয়ে, দেখাচ্ছে—আদতে সব ফাঁকি; এমনি ক'রে যদি ক্ষণে মা, ক্ষণে বাবা, ক্ষণে কৃষ্ণ—অন্য সাধু-মহান্‌রা যাঁরা প্রকৃতস্থ আছেন, ওদের অবস্থা দেখে পালানো ছাড়া তাঁদের উপায় নেই, কারণ এদের থেকে স্বাভাবিক মতে পরে যে গলদ বের হবে—গলদ কিছু বের হবেই, কতক্ষণ আর এই জাতীয় চাপিয়ে রাখবে, গলদ বের হলেই সবার উপরে common দোষ পড়বে। সুতরাং জনগণ যে দোষারোপ করে তা অন্যায় কিছু করে না, অবস্থার বিপর্য্যয়েই দোষারোপ করতে বাধ্য হয়।" ঠাকুর তখন সাধারণের মধ্যে একজন, সুতরাং তিনি আস্তে আস্তে আশেপাশে গিয়ে জিজ্ঞেস করছেন, "কি ব্যাপার?" খবরাখবরে জানলেন, সাতআটদিন খায় না এবং মেয়েটির বাহ্যপ্রস্রাবও বন্ধ। ঠাকুর বললেন, "সাংঘাতিক ব্যাপার দেখছি!" 'যাকে যা বলছে তা'ই হয়ে যাচ্ছে' —নানারকম সেখানে শুনছেন। ঠাকুর সেখানে এমনভাবে আছেন যে তাঁকে কয়েকজন ছাড়া আর কেউ চিনতে পারেনি। হঠাৎ ঠাকুর ঐ মেয়েটিকে বলে উঠলেন, "মা, আমার একটি কথা আছে, বলব?" তখন মা বললেন, "বল তোর কি কথা।" ঠাকুর বললেন, "তোমার আগমন কোথা হতে?" মা বললেন, "কালীঘাট হতে।" ঠাকুর বললেন, "তুমি যখন মা হয়ে এসেছ—তুমি সর্ব্বজ্ঞা, সুতরাং আমার মনের কথা বুঝে বুঝে উত্তর দেও।" তখন মা বলছেন, "দেখ, দেহের মধ্যে আছি কিনা, তাই অসুবিধে হচ্ছে।" ঠাকুর

বললেন, "তোমার তবে সুবিধে-অসুবিধেও আছে আমাদের মত। প্রবেশ করতে অসুবিধে হলো না আর অন্তর্য্যামীত্বের বেলায় অসুবিধে কেন?" একটা মূলমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে ঠাকুর বললেন, "এই মন্ত্রের অর্থ তো শাস্ত্রে লেখা আছে, এর প্রকৃত মূল অর্থ কি? শাস্ত্রেরটাও বল, তোমারটাও বল।" মা সেখানে অসুবিধা দেখালেন, রাত হয়ে গেছে তাই। ঠাকুর বললেন, "তুমি তো বেশ চমৎকার বলছো, যে জিনিষটা তোমার কাছে অসুবিধে ঠেকছে, সেটার বেলায়ই একটা অজুহাত বের করছ; 'মা' তো সব জায়গায়ই থাকেন তবে কালীঘাটের কালী বলে একটা বিশেষ কেন?" মা উত্তর দিলেন, "কালীঘাট পীঠস্থান।" তারপর ঠাকুর বললেন, "তুমি যেমন কথাবার্ত্তা বলছ গোয়ালাপাড়ার মেয়েদের মত, তোমার বেশ দ্বিধাবোধ রয়েছে, আর মা'কে তো তুমি ছোট বানিয়ে ফেললে, সেই মাতৃ-শক্তির সংজ্ঞা তুমি তো একেবারে সাধারণ ক'রে ফেললে; বোধ হয় আসল মা আসেননি, এখন ডাকিনী-যোগিনীদের মধ্যে একজন এসেছে, কারণ, আসল মা হলে তার কাছে কোন 'সময়'ই থাকতো না—সকল সময়ই তার কাছে সময়। সুতরাং মনে হয় ডাকিনী যোগিনীই এসেছে—আমাদের কাছে এও একটা মা-ই। বুঝতে পেরেছি তুমি গোপন করছ মা, কেন গোপন করছ? তুমি বলে দিলেই তো হয়, নতুবা তোমার উপর ধারণা তো সকলের খারাপ হয়ে যাবে।" তখন মা হেসে বললেন, "কেউ তো বুঝবে না, তাই বলিনি। মা এখন নেই—মা তো এখন নেই মায়েরই অনুচরী এখন রয়েছে।" ঠাকুর তো বেশ সাধারণ ভাবে মিশে মিশে বলে যাচ্ছেন। মা যাতে ঠিকমত উত্তর দিতে পারেন, তাই ঠাকুর আগে থেকে বলে দিয়ে যাচ্ছেন, নতুবা মা যে বড় ফেসাদে পড়ে যান। তারপর ঠাকুর বললেন, "এখন তোমায় তো ভালই দেখলাম, মা। যাক্ তুমি একটু উঠ, মা তোমার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যই, তোমাকে গুছিয়ে দেওয়ার জন্যই,

তোমাকে সেবাশুশ্রূষা করবার জন্যই পাঠিয়ে দিয়েছেন, তুমি একটু উঠ, স্নান-আহার কর, আমরা একটু বসি। ডাকিনী-যোগিণী তাদের কার্য্যকলাপ ক'রে চলে যা'ক।" মা বলে উঠলেন, "তাই ভাবছি, উঠবো।" মা উঠলেন, উঠে স্নানাহারাদি সম্পন্ন করলেন। এই সাতআটাদন পরে বিছানা থেকে উঠলেন। সবাই ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে আছে, সবাই দেখছে—এই ভদ্রলোকটি কে? বেশ তো 'মা'কে উঠিয়ে দিলেন! এরা সবাই ঠাকুরকে ঘিরে ধরেছে, জিজ্ঞেস করছে, "আপনি কোত্থেকে এলেন? আপনার বাড়ী কোথায়?" এখন ঠাকুরের উপর বেশ একটা গুরুত্ব পড়ে গেছে। ঠাকুর বললেন, "বেশ চমৎকার! এ-যে শিব বানাবার উপক্রম আমাকে! আমায় নিয়ে টানাটানি কেন? দর্শক-হিসাবে এসেছি—প্রশ্ন কেন?" "না—আপনি যেভাবে এসেছেন তাতে মনে হয় যে ঐ ভেতরের মায়ের সাথে আর ডাকিনী-যোগিনীদের সাথে বেশ একটা ভাল ভাবেরই সম্পর্ক রয়েছে।" ঠাকুর বললেন, "সম্পর্ক তো নিশ্চয়ই, মামা-বাড়ী এসেছি কিনা, তাই আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মুলাকাত করছি।" "না, মা আপনার উপর বেশ খুশী আছেন দেখছি, মা আপনাকে টের পেয়েছেন, নতুবা উঠে স্নানাহারাদি পর্য্যন্ত করলেন।" তারপর যে-ভাবেই হউক ঠাকুরের পরিচয় হঠাৎ জানাজানি হয়ে গেল, ঠাকুরকে সবাই নামে চেনে; কিন্তু অনেকে তাঁকে দেখবার মত সুযোগ পায়নি। মা স্বয়ংও জেনেছেন। এখন ঠাকুরের উপর সবারই দৃষ্টি পড়েছে। তিনি সাধারণতঃ কারু বাড়ী যান না, তা'ই সবাই জানে, তাই হঠাৎ এখানে তাঁর আগমনে সবাই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। মা'কে ফেলে 'বাবা'র দিকে সবার দৃষ্টি পড়ছে, একথাটা মা'র কানে গিয়েও পৌঁছেছে। মা এসে ঠাকুরকে এক প্রণাম করলেন। ঠাকুর হেসে বললেন, "সম্পর্কটা বাবা না থেকে ঠাকুর্দ্দা থাক, তবেই একটু রগড় করা যাবে, নতুবা 'বাবা' সাজলে মুখ বুজতে হবে যে। সংসারে নিয়ম

হচ্ছে, নিজে সম্মান নিতে হলে সামনের কাউকে সম্মান দিয়ে দেওয়া, ওর সম্মান তবে স্বাভাবিক মতে থেকে যাবে ; সুতরাং বাবা ডেকে ফেললে, আমি আর চিকিৎসা করতে পারবো না, একটা 'মুখ-লজ্জা' তো আছে, একটা 'চোখ-লজ্জা' তো আছে। চিকিৎসার জন্য দাদু তো সাজি তারপর অন্য সম্পর্ক দেখা যাবে এবং ঠাট্টাচ্ছলে তুই একটি স্বরূপেরও পরিচয় দিয়ে দেওয়া যাবে।" এরপর মা'ও হলেন ঠাকুরের ভক্ত, সঙ্গে সঙ্গে আর সবাইও হতে লাগলো। ঠাকুর তখনও সাধারণ ভদ্রলোকের পোষাকে ছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি 'চাদর চাদর' বলে উঠলেন, বললেন, "তাড়াতাড়ি আমায় একটু সাজিয়ে দে তো।" তিনি এমনভাবে চীৎকার করলেন যাতে কথাগুলো সবাই শুনতে পায়। তিনি সবাইকে বলছেন, "আমি একটু ঠাকুর সেজে বসে নি', তারপর।" এরপর আবার হাসতে হাসতে আমাদের বললেন, "লোকগুলো যেন ঠাট্টাও ভুলে গেল, তারা সবই যে seriously নিচ্ছে। কি মগের রাজত্বরে বাবা!" তিনি সবাইকে এর মধ্যে আবার বলছেন, "এখানে একটু tactfully গুছিয়ে নিতে পারলেই মহাপুরুষ সাজা যায়—দেখ রে এই হচ্ছে রাজত্ব, সব ফাঁকের খেলা, হঠাৎ একটু নাম বের করে ফেললেই ঐ সুযোগে সুযোগে গুছিয়ে নেওয়া।" এর মধ্যে আবার মা'কে বলছেন, "এখন তো তুমি স্বাভাবিক।" "হ্যাঁ স্বাভাবিক, তবে আপনার সঙ্গে গোপনে কিছু বলবার আছে।" এরপর সবাই সরে গেল, আমরা তিনজন* আছি। আমাদেরও সরিয়ে দিতে চাইলো। ঠাকুর বললেন, "এরা থাকলে কোন ক্ষতি হবে না, এদের 'গোপন' শোনবার মত কান হয়ে গেছে—'কর্ণ'ও গোপনে ছিল, এরা গোপনেই রাখবে, শ্রীকৃষ্ণ কেবল ফাঁস ক'রে দিয়েছিলো, সত্যে যদি এদের ফাঁস করে, নইলে আর কেউ নয়।" তারপর আমরা চোখ বুজে আছি, কানদু'টি ঠিক

* শান্তিদাস মজুমদার, অজিত ভট্টাচার্য্য, বারীন্দ্র কুমার (বারীন) ঘোষ।

রেখেছি। ঠাকুর বলছেন, "কেন তুমি এ জাতীয় দুঃখের সাধনা করছ ? কোথায় তোমার কালীঘাটের মা, কোথায় ডাকিনী-যোগিনী। কেন তুমি এভাব উদ্ভব করলে ?" তখন বললো, "আমি হঠাৎ করে ফেলেছি, আমি ভাবলাম মা আসবেন, তাই সবাই বলে ফেলাতে আমি করে ফেলেছি।" ঠাকুর বললেন, "যাক, আর এসব করো না।" "আমার কি পাপ হয়েছে ?" ঠাকুর বললেন, "পাপ হউক আর যা'ই হউক তুমি এখন একটু সত্যের সাধনা কর।" ঠাকুর ওকে আরো বললেন, "কাল তুমি আমার ওখানে যেও, তবেই তোমাকে পথ দেখিয়ে দেওয়া যাবে।" ঠাকুরকে অনুরোধ ক'রে বললো, "আমায় যেন ভুল না বোঝে।" ঠাকুর বললেন, "যাক্ ঠিক আছে, তুমি কোন চিন্তা করো না।" তারপর ঠাকুর উঠলেন, সবাই তাঁকে প্রণাম করলো। আমরা চলে এলাম।

আটান্ন

আমরা* তখন সহরে† আছি। ঠাকুর বর্ত্তমান জাগতিক অবস্থা-সম্পর্কে আলাপ করছিলেন এবং এই সমাজে যারা যেই বস্তুকে আরাধ্য বলে জানছে, তাদের কার্য্যেই তারা যে-শাস্ত্রগত নিয়ম মেনে চলছে, তাদেরই ধর্ম্মে যা রয়েছে, তাদের অধিকাংশই ধর্ম্মকে যে কি-ভাবে ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছে, সে-সম্পর্কে ঠাকুর আলোচনা করছিলেন। তিনি বলছিলেন, "যে যাই করুক, তার মর্য্যাদা রেখে সে যদি চলে, তবেই তার সাধনার উপযুক্ত ব্যয় তার উপর প্রযোজ্য হবে; তারা ধর্ম্ম-সম্পর্কে আলোচনা করছে, ধর্ম্মকে বড়ও মনে করছে এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা ক'রে 'শাস্ত্রগত' হতে তারাই যে ভাবের পরিচয় দিচ্ছে, তারাই যে আবার ছলনাকে প্রশ্রয় দিয়ে এক জাতীয় অভিনয়ের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে—কি ক'রে কি ভাবে তা সম্ভব? যে যার principleএ stick করাই হচ্ছে ধর্ম্ম, কিন্তু এই সংসারের, সমাজের যতটুকু পরিচয় পেয়েছি তাতে নিজেদের principleএ তারা নিজেরা আস্থাহীনতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। বেশী দূরে যাওয়ার আর প্রয়োজন নেই, নিজের ঘর-সম্পর্কেই প্রথম আলোচনা করছি, তাতে এটা নিন্দা-মূলক হবে না। পূজনীয় ও পূজনীয়াদের শ্রদ্ধাও এখানে নষ্ট করা হবে না, শুধু সত্য রূপটিকে প্রকাশ করছি;—

---

* শান্তিদাস মজুমদার, বারীন ঘোষ, অজিত ভট্টাচার্য্য, ভূপেন রায়, রবি ঘোষ আরো অনেকে।

† স্বামিবাগ, ঢাকা।

একদিন আমার বাবা একটি ছেলেকে নানা উপদেশ দিচ্ছিলেন। বাবাকে অনেকেই 'কর্ত্তামশায়', 'পণ্ডিতমশায়', 'ঠাকুরমশায়' বলে ডাকে, এবং অনেকেই সুখদুঃখের নানাকথা এসে তাঁকে বলে ও অনেক সুপরামর্শ নেয়। এক ব্যক্তির ছেলে ভীষণ অবাধ্যপনা করে, বাপ-মায়ের কথা শোনে না, টাকাপয়সা দেয় না, তাই এ ছেলেটিকে আমার বাবার কাছে নিয়ে এসেছিলো। তিনি সে-ভাবেই ওকে বুঝাচ্ছিলেন, 'অবাধ্য হওয়া উচিত নয়, পিতামাতাকে কষ্ট দিলে ভগবান অসন্তুষ্ট হবেন, তাতে তোমাদের মঙ্গল হবে না। কত কষ্টে লালনপালন করেছেন, দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করেছিলেন, তাই অবুঝের মত চলবে না, তাঁরা যে তোমায় জন্ম দিয়েছেন শুধু তোমার নিজের সুখ-ভোগের জন্য নয়, তাঁদের সুখ-ভোগ তোমার প্রথম দেখা উচিত।' আর ঐ ছেলেটি মাথা নত ক'রে শুনছিলো, যেমন বিড়ালকে বলা, 'মাছ খেও না, হেঁশেলে গিয়ে উপদ্রব করো না, ভাল হয়ে চল', তেমনি সে শুনছে, এখন কার্য্যকরী যতটুকু হউক তা পরবর্ত্তী কথা। আমি পাশের ঘর হতে সব শুনছিলাম। তারপর যখন বাবা ঘরে এলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার সঙ্গে কয়েকটি বিষয় আলোচনা করবো, আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবেন।' বাবা বললেন, 'বল, কি কথা।' আমি বললাম, 'এই যে ছেলেটিকে কাকাতুয়ার মত যে পড়ানো হলো— কতটুকুনু কি হবে সে কথা বলতে পারছি না, তবে পিতামাতা এবং সন্তানের মধ্যে এই যে দাবীর প্রথা, এটা যে ভাবে প্রচলিত হয়ে আসছে, এটা কি আপনাদের প্রাধান্যকে বড় ভেবে, না বলার বলা বলে যাচ্ছেন? একভাবে যদি একটা চিন্তা ক'রে নেওয়া যায়, তবে দেখা যায়, যে নিয়মানুযায়ী হয়ে আসছে, তার মধ্যে এসব চলছে; কিন্তু এখানকার পিতামাতার যে দাবী সন্তানের উপর—সে-বিষয়েই আপনাদিগকে জিজ্ঞাস্য। দাবীর মূলে কতটুকু প্রবল ছিল সন্তান-উৎপাদনের পক্ষে

—সেদিক্ দিয়ে যদি বিচার করা যায়, কতজন বাপ-মা আছে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি ভিন্ন সৃষ্টির চিন্তাতে রয়েছে? কথাগুলো খুব অসঙ্গতপূর্ণ বলছি, সন্তান-হিসাবেই যে মার্জ্জনীয়, তা জেনেই বলতে ও মনের দাবী জানাতে কোন দ্বিধা ও কার্পণ্য করছি না। প্রাণের একমাত্র সমাধান পিতামাতার নিকটেই যে সন্তান সব সময় কামনা করে। একমাত্র উভয়ের মধ্যে মুক্ত যে বাৎসল্য, এটাই দেখছি এই সমাজে অক্ষুণ্ণ রয়েছে—এখানে উভয়ের মধ্যে নাই লজ্জা, নাই মান, নাই ভয়, প্রত্যেকেই যেন একটা সত্যের পূজারী হিসাবে রয়েছে এই সম্পর্কে, সেই দাবীতেই, সত্য যে পাবো সেই হিসাবেই আমার জিজ্ঞাস্য মনের সন্দিগ্ধতাকে ঘুচাবার জন্য; তাই অসংযতপূর্ণ বাক্যের জন্য মনে কিছু যে করবেন না, তা জেনেই আমি জানতে চেয়েছি। অনেক জায়গায় গিয়েছি, অনেকের সঙ্গেই সাক্ষাৎ হয়েছে, এমন কিছু পরিচয় পেয়েছি, কিছু বল্লে হয় ঝগড়া, হয় মনঃক্ষুণ্ণ, সেখানে নাই কোন শিক্ষার ব্যবস্থা, শুধু হয় মর্য্যাদা নিয়ে মারামারি, সরলতার নাই কোন আভাস; শুধু দেখছি আবরণের কেবল ঝক্‌মারি, তখন সমাধান সঙ্কোচতা অবলম্বন করে—সমাধানে আর আসে না তাই এই সমাজের যা যা পেয়েছি, তা মেটাতে এসেছি আপনার কাছে। সে জাতীয় অবস্থার সঙ্গে সমতা না পাওয়ায় তাদের জের আপনাকে দিয়ে নিচ্ছি। তাই ঐ ছেলেকে যে অনেক কিছু বুঝাচ্ছিলেন, সদুপদেশের দিক্ দিয়ে আপত্তিকর কিছু নেই, কথা হলো যিনি উপদেশ দিবেন, তাঁর মধ্যে তাঁর কতটুকু দখল আছে—সেই দিক্ দিয়ে আমার কথা। প্রত্যেক বাপ-মা'ই সন্তানের উপর দাবী খাটায়—এটাই চলছে এবং স্বাভাবিক। সন্তান-উৎপাদনের কামনায় কয়টি সন্তান জন্মেছে? সেদিক্ দিয়ে প্রত্যেক বাপ-মাকে যদি বিচার করা যায়, কয়জনের যে খাতায় নাম উঠবে সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। বেশী দূরে আর যাওয়ার প্রয়োজন নেই, আমরা যে ভাইবোনেরা

হয়েছি, লজ্জা-সঙ্কোচ ত্যাগ করেই বলছি, আমাদের উৎপাদনের জন্য কতটুকুনু কামনা ছিল ?—সেদিক্ দিয়ে যদি বিচার করি জমা খরচে কি আমরা কেউ পড়ি ? না, তৃপ্তির জন্য যা করা হয়েছে, তার মধ্যে আমরা হঠাৎ হঠাৎ এসে পড়েছি ? তবে যাদের সন্তান হয়নি বা দশ বারো বৎসর হচ্ছে না, তাদের একজাতীয় কামনা আছে—আপসোসে গিয়ে সে কামনা দাঁড়ায়। সন্তানকে প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাবার জন্য বিচারকের সিদ্ধান্তের মত কতজন বাপ-মা কে আমরা এর মধ্যে আনতে পারি ? সেই বাপ-মা'ই তো আমাদের এই বাপ-মা ? দাবী তো তাঁদেরই, তাঁরাই করছেন—প্রত্যেকেই কাম-উন্মাদনার নিবৃত্তি করে যাচ্ছে তৃপ্তির জন্য, তাতে যা হবার হয়ে যাচ্ছে। যদিও universal আইনে সবই বাঁধা, গাঁথা—নিয়মের বশে যে প্রকারান্তরে সবই চলছে, তাতেই যখন রয়েছে নিজস্ব-দেওয়া বুদ্ধিবৃত্তি, তা দিয়েই তো আবার গুছাতে হবে, আবার ইচ্ছাশক্তিতে সব বলতে হবে, সেই ইচ্ছাশক্তিতে যখন ভালমন্দ বিচার করবার সব রয়েছে, সে-দিক্ দিয়ে আর আপনাদের সমাজের ভেতর যে সমস্ত উপদেশাদি রয়েছে, তার পালনে কে কতটুকুনু যে গিয়েছেন সেই বিষয়ে এক সমস্যা জন্মেছে। আমি যদি আমার পিতাকেই দেখি, অন্যত্র যাওয়ার কি প্রয়োজন ? তাঁকে ঘরে দেখি একরূপ, বাইরে দেখি আর একরূপ। ঘরে মান-অভিমান, মা'র সাথে ঝগড়া—কোনটারই ক্রটি নেই ; আমাদের নিকটেই অত্যন্ত কুৎসিত লাগে, এক সন্তান-হিসাবে মেনে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই বলে মেনে যাওয়া। তাই ভাবছি যিনি দিনরাত জপতপ, সন্ধ্যাহ্নিক, গীতা–চণ্ডী-ভাগবৎ, শাস্ত্রাদি নিয়ে সমস্ত সময় ব্যস্ত থাকেন, তাঁর কেন ভেতরে এ চেহারা ? আর বাহির থেকে কোন লোক এলে, 'পণ্ডিতমশায়', কিংবা 'কর্ত্তা-মশায়' ডাকলেই, নামাবলি সময়মত না পেলে মা'র সঙ্গে যে উগ্রতার পরিচয় দিতে দেখেছি, পরক্ষণেই যখন ঐ ভদ্র লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ,

সাম্যসুরে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাণীতে—'বাটীস্থ সর্ব্বাঙ্গীন কুশল তো? শারীরিক সুস্থ তো? ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।' নানারকম পাণ্ডিত্য-পূর্ণ বাণী ছেড়ে দিয়ে এলেন, ওদিকে নামাবলি না পাওয়ার জন্য মায়ের উপর যে চটে এলেন, সেটা কি-ভাবে যে কষ্ট ক'রে check করলেন পাণ্ডিত্যের balance রাখবার জন্য, খানিকক্ষণের জন্য যে অভিনয়ের পরিচয় দিয়ে এলেন, সে-অভিনয়কে ধন্যবাদ! পরক্ষণেই মা'কে এসে বলছেন, 'খালি গায়ে যাওয়াতে কি মনে করলো?' তার জের আমাদের উপর দিয়ে পর্য্যন্ত গেল, তারপরেই আলনাতে যত কাপড়চোপর ছিল, ঢিল মেরে ফেলতে আরম্ভ করলেন, তখন ভাবলাম, 'দুর্ব্বাসা মুণির আর দোষ কি?' শুধু এই জাতীয় বলে নয়, এরকম বহু প্রমাণ পেয়েছি। চব্বিশটি ঘণ্টার মধ্যে আবরণের মাঝেই যেন সাজবার উদ্দেশ্যে ডুবে রয়েছেন, সেই আবরণকে মর্য্যাদা দেওয়াই যেন এক সাধনা বলে মনে মনে পোষণ করছেন এবং সেই ব্যক্তিদের খুশী করার জন্য আর নিজের বাইরের ভাবটির উপর নিজে খুশী হওয়ার জন্য যে-সমস্ত অবলম্বন করে যাচ্ছেন তাতে কি ছলের কিংবা ফাঁকির প্রশ্রয় দেওয়া হয় না? এবং আশ্রয় নেওয়া হয় না? প্রকারান্তরে এ-যে নকলকেই আশ্রয় করা হয়, প্রকারান্তরে যে নকলেরই পূজো, তাদের ধর্ম্ম, তাদের শাস্ত্র, তারাই করছে অমান্য, তারাই দিচ্ছে আবার সেই উপদেশ, কার্য্যকরী তাহা কি করে হবে? মূলেই যখন গোল—আমার দুঃখ সেখানেই হয়েছে। আমার পিতাকে আমি এ-ভাবে দেখতে চাইতে পারি না, কেন চাইবো? যেই বুদ্ধি-বৃত্তি চিন্তাতে কোনরকম ত্রুটি নেই, সেই বৃত্তিগুলো শুধু বাইরের যশকে আর আবরণকেই পূজো করবে? তার জন্য অশান্তি যে না পাচ্ছে তা নয়, তা পেতে বাধ্য। প্রতি মুহূর্ত্তে conscious আপনার নিজস্ব movementsএর জন্য—আপনার সমাজে নাম আছে, প্রতিষ্ঠা আছে, বংশের নাম আছে, বাহির থেকে কারো কোন ত্রুটি ধরবার

উপায় নেই, আপনার সমকক্ষ যাঁরা মেলামেশা করছেন, আপনারই শ্রেণীভুক্ত তাঁরাই স্বনামধন্য, তাঁদের আমার বলার প্রয়োজন নেই, তাঁদের কাছে আপনি প্রশংসনীয়; কিন্তু আমি যতটুকু দেখেছি, 'প্রশংসনীয়' যদি নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা যায়, তবে সে-সমস্ত প্রশংসার কোন দাম নেই—এ হলো অভিনয়ের stageএ রাজা-প্রজা বনার মত-যে, আসলে কেউ বিড়িওয়ালা, কেউ না হয় তালুকদার—এও কি ঠিক তাই নয় কি? ক্ষণে 'কর্ত্তামশায়', ক্ষণে 'পণ্ডিতমশায়', ক্ষণে 'ঠাকুরমশায়', আমার হলো পিতা……* আমি জেনে শুনে যতটুকু বুঝেছি তা আমি জানাবোই নিজে জেনে যাওয়ার জন্য, তাতে শাসন আমি মাথা পেতে নিবো। আমি আর একদিন আপনাকে দেখেছি, নিত্যকর্ম্ম-অনুযায়ী যে-ভাবে সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন, সেই ভাবে আহ্নিক করছেন, এমন সময় একটি ভদ্রলোক 'পণ্ডিতমশায়, পণ্ডিত-মশায়' ক'রে ডাকছেন। ডাকার সাথে সাথেই আপনি মেরুদণ্ড সোজা ক'রে চক্ষু মুদ্রিত ক'রে ধ্যানের অবস্থায় বসে পড়লেন, এর আগে কুঁজো হয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে চেয়ে আহ্নিক করছিলেন, কেন অমন করলেন? পণ্ডিতমহশায়ের পাণ্ডিত্যের balance বজায় রাখবার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের সহজাত যে movement ছিল, সেটুকু বাধ্যে পড়ে আপনাকে artificialityর সাহায্য নিতে হয়েছিলো, প্রকারান্তরে যে ফাঁকিরই ধ্যান করা হচ্ছে। এত গ্রন্থ, এত শাস্ত্র, সব হতে ফাঁকে পড়ে ফাঁকিতে প্রতিষ্ঠিত শেষ বেলায়? এ-যে কতবড় দুঃখ!—একটু নিরিবিলি চিন্তা করলে সবই-যে ধরা পড়ে। তাদেরই দাবী, এ-যে প্রকারান্তরে ফাঁকির দাবী—দাবী ও-যে সে-জাতীয় ফাঁকি। প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী গতিতে সবই ধর্ত্তব্য, তৃপ্তিতে সন্তান-প্রসবে উভয়েই relief—কে কাকে রক্ষা করলো? এ-যে উভয়েই রক্ষা পেলো; 'স্তন্য-পান'—এ-যে উভয়েই relief, না হলে

* বাদ পড়েছে।

যে হতো ভয়ঙ্কর, তাই প্রাকৃতিক নিয়মে চলছে আদানপ্রদান,—তাই নয় কি? শিশুর সেবাযত্ন, রক্ষণাবেক্ষণ, মূলে যে স্নেহমায়া, ক্রন্দনে দেয় সাড়া—এ-যে উভয়েই মুক্ত; স্নেহের জ্বালা ওকে সেবা ক'রে যে relief, নিয়মে যে তাও বাঁধা, যাতনার উপশম ওর সেবাতেই, তাই রক্ষণাবেক্ষণে ক্রমশঃ ক্রমশঃ উভয়ে উভয়ের উপশমতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে—এইভাবে চলছে আদানপ্রদান। দাবীর বাণী ঐ জাতীয়ই যে এক অবস্থা—আলোচ্য বিষয় এখানেই; বুদ্ধিবৃত্তি যখন নিজস্ব, বিবেচ্য-যে সেথায়ই—কে কারটা করছে? করছে, না প্রকারান্তরে করিয়ে নিচ্ছে?—আর বাহাদুরি নিচ্ছে সবাই; নেউক ক্ষতি নেই, নিজের বাহ্বায় যদি নিজে তৃপ্ত থাকতো, তা হলে আপত্তি-জনক কিছু ছিল না—গলদ যে সেখানেই; এ জোর করে বন্ধ ঘরে অন্ধকারে থেকে হাতড়ানোর মত-যে, দরজা-জানালা খুলে দিলেই তো মুক্ত—মুক্ততা তো তার নিজের হাতেই, শুধু খোলার সাপেক্ষ-যে, একটু পরিশ্রম ক'রে উঠে গিয়ে করলেই যে মিটে যায়—সাধনা সেখানেই।আজ ঠিক সেই বন্ধ ঘরে জোর করে থেকে, 'কোথায় আলো? কোথায় আলো?' —সে-ভাবে হাতড়াচ্ছে। আলো যে একটা পর্দ্দার আড়ালে, সেটা জেনেও যেন ভুলে যাওয়ার অবস্থার সৃষ্টি করছে। ঠিক আপনাদের যে গতিবিধি এবং আপনাদের নিজস্ব কার্য্যকলাপ, সমস্ত নকল, ছল, ফাঁকি যা-কিছু প্রকারান্তরে ব্যবহার করা হচ্ছে, ওসবগুলোতে কিন্তু আপনারা conscious, এবং এ-যে প্রকারান্তরে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে, তাও বুঝতে পারছেন; অভিনয়ের balance রাখার জন্য নানা মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে, তা'ও বুঝতে পারছেন; এমন মিথ্যার অনেক জাতীয় চেহারা আছে—নিজের কার্য্যটুকু সফল করার জন্য নানা ভাবে বুঝিয়ে সেটাকে বলে যাওয়া হচ্ছে, প্রকারান্তরে সে-যে চতুরালি করছে—সে-বিষয়ে সে conscious। সত্য যে আবার আপনাতেই রয়েছে সে-বিষয়ে আপনি অবগত। প্রত্যেকটি জিনিষে যে conscious করে

দিচ্ছে, সেই consciousnessএও আপনি আবার conscious। আলোতে ঠিকই রয়েছে, তবে এ অন্ধকারজাতীয় আবরণের কি প্রয়োজন?—তাতে তো তারই সাধনা করা হচ্ছে। অনেকগুলো অসংযতপূর্ণ কথা বললাম ঠিকই, কিন্তু আঘাত দেওয়ার জন্য নয়, আপনার সন্তানদের অবাধ্যতামূলক ব্যবহার সংশোধনের জন্য কোন উপদেশ দিতে হয় নাই, আর শ্রদ্ধাভক্তি শেখাবার জন্য উপদেশ দিতে হয় নাই, তারা জানে তাদের বাপ-মাকে কি ভাবে পূজো করতে হয়। সেদিক্ দিয়ে আপনার সন্তানদের উপর কোন অভিযোগ আপনার নেই, এ-জাতীয় বলার জন্য আপনি নিজে দায়ী, সন্তানে আর জনকে প্রকারান্তরে কোন ব্যবধান তো নেই—একই হতে যখন উদ্ভব, একই অঙ্গের ক্রিয়ার মতন তো?—আমার যে বলা, প্রকারান্তরে আপনারই বলা আপনিই বলছেন। অঙ্গের যে কোন জায়গায় একটু wound হলে ব্যথা সর্ব্বত্রই মনে হয়, কেউ তাতে বাদ যায় না, কোন অঙ্গই তাতে বাদ যায় না, পিতাপুত্রের সম্বন্ধ ঠিক ঐ জাতীয়ই, এই যে ব্যবধান পূর্ণ করছে বাৎসল্যই, তাই সন্তানের আঘাতে পিতামাতার ব্যথা, সবটাতেই উভয়ে উভয়ের মধ্যে একজাতীয় ব্যথার সুরে সুর দিচ্ছে। তখন বাবা বললেন, 'কথাগুলো অসঙ্গত নয়, সমাজে থাকতে গেলে অনেক কিছুই করতে হয়। আজ যে কথা বললে, জন্মান্তরিক সাধনা দরকার, বিক্ষিপ্ত মনকে আয়ত্ত করা কত যোগ-সাধনার দরকার; কত যোগীরা যুগ-যুগ ধরে সাধনা করে গিয়েছেন এই মন-সংযমের জন্য, চিত্ত-স্থিরতার জন্য। তবে চেষ্টা করছি, অনেক সময় অনেক কিছু অবলম্বন করতে হয় তা ঠিকই, কথাগুলো তুমি অযৌক্তিক বলনি, প্রত্যেকের জীবনেই হাড়েহাড়ে লাগবে সন্দেহ নেই, তবে কথাগুলো প্রত্যেকেরই চটার মত, প্রত্যেকেরই সম্মানে ঘা লাগবে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, সুতরাং রাগ তো করবেই, তবে যাঁরা বিবেকবিচারসম্পন্ন তাঁরা চিন্তা করবেন। তোমার উপর রাগ হয়নি;

খুশীই হয়েছি।' তখন আমি পিতাকে বললাম, 'আপনি যে-ভাবে খুশিকে সহজভাবে খুশিতে এনে আমার উপর খুশির ভাব প্রকাশ করলেন, তাতে আমি যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছি। এই জাতীয় সম্পর্ক যদি সবার ভেতর গেঁথে যেতো,—ঠিক যেমন পিতাপুত্রের রয়েছে, তবে মনে হয় সমাজে গলদ ঢোকার অবকাশ পেতো না। আজ আমি না হয়ে অন্য আর একজন যদি আমারই মত বলতো, কতটা যে অখুশী এবং কতটা রাগ—তার সঙ্গে জীবনে মুখ-দর্শণ পর্য্যন্ত হতো না, তা নয় কি ?—তা তো স্বাভাবিক, আর বলতে দেওয়াও হতো না, সাহসও পেতো না ; সুতরাং সন্তান যে ক্ষমার যোগ্য, তাই তো ক্ষমা পেয়েছি। আমার কাছে আপনি দেবতা, শাস্ত্রের যা কিছু পরিচয় আপনাতে আমাতে রয়েছে—লজ্জা, মান, ভয়, অহঙ্কার, সব-কিছু ত্যাজ্য আমাতে আর আপনাতে ; আপনি যে মহান্, আমার কাছে সে পরিচয় সব সময়ই রয়েছে। যেখানে যা-কিছু অভিনয়ের বার্ত্তা, মুক্ততা সন্তানের কাছে এসে করেছেন, অনেক গলদপূর্ণ কথাও আমাদের কাছে এসে বলেছেন—এই যে সহজভাব, নেই বললে তো চলবে না ; আমার কাছে এত সমস্ত ক্লেদের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও আপনি যে দেবতা—ক্ষম, দম, সহিষ্ণুতা আমার উপর তো প্রযোজ্য হয়েছে, এই গুণ তো আপনার রয়েছে এই অবস্থাতেও ; তবে তো হয়ে রয়েছেই, হতে বাধ্য। আমার কামনা, আমার ইচ্ছে, এইভাব যাদ সর্ব্ব-অবস্থায় থাকে, তবে আমার পিতা দেবভাবাপন্ন যে অবশ্যম্ভাবী, তার পরিচয় দেবে অন্তরে ও বাহিরে। সেই সফলতায় যে আপনি রয়েছেন, সেই সাড়া তো আমার উপর দিয়েই দিলেন—তাই না-হওয়ার কি আছে ? এই জ্ঞানে যদি প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, তবে সাড়ার সাড়া সাড়া যে দেবেই।' তারপর প্রণাম করে উঠে এলাম।" তারপর ঠাকুর আমাদের বললেন, "দেখ্, আজ সরলভাবে তোদের যে জানাতে

পারছি, তা আমার পিতার উপর যথেষ্ট আস্থা রয়েছে বলেই, তাই তাঁর কথা বলতে তাঁর সম্মান নষ্ট করা হচ্ছে না। এরকম অজস্র অজস্র বাপ-মার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে, তাঁদের বহুজাতীয় প্রমাণ পেয়েছি, যাঁরা এই জাতীয় ক'রে সমাজকে শিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে যাচ্ছেন। কারো বাপ-মাকে আক্রমণ করা আমার ব্যক্তিগতভাবে ইচ্ছা না, তাই আমার পিতার সম্বন্ধে বলেই তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।"

ঊনষাট

ঠাকুর বসে* চিঠি লিখছেন। অনেকেরই চিঠির জবাব দিচ্ছেন। এমন সময় একজন লোক† এসে উপস্থিত হলো, সে ঠাকুরকে প্রণাম করে বসলো। ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কি প্রয়োজন?" সে উত্তর দিলো, "আমার একবন্ধু‡ এক আশ্রমে চলে গেছে, তার মা-বাবা কান্নাকাটি করছেন, সে তাদের একমাত্র ছেলে! আপনার কাছে এসেছি, আপনি এর একটা প্রতিবিধান করে দিন্। ওর মা-বাবা বহু জায়গায় বহু সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে গেছেন, বহুভাবে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কোন ফল হয় নাই।" ঠাকুর বললেন, "তুমি ওকে নিয়ে আসবে। আমি তো তোমার একজন বন্ধুই, সেই বন্ধু-হিসাবেই আমার কাছে নিয়ে আসবে; আমার আর অন্য কোন পরিচয় দেওয়ার দরকার নেই।" সেও বললো "আচ্ছা, বেশ," ঠাকুর ওকে একটা জায়গার কথা বলে দিলেন, এবং সেখানে তাকে নিয়ে আসতে বললেন। ঠাকুরের সাথে আমাদের ভেতর থেকে একজন§ সেই নির্দিষ্ট স্থানে গেল। সেই লোকটি তার বন্ধুকে

---

* স্বামিবাগ, ঢাকা।

† জে, সি, দাশ।

‡ মৃণালকান্তি ভট্টাচার্য্য।

§ শান্তি দাস মজুমদার।

নিয়ে এলো। বন্ধুরা এসে দেখা করলে যে 'কার্টসি' করা দরকার, তা'ই করা হলো। তারপর ঠাকুর আলাপ করতে লাগলেন। ঠাকুরের এই 'রূপ' তো আর আমরা বেশী দেখিনি, তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। ঠাকুর বলছেন, "আপনাদের আশ্রমে যদি যাওয়া যায় তবে কি করতে হবে এবং সেখানে কি হচ্ছে? আপনার আশ্রমের নাম কি রাখা হয়েছে, সেখানে আপনি কোন নামে পরিচিত?" তখন আশ্রমবাসী বললেন, "আমায় 'পরমানন্দ' বলেই আশ্রমে সবাই ডাকেন।" ঠাকুর বললেন, "ধরুন আমি যদি যাই, আমাকেও একটা নাম দেবে তো? না, তার জন্য কোন একটা কিছু পরিশ্রম করতে হবে?" তিনি বললেন, "না, গেলেই একটা নাম দেওয়া হবে।" ঠাকুর বললেন, "আর কি করতে হবে?" তিনি বললেন, "যদি ভাল কাজের পরিচয় দেওয়া যায়, তবে 'প্রমোশন্' আছে, অবশ্য প্রথমে গোশলার রক্ষক, তারপর রন্ধনশালা, ছাপাখানা ইত্যাদির তত্ত্বাবধায়ক, এবং আরো কাজ দেখাতে পারলে 'প্রমোশন' পেয়ে জনগনের অভ্যর্থনার ভারও পাওয়া যেতে পারে; এমনি করে ক্রমশঃ ক্রমশঃ কীর্ত্তনাদি এবং মন্দির-পরিচালনার ভারও প্রাপ্ত হওয়া যায়। আরো অধিক দক্ষতার পরিচয় দিতে পারলে আরো উন্নতি করার সুযোগ পাওয়া যায়।" ঠাকুর বললেন, "বেশ তো, বেশ! এর মধ্যেও একজাতীয় আনন্দ আছে! আমি যদি যাই, তা'হলে কোন 'শালায়' প্রথম দেবে?" তিনি বললেন, "আপনি যদি যান, আপনাকে হয়তো প্রথমে ভিক্ষার জন্য বেরুতে হবে। সেটা অবস্থা বুঝে একটা ব্যবস্থা করবে।" ঠাকুর ওদের সমস্ত বিষয় আস্তে আস্তে জানলেন, এবং জিজ্ঞেস করলেন, "কণ্ঠীও কি সেখানেই নিয়েছেন?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, কণ্ঠী সেখানেই।" ঠাকুর বললেন, "মাথাও কি সেখানেই মুণ্ডন করেছেন? এবং পরিধেয় যে ছোট বস্ত্র, এটা কি কৌপীনের আভাস, না এভাবেরই বন্দোবস্ত?" তিনি উত্তর দিলেন,

"না, কৌপীনও রয়েছে।" তার কথায় যা বোঝা গেল, শেষ বয়সে তার হয়তো কৌপীনই নিতে হবে এবং এই অবস্থাটাই একটা 'মহান্ত' অবস্থা। ঠাকুর বললেন, "আস্তে আস্তে সবদিকেই এগিয়ে যাচ্ছে কিনা। সেখানে নিশ্চয়ই আপনাদের কোন ঝগড়াবিবাদ নেই?" তিনি বললেন, "না, না, দৈনন্দিন ঝগড়া—প্রসাদ নিয়ে মারামারি, কে খিচুড়ি খেলো, কাকে ননী দেওয়া হলো, এসব আমাদের ওখানে লেগেই আছে, কারণ পর্য্যায়ানুসারে প্রসাদেরও তারতম্য আছে।" তখন ঠাকুর বললেন, "সেখানে গিয়েও যদি মারামারি করতে হয়, official কাজ করতে হয়, আর এই 'ঝুলনা' নিয়ে বাড়ী বাড়ী দৌড়াতে হয়, আর প্রমোশনের চিন্তায় যদি ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়, তবে আর বাইরের official duty দোষ করলো কি? এদিকে মা-বাবা বসে কান্নাকাটি করছেন, তাঁদের খুশী করা তো মন্দিরের দেবতাকে খুশী করার চেয়ে কম নয়? এদিকে না হয় শিলামূর্ত্তির অফিস করছেন, ওদিকে না হয় পিতামাতার দিক্ দিয়ে office duty করবেন, হয় চাকুরী করবেন, না হয় ব্যবসা করবেন, না হয় কৃষি করবেন। এদিকে না হয় কৌপীন টানছেন, বাড়ীতে না হয় গিয়ে কৌপীন খুলবেন। কৌপীন টানতে টানতে তো আর সব ভেতরে টেনে নেননি, না কৌপীন ভেদ করেও আসে।" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তাও আসে।" ঠাকুর বললেন, "তবে এই বাঁধ দেওয়ার প্রয়োজন কি? তাতে মনের দিক্ দিয়ে শরীরের দিক্ দিয়ে অসুস্থতাকেই তো ডেকে আনছেন। সব-কিছুই যখন এদিক্কার মত রয়েছে, সুতরাং দৃষ্টিভঙ্গিমারও তারতম্য রয়েছে, নারীপুরুষ ভেদাভেদ জ্ঞান যখন সম্পূর্ণ রয়েছে, তখন চিন্তা ক'রে খোরাক নেবার মত বুদ্ধিবৃত্তিও রয়েছে। এর আগেই যখন প্রমোশনের জন্য লালায়িত রয়েছেন, ঐ মনে নানারকম চিন্তা ক'রে নিজের মধ্যে নিজেই যখন লড়াই করছেন, সব-কিছুরই একেবারে সমাধান হয়ে যায় যদি বাড়ীতে গিয়ে বাপ-মা'র সেবাশুশ্রূষা করেন,

তাঁদের কথা শোনেন, আর সংযমতার জন্য যদি একটা নূতন 'কৌপীনে'র ব্যবস্থা করেন—সংযমতা সেখানেই আসবে, অত লড়াই করতে হবে না। আর বেশভূষার দিকে যখন নিজে তাকান, আপনাকে আপনি কি মনে করেন? দুর্দ্দশাগ্রস্থ মনে করেন, না একটা কিছু হয়ে গেছেন মনে করেন, না শান্তি মনে করেন?" তিনি বললেন, "সন্ন্যাসব্রত নিয়েছি, সন্ন্যাসী হয়েছি, ও দেখে সব সময় সন্ন্যাসের চিন্তাই মনে রাখি।" ঠাকুর বললেন, "প্রথম-অবস্থায় যখন এসেছিলেন, যখন এ সমস্ত মাথা মুণ্ডন করে সন্ন্যাস নিলেন, আজতো প্রায় কত বছর হয়ে গেল, এখন কি রকম লাগছে?" তিনি বললেন, "প্রথম দিক্ দিয়ে যে inspiration ছিলো, এখন শিথিলতা এসেছে, আগের ভাব আর নেই।" ঠাকুর বললেন, "আগের ভাব আর নেই, প্রথম দিকে যে inspiration পেতেন, এখন দেখলেন শিথিল হয়ে গেছে, তা আর নেই—এখনকার অবস্থা প্রায় হজম করে ফেলেছেন। মনের নানা উঁকিঝুঁকি কণ্ঠীতে আর সাবধান করে দিচ্ছে না, মাথা-মুণ্ডনে সৌন্দর্য্যহীন হলেও কেউ যাতে না দেখে সেই হিসাবেও সেটা হারিয়ে গেছে। মুণ্ডিত দেখলে তো আর কেউ ভিড়বে না? নিজেকে দেখে নিজেই লজ্জিত, এটা যেন প্রশংসার মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। এই অবস্থায়ও যে কেউ ভিড়তে পারে, সে-নাড়ী বেশ টন্‌টনে হয়ে দাঁড়িয়েছে, এখন উদাসীনতার দিকে না গিয়ে সহযোগিতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার অবস্থা করে নিয়েছেন; এখন এই অবস্থায়ই কারুর উপর আধিপত্য করার চেষ্টা করছেন। একজন অন্ধ, বড় গায়ক, সে জানে যে অন্ধ বলে তাকে কেউ পছন্দ করবে না; সুতরাং ও যে খ্যাতনামা গায়ক—ওর সেই সুযোগ নিয়েই অন্যের মনকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। অনেক সন্ন্যাসী ছাই-ভস্ম মেখে একটা বিকৃত চেহারায় থাকে, কেউ যেন তাদের আকর্ষণ না করে এবং তারা নিজেরাও যেন আকৃষ্ট না হয়—যার জন্য তার

কাজ। এখন দেখা গেল—সরিষাই ভূত হয়ে যাচ্ছে, এখন এই ত্যাজ্য চেহারাই ভোগীর চেহারা হয়ে সম্মুখীন হচ্ছে। আজ আপনার এই পোষাকে, ভাবগতিতে ভোগী যে হয়েছেন, সেদিকে আপনি খেয়াল করেছেন কি?" তিনি বললেন, "আমি চেষ্টা করছি সংশোধন করার জন্য।" তিনি ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি যে এত কথা বলছেন, নিশ্চয়ই আপনি এ লাইনে চেষ্টা করছেন, নিশ্চয়ই কিছু সন্ধান পেয়েছেন।" ঠাকুর বললেন, "আমি তো সংসারেই আছি—মা আছেন, বাবা আছেন, ভাইবোন আছে। আমি তো চাল, ডাল, তেল—সব-কিছুরই চিন্তা করছি, তার মধ্যে যতটুকু করা দরকার করে যাচ্ছি। নিজের স্নান, খাওয়া, পরা, নিজেকে নিজের সেবা করা, সব-কিছু বৃত্তির উপরে চৈতন্য রাখা, অতগুলো কাজ যখন করে যাচ্ছি, তার মধ্যে সংসারে মা, বাবা, ভাইবোনদের দেখতে আর কি, তাদের দেখতে আর কি দোষ? নিজে যখন স্নান করতে যাই, বাঁ-হাত ডান-হাত মাজি, এবং নিজেকে নিজে তৈল মর্দ্দন করি এবং অঙ্গ-বিশেষে মাখি—নিজে যখন এত দিকে তাকিয়ে নিজের কাজ করে যাচ্ছি, তাতে যদি দোষনীয় না হয় আধ্যাত্মিক জগতে, তারই আর এক অঙ্গ-বিশেষের মত মা, বাবা, ভাইবোনদের দেখা, তাদের আমার আন্তরিকতার মধ্যে রেখে, যার যার মর্য্যাদা দিয়ে—আর যদি নিজের সেবাতে নিজের ক্ষতি না হয়, এতেও ক্ষতির কোন কারণ আসতে পারে না। সুতরাং এর পরে চাল, ডাল, তেল, লবণ, তারপরেই তো পায়খানা—প্রস্রাব, শ্লেষ্মারূপে ঐ চাল-ডাল-জাতীয়কে হজম ক'রে ফেলে দিয়ে আসতে পারি, সম্মুখে গিয়ে চাল ডালের চিন্তা করাটা কি দোষনীয়? সুতরাং ছাড়বার জন্যই তো প্রকারান্তরে এগিয়ে যাচ্ছি। আপনার এই অবস্থাতে এত রকম ব্যতিব্যস্ততার মধ্যে যাওয়ার কি প্রয়োজন? আমার অবস্থাকে সন্ন্যাস-অবস্থা ছাড়া লাগছে? আমার অবস্থার

সঙ্গে তুলনা ক'রে আপনার সাথে আমার ভেদাভেদ জানান দেখি। আপনিও কিন্তু একজাতীয় সংসারই করে যাচ্ছেন।" তখন তিনি বললেন, "আপনার চিন্তা-অনুযায়ী আপনার সাথে আমার কোন পার্থক্য দেখছি না। আপনার কি মনে হয় সংসারে ফিরে গেলে এ অবস্থা সেখানে পাওয়া যাবে?" ঠাকুর বললেন, "আমার চিন্তার দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা যা পাচ্ছি, তাতে পার্থক্য তো কিছু পাচ্ছি না। মন্দিরের শিলামূর্ত্তি যদি সাড়া দিতো, তাঁর আদেশ নিয়ে যদি আপনি কাজ করতেন, তবে সেখানেই আলোচ্যের বিষয়বস্তু হতো কি করা দরকার, না দরকার; এখন আপনাকে সাড়া দিচ্ছে মন্দিরের যে প্রধান রক্ষক, সুতরাং সে-ই আপনার guardian হয়ে কাজ করছে, তার উপর নির্ভর করে মা-বাপকে দুঃখ দিয়ে লাভ নেই। আপনি বাড়ী যান, আপনার মন্দিরের দেবতা এখন মা-বাবাই— তাঁদের পূজো করে পূজোর রীতিনীতি গিয়ে শিখুন, প্রাথমিক stageএ যেখানে ক্ষম, দম, সম, সব-কিছু পাবেন। এই পিতাপুত্র এবং মাতা-পুত্র সম্পর্কে যে বাৎসল্য জড়িত রয়েছে, সেই ক্ষেত্রেই পাবেন উপযুক্ত মূল্য, শিক্ষার বস্তু সেখানেই পাবেন, এবং সেই শিক্ষাতে নিজে শিখে জগৎকে শেখাতে পারবেন। শাস্ত্রগত প্রকৃত দেবভাবের অভিব্যক্তি রয়েছে এই মধুর সম্পর্কে, তার জলন্ত প্রমাণ সমূহ এর মধ্যে রয়েছে, সেই প্রাথমিক অবস্থা শিখে নিন, তার stage by stage যা, করে নিন।" তিনি ঠাকুরের ঠিকানা চাইলেন। তাকে ঠিকানা দেওয়া হলো। তিনি ঠাকুরকে বললেন, "আপনার বাড়ী গিয়ে সাক্ষাৎ করবো।" এর পর ঠাকুরের সাথে আরো কিছু গোপন আলাপ হলো। এর মধ্যে তার বন্ধুটি ঠাকুরের পরিচয় প্রকাশ করে দিলো এবং তিনি তাতে একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং বললেন, "আপনি কেন আপনার পরিচয় দেননি? আপনার সাথে আলাপ করতে গিয়ে কত তর্কও করে ফেলেছি।" ঠাকুর বললেন, "আমি যদি পরিচয় দিতুম,

তা হলে হয় আপনি আসতেন না, না হয় আপনার কথা আমায় বলতেন না। আপনার মা-বাবার করুণ কাহিনী যখন আপনার এই বন্ধু এসে জানালো, তখন সেই ব্যথায় ব্যথিত হয়ে আপনাকে তাঁদের হাতে যাতে পৌঁছে দিতে পারি, তাই নিজেকে গোপন করে আপনাকে আনিয়েছি।” তখন তিনি বললেন, “আমি আপনার নিকট খুব কৃতজ্ঞ, আপনি আমার জীবনে একটা বিরাট পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছেন।” এর পর তিনি নিজ হাতে কণ্ঠী ছিঁড়ে ঠাকুরের কাছে রেখে দিলেন এবং পরদিন শিখা ছেদন ক'রে বন্ধুর ধুতিপাঞ্জাবি পরে ঠাকুরের সাথে দেখা করতে এলেন ; সেই দিনই তিনি ঠাকুরের কাছে দীক্ষিত হলেন এবং ঠাকুর তাকে কিছু টাকাপয়সা দিয়ে তার বাবা-মার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি বাড়ী ফিরে গেলে তার বাপ-মা তাঁদের হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চিঠি দিলেন।

তার প্রায় ছয় সাত মাস পরে তিনি আবার যখন ঠাকুরের কাছে ফিরে এলেন, আমরা দেখলাম তিনি আমাদেরই মত একজন হয়ে এসেছেন। তারপর তিনি ঠাকুরকে জানালেন যে তিনি এখন খুব শান্তিতেই আছেন।

এইভাবে ঠাকুরকে অনেক হারানো ছেলেকেই তাদের বাপ-মার কোলে ফিরিয়ে দিতে দেখেছি। বহু ছেলে দেখেছি যারা বাপ-মা'কে কোনদিন অর্থ সাহায্য করেনি, তারা ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে বাপ-মা'র প্রতি স্বাভাবিক কর্ত্তব্যবোধে সচেতন হয়েছে। অনেক উচ্ছৃঙ্খল, সমাজদ্রোহী ও নেশার বশীভূত ব্যক্তি ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে স্বাভাবিক ভদ্র ও সুরুচিসম্পন্ন মানুষে পরিণত হয়েছে। তিনি বহু দরিদ্র ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন, নিজের বহু অর্থব্যয়ে অনেকেরই উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, বহু লোককে রোগে শোকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন ও করছেন, এবং সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থাও করেছেন এবং এটাই সর্ব্বদা আমরা দেখে

এসেছি যে তিনি কাউকে কিছু না ব'লে কোন কিছুর মূল্য না দিয়ে অতি গোপনে এসব কাজ করে যেতেন অথচ এর ভেতর যে কোন বিশেষত্ব বা গুরুত্ব নেই, সেটাই তিনি সবাইকে অতি সাধারণভাবে বুঝিয়ে দিতেন।

ষাট

"সৃষ্টি অবধি যে-ভাবে যে-ভাবে সৃষ্টি চলে আসছে, প্রত্যেকের প্রত্যেকের সহযোগিতা নিয়ে যাহা নিয়মের মধ্যে রয়েছে, এই যে উভয়ে উভয়ের আকর্ষণ যে-শক্তি হতে আগমন, যে সাড়ার প্রত্যেকটি সাড়া দিয়ে দিয়ে আর একটির সাথে যে-ভাবে মিলিত হচ্ছে, এক-জাতীয় আকর্ষণের মাঝে জড়িত রয়েছে বলেই। এই জড়িত অবস্থা কোন্ সাড়া হতে আগমন, কোন্ ভাব ইহাতে বিদ্যমান, তবুও যখন রয়েছে সেথায়; অস্তিত্বকে তো স্বীকার করতেই হবে—পরিচয় যে এই সৃষ্টিই। যে কারণে সৃষ্টি, এই ভাবে এই ভাবে কারণের মাঝে রয়ে যাচ্ছে এক বিরাট রহস্য, আবার সাড়া দিয়ে যাচ্ছে সর্ব্বত্র। এই সাড়াকে কি আকর্ষণে, কি প্রয়োজনে, কি গতিতে, যে-কোন বস্তুতে একে ফেলে দিয়ে দেওয়া যেতে পারে, কারণ প্রত্যেকটি প্রতেক্যটিতে আবার সাড়ার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। এই সাড়াতেই রয়েছে শব্দ, এতেই রয়েছে ধ্বনি, এতেই রয়েছে নাদ, যে-কোনরূপে যে-কোন অবস্থাতে যেদিক্ দিয়েই যে-ভাবে যাহা হয়ে যা'ক না কেন—কি আকর্ষণে, কি ভাবে, কি গতিতে, যে-কোন মাত্রাতে প্রত্যেকটিতে যে সাড়া দিয়ে যাচ্ছে, ধ্বনিও সেথায় জড়িত রয়েছে; তাই যে-কোন একটিকে আশ্রয় করে যাই না কেন, আশ্রয় ক'রে ক'রে আশ্রিত হয়েই আশ্রয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। যে-কারণে যাচ্ছি, যে-ভাবে যাচ্ছি, প্রত্যেকটি অবস্থাই-যে—কি শব্দ, কি আকর্ষণ, যে-কোন নামাকরণ সব কিছুই যে প্রযোজ্য, আবার বাস্তবে সব-কিছুই ব্যবহার্য্য, সবই যে

আবার একই সমতার মাঝে জড়িত, বিভিন্নতাও তাহা ছাড়া নয়, তাহা হতে অবস্থাভেদে যে-কোন রূপকে নিয়ে অর্থবোধে কল্পনার মাঝে এগিয়ে চলছি ঐ নামকে অবলম্বন ক'রে। অ-ভাবের মাঝে যে-ভাব—তাহাও সত্য, কল্পনার মাঝে যে-রূপ—তাহাও বর্ণনা ছাড়া নয়, সত্য সেথায়ও অবস্থিত, আবার কল্পনা ও সন্দিগ্ধতা এই রূপেরই মাঝে করছে খেলা, তাহাও যে আবার রূপছাড়া নয়। এই অপরূপের রূপের মাঝে অবর্ণনীয়ের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে প্রতিটি রূপের বর্ণনা ক'রে ক'রে, আবার চিন্তাশক্তির প্রখরতার মাঝে বর্ণনাগুলো বর্ণিত হচ্ছে বর্ণ ভেদে ভেদে—এও যে রূপছাড়া নয়, এও যে রূপেরই বিন্যাস; ধ্যান, ধারণা, জপ, তপ, সাধনা—শুধু রূপকে চেনা, রূপের স্বরূপত্ব তখনই প্রকাশ, আবার যে-কোন রূপ প্রত্যেকটি আবার স্বরূপত্বের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে রূপে রূপে বিভিন্নতার মাঝে, আবার বিভিন্নতাও একই রূপে যে রয়েছে, রহস্যও সাথে সাথে রয়ে যাচ্ছে—এও রূপ ছাড়া নয়। রূপ ও গুণ রূপেই-যে প্রকাশ—গুণ রূপছাড়া নয়, রূপও গুণ ছাড়া নয়; তাই চলার মাঝে এগিয়ে চলছি রূপকে নিয়ে রূপের মাঝে, রূপ যে আবার আমাতে—সাধনা যে তাতেই, চলছি নিজের মাঝে নিজের চিন্তায় নিজেকে অবগত ক'রে অবগত হওয়ার জন্য—ধ্যানধারণা বিরাজ সেখানেই করছে। এই ব্রহ্মতত্ত্বের তত্ত্ববিষয়রূপ হতে জেনে বিভিন্নতার একটি রূপকে নিয়ে মাতোয়ারা হচ্ছি নাম-জপে তার লাভের ইচ্ছাতে; শক্তি যে আবার স্থিত রয়েছে তোমাতে—সেই বুঝটুকুনুকেই জাগিয়ে তোলার জন্য বিভিন্নতা তখনই এসে দাঁড়িয়ে পড়ছে, যেমন, বুঝ অবুঝের মাঝে থাকার মত, একই রূপে বহুগুণে অবস্থিত—কি জ্ঞান, কি অজ্ঞান, কি বিবেক, কি বুদ্ধিবিচার যা-কিছু অবস্থিত রয়েছে, রূপেরই-যে পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে; আবার কেউ রূপ ছাড়া নয়, দ্বন্দ্ব আর প্রতিদ্বন্দ্ব, সমস্যা ও সমাধান—জড়িত আবার সেথায়ই রয়েছে। তাই নাম-জপের উপকারার্থে যে প্রয়োজন বোধ করে

যাচ্ছে কি দর্শনার্থে, কি মুক্তির চিন্তাতে, ঠিক যেমন নিজের মনের দ্বন্দ্বে প্রতিদ্বন্দ্বে, বুঝে অবুঝে চলছে, দর্শনেও মুক্তির বেলায়ও একই ভাবার্থ প্রকাশ করছে। কে কারে দর্শন করবে, কে কার মুক্তি করবে কে অবুঝ, কে বুঝ, কে সমস্যা, কে সমাধান—সবই-যে আবার আমাতে অবস্থিত, ঐ দর্শন যে আমারই দর্শন, মুক্তি যে আমাতেই স্থিত ; ঐ চীৎকার, ঐ নাম, ঐ ধ্যান, ঐ জপ, ঐ প্রণব—এ-যে আমারই উপাসনা, এ-যে আমারই ধ্যান, আমারই জপ ; বিভিন্নতায় যে রূপের বিকাশ, এ যে 'আমি' বিকাশ, আমার কান্না আমিই করছি, আমার গীত আমিই গাইছি, আমার জপ আমিই করছি, বিভিন্নতাকে আশ্রয় নিতে ত্রুটি করছি না, সে'ও আমারই আর একটি রূপের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে, সেই রূপই নাম-রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাই বাস্তবে যে-কেহ যে-কোন নামকে অবলম্বন ক'রে তার অর্থবোধে অহর্নিশ স্মরণ ক'রে ক'রে সেই স্মরণীয় বস্তু, যাহা তাহাতে স্থিত, তাহা জাগিয়ে তুলবে ; অর্থবোধের সমতুল্যেতে যে রয়েছে, স্মরণীয় শুধু স্মরণের কার্য্যটুকু করিয়ে দিচ্ছে, অবস্থাভেদে অবুঝ যেমন বিদ্যমান হয়ে আসছে, বুঝই তাহা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে বুঝ বিদ্যমান রয়েছে—রূপের বিকাশ সেখানেই হচ্ছে, দ্বন্দ্ব প্রতিদ্বন্দ্বের লড়াই সেখানেই করছে, জ্ঞান-অজ্ঞান সেথায় গিয়ে পড়েছে, চিন্তাশক্তি ব্যয়িত হচ্ছে ঐ জাতীয় অবস্থাগুলো আছে বলেই। এই যে ভাব ও অ-ভাব যেন চাহিদার পেছনে পেছনে আর একটি চাহিদাকে পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলছে সেই অ-ভাবকে মেটাবার জন্য, আবার মেটানো রয়েছে সবকিছু ঐ ভাবে ঐ ভাবে—যেমন ভাবে অ-ভাবে, বুঝে অবুঝে, জ্ঞানে অজ্ঞানে—পূর্ণ আবার এইখানেই, এর আরম্ভও নেই শেষও নেই, আবার প্রত্যেকটি আরম্ভ, প্রত্যেকটি শেষ ; যে গতির গতিতে এই সৃষ্টি চলে আসছে, ধ্বনি তাতেই। সৃষ্টিতে একে অন্যের এই যে বিভিন্নতাতে যে বুঝাবুঝি, যে ইঙ্গিত; যে সাড়া, যে ভাব, যে অ-ভাব ; এই যে আদান-

প্রদান, এই ভাবেই যে সৃষ্টি, তাতে রয়েছে যে ধ্বনি ; কোন্ ইঙ্গিতে, কোন্ সাড়ার প্রয়োজনে এই যে সাড়া দিয়ে যাচ্ছে, ধ্বনিতেই যেন সেই ভাবভঙ্গিকে বহন ক'রে ক'রে বুঝেতে আনছে। যে-কোন ব্যাখ্যার মাঝে সবাকছু যখন ব্যাখ্যা সাজে, প্রথম বুঝে—ধ্বনিই যেমন প্রথম বুঝের পারচয় দিচ্ছে, আশ্রয় তাকেই ক'রে এগিয়ে চলবো সেই ধ্বনির পেছনে ; কোন্ ধ্বনিতে এ আগমন, এ সৃষ্টি, এ রূপ—সেই সাড়াকেই খুঁজে বের করবো, সেই সাড়াই যে ধ্বনির সাড়া, সেই ধ্বনিকেই ধ্বনির দ্বারা জাগিয়ে তুলবো সেই জাগ্রত বস্তুগুলোকে। সেই ধ্বনি ব্যবহৃত হচ্ছে কি নাম, কি জপ, কি ধ্যান, কি ধারণা। এই ধ্বনিতেই সাড়া দেবে তোমার সুরের ধ্বনিগুলো, এই ধ্বনিতে ধ্বনিতে সব 'তার' একই সুরে ধ্বনিত হবে, তখন মূলাধার কি সহস্রার বেজে উঠবে একই তানে, একই সুরে, তখন তুমি ও ধ্বনি—একই সুরে সুর দেবে, তখন ধ্বনির মাঝে লীন হয়ে তুমিই ধ্বনির....

.................................ধ্বনি ....

...........কোথায় ?...............কোথায় ?.........

..................কোথায় ?........................

....